আকাশলীনা

আবুল বাশার

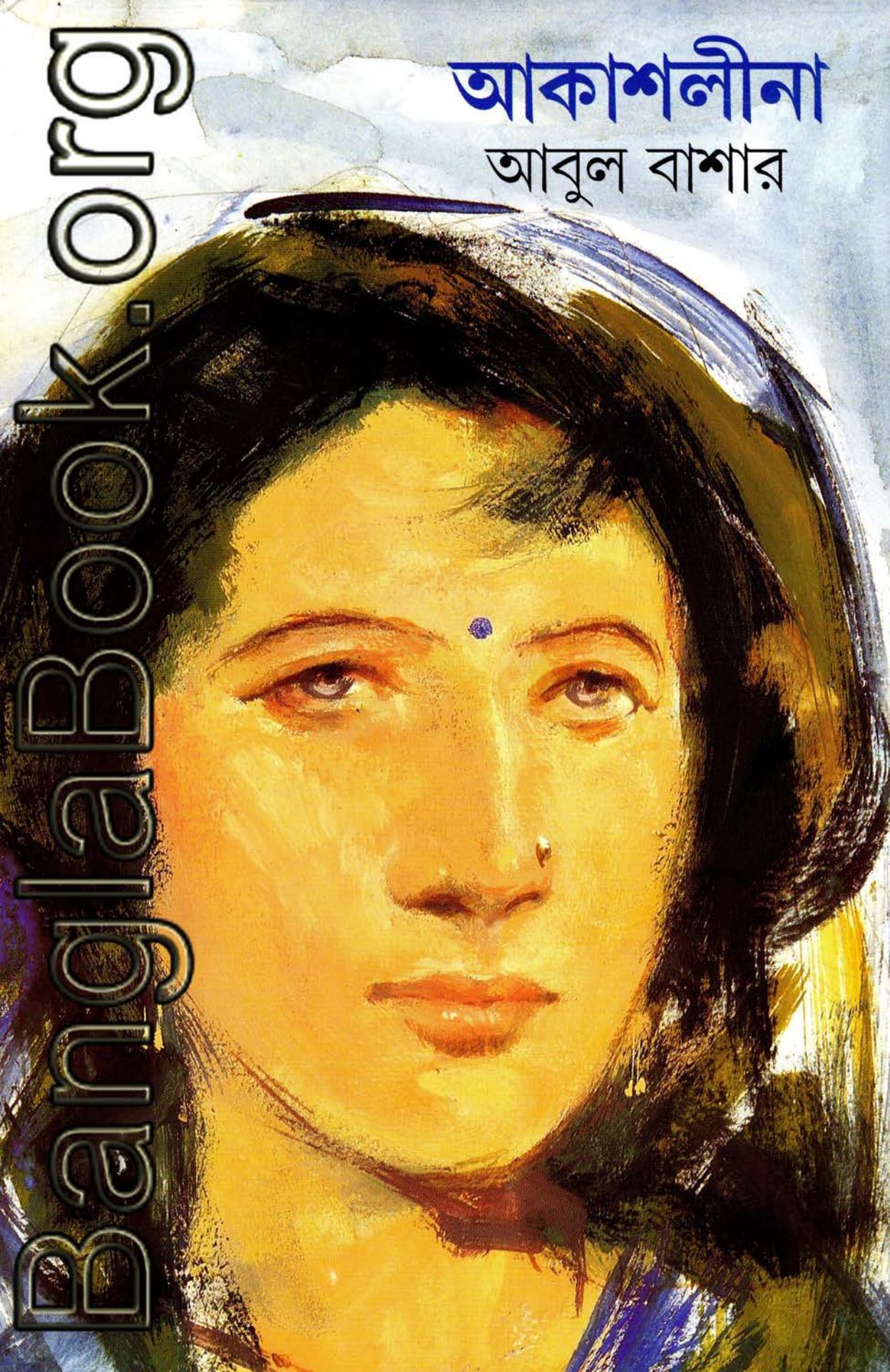

banglaBook.org

তার বাবার নাম আহসান ইমাম। মা স্বর্ণদীপা ইমাম। দাদা রুদ্র আহসান। আর সে? সে হল আকাশলীনা।

ভুল হল। সৈয়দা আকাশলীনা। দাদিমার দাবিতে ইস্কুলে ভর্তির সময়েই তার নামের আগে সৈয়দা পদবীটা বসাতে হয়েছিল। মা চাননি, তাও।

আসলে শৈশব থেকেই আকাশলীনা দোটানায়। বাবা থেকেও নেই। দু-দশক ধরে জেলে। তাঁর জীবনের সমাজ বদলানোর সহিংস রাজনীতির কোনও সমর্থনই ছিল না গ্রামসমাজে। হিন্দু মেয়ে স্বর্ণদীপাকে ভালবেসে বিয়ে করার ঘটনারও না। একদিকে তাই দিদিমা, অন্যদিকে মা আকাশলীনার। জাতধর্ম, ধর্মান্ধতার প্রতিবাদ। এহেন আকাশলীনাকে নিয়ে এই মানবতাবাদী উপন্যাস। ব্যক্তির, পরিবারের, রাজনীতির, ধর্মান্ধতার, ভালবাসার কাহিনী। এখানেও এসেছে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বরের প্রসঙ্গ, যে-ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকে তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা'। এক কৌতূহলকর কুশলী কাহিনীতে আবুল বাশার দেখিয়েছেন, একটি মানুষের দেহের কাঠামোও কীভাবে মন্দির বা মসজিদ, মানুষই কীভাবে তাকে ভাঙে, করে ধূলিসাৎ।

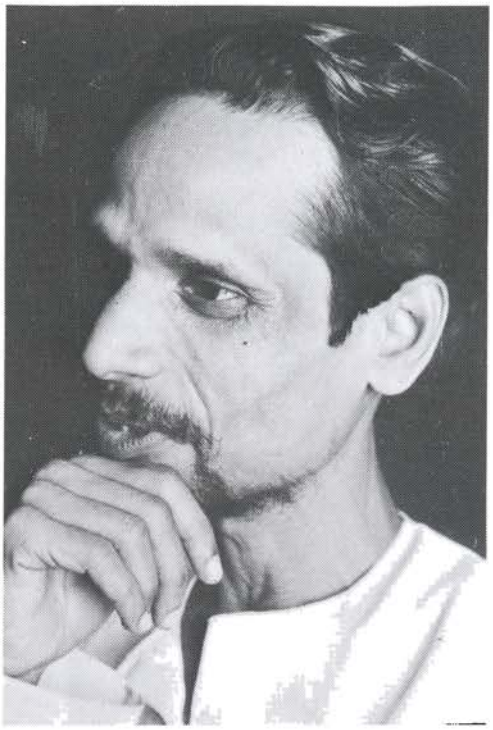

জন্ম : ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দ। ছ-বছর বয়সে সপরিবার গ্রাম ত্যাগ। মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার টেকা গ্রামে বসবাস শুরু।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যের স্নাতক।
হিন্দীভাষা-সাহিত্যেরও ডিপ্লোমা।
গ্রামের স্কুলে ১০-১২ বছর চাকুরি। বর্তমান কর্মস্থল : সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা।
দারিদ্র্যের চাপ আর সামাজিক বিষমতা ও পীড়ন কৈশোরেই লেখালেখিতে প্ররোচিত।
উত্তীর্ণকৈশোরে, ১৯৭১ সালে, প্রথমে কবিতাগ্রন্থের প্রকাশ। নাম : 'জড় উপড়ানো ডালপালা ভাঙা আর এক ঋতু'। পরবর্তী এক দশক লেখালেখি বন্ধ। জড়িয়ে পড়েন সক্রিয় রাজনীতিতে। বহরমপুরের 'রৌরব' পত্রিকাগোষ্ঠীর প্রেরণায় লেখালেখিতে প্রত্যাবর্তন। কবিতা ছেড়ে এবার গল্পে। প্রথম মুদ্রিত গল্প—'মাটি ছেড়ে যায়'।
তাঁর 'ফুলবউ' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন ১৩৯৪ সালের আনন্দ-পুরস্কার।

প্রচ্ছদ□ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আকাশলীনা

আবুল বাশার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আনন্দ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৪
তৃতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি ২০১৫

প্রচ্ছদ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
© আবুল বাশার

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7215-327-9

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

AKASHLEENA
[Novel]
by
Abul Basar

Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

১২৫.০০

আমার শাশুড়ি মায়ের উদ্দেশে

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

১. এৎকাফ ও গোল আয়না এবং আমি

উড়নির ফুপি দিয়ে ধীরে ধীরে আমি আমার চোখের সুর্মা মুছে ফেলি। তারপর আই-লাইনার নিয়ে আয়নার সামনে ফের দাঁড়িয়ে ডান চোখে পেন্সিলটা এগিয়ে আনতে থাকি।

মা পিছন থেকে এসে হাতখানি চেপে ধরে বললেন— থাক। ও আর পরতে হবে না। বলেই মা সরে চলে গেলেন ঘরের অন্যত্র।

আলনায় জামা কাপড় গুছিয়ে তুলছেন মা। আয়নায় মাকে দেখা যায়। এখনও কাজলরেখার পেন্সিলটা আমার হাতে ধরা। চোখের ডিমে ফুপির কোমল আঘাতেও জল আসে। আসলে হয়তো আমার হৃদয়টাও চোখেরই মতন নরম। উড়নির ঝালর আছে, ঝালরে গিঁট বাঁধা এবং গিঁটের পর ফুপির অংশ ঝুলছে। সব উড়নি এরকম হয় না।

ঝালরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। ফুপির অংশ আরও ছোট। ফুপি দিয়ে সুর্মা মুছে ফেলার ঘটনা মা লক্ষ করেছেন অনেকক্ষণ। যতক্ষণ ফুপি দিয়ে এভাবে চোখের আরবি রঙ না মোছা হয়েছে, ততক্ষণ মা ঘর থেকে বাইরে যেতে পারেননি। কিন্তু মা কেন কাজল পরতে দিলেন না ?

কাজলের এই পেন্সিলটা একটু অধিক শব্দে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে ফেলে দিই। শব্দের সঙ্গে আমার বিরক্তি প্রকাশ পেয়েছে মা বুঝতে পারেন। স্বল্প চমকে উঠে হাতের কাজ থামিয়ে তিনি আমার দিকে চাইলেন। আয়নায় দেখি, মা হাসার চেষ্টা করেও গম্ভীর হয়ে গেলেন।

—তুমি এরকম করছ কেন ? তোমার কী হয়েছে ? তুমি কি ছেলেমানুষ ?

মা পর পর তিনটি জিজ্ঞাসাচিহ্ন প্রয়োগ করেন তাঁর তিনটি বাক্যে। আমি জানি, এই সব উপর্যুপরি জিজ্ঞাসাসমূহের উত্তর আমি দেব না। এরকম কেন করছি বলব না। আমার কী হয়েছে তা-ও বলব না। আর ছেলেমানুষ ? তা বইকি !

—খালি চোখেই তোমাকে সুন্দর দেখায়। বিনে কাজলে, বিনে সুর্মায়। বলতে বলতে মা বাঁ হাতখানিকে হ্যাঙারের মতো করে, তাতে ব্লাউজ ভাঁজ করে, পাট করে ফেলতে থাকেন পর পর। আমি কথা বলি না। আয়নার সামনে থেকে জানলার কাছে সরে আসি। দেখি, ঈদগাহের দিকে হাতে জায়নামাজ রোল করা মানুষ পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে, অনেকটা শোভাযাত্রার মতো—নতুন অথবা ধোয়া পোশাক পরা শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধরা। রাস্তায় দু'একটি সাজ পরা কিশোরীও নেমে পড়েছে। ওরা ঈদের নামাজে যাবে না, পথের শোভা মাত্র তারা, বাড়ি বাড়ি ঘুরবে প্রদর্শনীর মতো। মেয়েদের নামাজ-সত্র হয় না।

আমার আর ভাল লাগছিল না। নতুন সালোয়ার কামিজ উড়নি অসহ্য লাগছে শরীরে। পায়ের রাঙা স্যান্ডেল পায়ে রাখতে ইচ্ছে হয় না। কানের দুল এবং হাতের চুড়ি আমি খুলে ফেলতে চাই। জানলার কাছে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে খাটের পুরু সাদা ধবধবে বিছানায় চেয়ে দেখি। তারপর খাটের বাজু ধরে দাঁড়াই সরে এসে।

মা লক্ষ করেন দুল আর চুড়ি খুলে খাটে নিঃশব্দে ফেলে দেওয়ার দৃশ্য।

—তুমি সিন ক্রিয়েট করছ আকাশলীনা! ভারী অসভ্যতা হচ্ছে কিন্তু! দাদিমা দেখলে কী ভাববেন!

—বেশ, আমি করব। এই সব সিন্থেটিক.....গরম লাগে না বুঝি!

—নামাজ হয়ে যাক। তারপর খুলবে।

—না।

ঠিক এই সময় দোতলার যে সিঁড়ি তলায় নেমেছে, সেই সিঁড়ির ধাপ ভেঙে আসার পদশব্দ শোনা না গেলেও কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে। দাদিমা উপরে উঠে আসছেন।

মা হঠাৎ বললেন—সুর্মা মুছে ফেলে তুমি মোটেও ঠিক করনি। ঈদের নামাজ এখনও শুরুই হয়নি। আজান পড়েনি। তুমি পোশাক খুলে ফেলতে চাইছ। দুল চুড়ি ফেলে দিচ্ছ।

—হ্যাঁ। দেব। এই সব মুড়ে পুতুল হয়ে ঘরে বসে থাকতে পারব না। কখন নামাজ শেষ হবে, ছেলেরা ফিরে আসবে ঈদগাহ থেকে, তারপর....

—বসে থাকবে কেন? তুমিও যাও না, অন্যরা যেমন বার হয়েছে!

—কোথায় যাব মা?

মা বলছেন বটে, কিন্তু রাস্তায় বার হয়ে গেলে মা নির্ঘাত আপত্তি করতেন। এই মাকে আজ আর আমি চিনতেই পারি না। সুর্মা যখন মুছে ফেলছিলাম, ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে, চেয়ে চেয়ে দেখেছেন জননী, ফুপি দিয়ে চোখের গুঁড়োরঙ সরাতে সময় লেগেছে, অথচ অতখানি সময় যাবৎ মা কোনও আপত্তি না করে চুপ করে থাকছেন। যখন আই-লাইনার হাতে তুলে নিয়েছি মা হাত চেপে ধরলেন পেন্সিলসুদ্ধো। এই মায়ের উপর আমার রাগ হয়।

আমি এমন কেন করছি, আমার কী হয়েছে, এ প্রশ্ন আমিই তো মাকে করব, সংসারকে জবাব করবার দায় তাঁরই, মা তুমি জানো, আমাকে তুমি বাধ্য করছ মা! স্বামীকে পার না, ছেলেকে পার না, এমনকি নিজেও যা কর না কখনও, সেইসব কেন আমারই জন্য তোলা থাকে? গত বছর বড় পিসির দেওয়া ঈদের শাড়ি তুমি পরেছ তিনমাস পর, যখন বজবজ-সন্তোষপুর যাচ্ছ দিদার কাছে।

ঈদ বলে কোনও উৎসব মায়ের জীবনে নেই। এমন কি বাবাও এই উৎসব করেন না। এঁরা ধর্মীয় কোনও অনুষ্ঠানে থাকেন না। পুজো অথবা নামাজ, ঈদ অথবা দুর্গোৎসব—কোনও ব্যাপারে এঁদের অংশগ্রহণ নেই।

—এম. এল. এ-র মটর ঢুকল বউমা! ঈদগাহের ওদিকে চলে গেল। জিপগাড়ি। লোকে এই সবই তো দেখে, ধর্মকর্ম মানুষকে দেখাতে হয়। মনেপ্রাণে বিশ্বাস কর আর নাই কর, ধর্মের সৌষ্ঠব রাখতে হবে। আলি হোসেন জানে, রাজনীতি করতে হলে ধর্ম করতে হবে। প্রত্যেক সন ও এই রকম মটর হাঁকিয়ে আসে। কেন আসে? কৌমিয়াত মানে বলেই আসে। আপন কৌম, আপন ধর্ম। ও আসে, খুৎবা পড়ে, ইমামি করে, ও এসেছে, এটাই বড় কথা। বলতে বলতে দাদিমা দোতলায় উঠে এসে আমার সামনে কেমন থতিয়ে দাঁড়ালেন।

BanglaBook.org

দাদিমার চোখে গাঢ় সুর্মা চকচক করছে। বিধবা দাদির গায়ে আতর পড়েনি, কিন্তু চোখের রঙ উগ্রভাবে পুরু। সাদা শাড়ি, নরুন পেড়ে এবং কনুই ঢাকা সাদা ব্লাউজ। গলায় পাউডারের দাগ।

আমার সংক্ষিপ্ত লীনা নামটি উনি ভুল উচ্চারণ করেন বলে জ্ঞানত আমার নাম বদলে ফেলেছেন। আমাকে লীলা বলা ঠিক নয়। আমি আকাশলীনা।

নামের প্রথম অংশকে ধরেছেন তিনি। তারপর আকাশকে বিদেশী শব্দে, আরব্য-পারস্য শব্দে বদলে নিয়েছেন। করেছেন আসমান। তারপরই তাঁর ঝোঁকটি মারাত্মক। আসমানের দন্ত্যন বিসর্জন দিয়ে আমাকে আসমা ডাকতে চান।

—আমি তোকে আসমা বলে ডাকব।

—না।

—কেন ?

—উত্তর পাবে না।

—কেন রে মুখপুড়ি, দোষ কি তাতে ?

—তুমি ভাষা বোঝো না দাদিমা।

—তোর নামের লজ্জ জুবানে আসে না মামণি। তাই জরা সুবিধা করে নিচ্ছি।

—কোনও সুবিধা তুমি পাবে না। কাউকে সুবিধা আমি দেব না। কিছুতেই দেব না। বাবা-মা-দিদা-মাসী-ফুপু কেউ না। আমার নাম উচ্চারণ করতে না পার, আমায় ডেকো না।

একমাস আগেও আমি এত স্পর্ধা করে কথা বলিনি, কখনও গলার মধ্যে এত উত্তাপ ছিল না। এই উত্তেজনা নতুন। সবার কাছে অচেনা। আমি খুব নরম স্বভাবের মেয়ে, গলায় কোনও খরতা নেই। নিজেরই কাছে এই কণ্ঠস্বর অভাবিত।

—আমি সুবিধার জিনিস, তোমাদের ! মানুষ এই ! ....তা হতে পারে না। আরও উত্তেজিত হয়ে বলে উঠি সেদিন। সবাই কেমন আড়ষ্ট আর অপ্রতিভ বিস্ময়ে আমাকে দেখেন। দাদিমার চোখমুখ শুকিয়ে যায়। সবচেয়ে কালো হয়ে গেছেন মা। মায়ের চোখ থেকে সত্বর চোখ টেনে নিয়ে ঘর ছেড়ে দোতলার ছাদে চলে আসি।

কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ বাবার ছায়া পড়ে আমার পিছনে। ছায়াই পড়ে না, হাতে-ধরা লাঠিটার মৃদু শব্দ শুনে পিছনে ফিরে তাকাই। আমার বাবা খোঁড়া। বাবা ক্রাচ ব্যবহার না করে অধ্যাপক রেজাউল করীমের মতন দেহের অক্ষম ভর সামলানোর জন্য একখানা লাঠি অবলম্বন করেন। করীমের কোমর ভেঙেছিল কলকাতার দাঙ্গায় ছেচ্চলিশে, হঠাৎ আক্রান্ত হয়েছিলেন পথের উপর। বাবা শেষ হয়েছেন জেলে। জেলেই তাঁকে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে, সত্তরের মুক্তির দশকে। বাবার যৌবনের দু'টি দশক জেলেই কেটেছে।

আমি আমার মায়ের গর্ভে কিভাবে এসেছিলাম ? আকাশে যেভাবে উল্কা আসে, অতর্কিতে, অপ্রত্যাশিত। নিঃশব্দে। অভিশাপের মতো দেখায় একটি উল্কার ছেটানো আগুন। আকাশে উল্কা একটি আলগা উপদ্রব, অর্থহীন।

নারীর গর্ভ এক আকাশ বিশেষ—সেখানে প্রাণ খেলা করে। কিভাবে প্রাণ আচমকা আসে, না চাইলেও আসে, নারী জানতে পারে না। মা জানতে পারেননি কখন কোন মুহূর্তে আমি এসে পড়েছি। লোকে আমার জন্ম বিশ্বাস করেনি। এমন কি আমার দাদিমা অবধি মাকে সন্দেহ করেছিলেন। সন্দেহের উপযুক্ত কারণ ছিল।

দৃশ্যটা আমি কল্পনা করে নিতে পারি। আঠারো-বিশ বছর জেল খেটেছেন যে-মানুষটি তাঁর জীবনে অনেক ঘটনাই ছিল আকস্মিকতায় ভরা। বাবাকে মাঝে মাঝে জেল থেকে

BanglaBook.org

ছেড়ে দেওয়া হত, আবার হঠাৎ একদিন পুলিশ এসে উঠিয়ে নিয়ে চলে যেত। বাবাকে পালিয়ে পালিয়ে ফিরতে হত। বাড়িতে এসে সুখে বাস করার জীবন বাবার ছিল না। যে-রাতে বাবা মায়ের কাছে এসেছিলেন হঠাৎ, সেই রাতটা কেমন ছিল! বাবা ছাড়া পেয়েছেন জেল থেকে কিন্তু সিধে কখনও বাড়ি ফিরে আসেননি, ছাড়া পেয়েও তাঁকে লুকিয়ে থাকতে হত। লুকিয়ে দেখা করতে হত মায়ের সঙ্গে।

মায়ের কাছে বাবা চোরের মতন এসেছিলেন, রাতটুকু কাটিয়ে রাতের অন্ধকার থাকতেই চুপিসাড়ে চলে গিয়েছিলেন। সেই রাতে আমি মায়ের গর্ভে উৎপন্ন হই।

আমার ভাল লাগে ভাবতে যে, আমার জন্ম এমনই অদ্ভুত। ভাল লাগে এবং কষ্ট হয়। খুব অসহায় লাগে যখন ভাবি এই জন্মবৃত্তান্ত মানুষের কাছে সন্দেহজনক।

তখনও অন্ধকার আছে, মায়ের আলিঙ্গন ঠেলে ফেলে বিছানা ছেড়ে হঠাৎ বাবা উড়ে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত মাকে জাগিয়ে তুলে বললেন—স্বর্ণদীপা! দীপা! আমি যাচ্ছি।

বাবার এক গোপন জীবন ছিল অন্তত আঠারো বছর। তাঁর ছিল আত্মত্যাগের রাজনীতি। সেই রাজনৈতিক আত্মত্যাগের কঠিনতম পরিচয় আত্মজনকে ত্যাগ করতে থাকা। বাবার রাজনীতিতে আত্মোৎসর্গ, জীবনদান, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি কথার বিশেষ দাম ছিল না। আত্মত্যাগের তীব্র আকুলতা, সে প্রায় একটা নেশার মতো, তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে বাবাকে। আত্মত্যাগের বদলি শব্দ আত্মোৎসর্গ নয়। মনে হয়, সেই আকুলতার তীব্রতা বোঝাতে বাবারা আত্মত্যাগ কথাটি ব্যবহার করতেন। আত্মবলিদান কথাটিতে ঘোর আপত্তি ছিল। বাবার লেখা বইতে আত্মবলিদান কথাটির একবারও উল্লেখ দেখি না। বাবাদের কাজ কখনও কোনও আধ্যাত্মিক কাজ ছিল না।

কিন্তু বাবা সত্যিই কি সন্ন্যাসীর মতো আমাদের ত্যাগ করতে পেরেছিলেন? যাঁর যৌবনের অধিকাংশ সময় কারান্তরালে কেটেছে, মায়ের সঙ্গে দেখা হয়নি বছরের পর বছর, এমনকি যখন হয়েছে, তা-ও কত সঙ্গোপনে, সেই বাবার জন্য আমার কি কোনও অহংকার আছে? বাবার গোপনীয়তা কেমন ছিল?

বাবা কখনও মায়ের জন্য একফোঁটা দায়িত্ব পালন করেননি। শুধুমাত্র বিয়ে করা ছাড়া দাম্পত্যের আর কোনও অধিকার-কর্তব্য বাবার ছিল না। বাবার সময় ছিল না। সুযোগ ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, আমি যেভাবে মায়ের গর্ভে এসেছিলাম, সেকথা কি বাবা ভেবেছেন কখনও?

বাবা এসে সেদিন ছায়ার মতো আমার পিছনে দাঁড়ালেন, আমি পিছনে ফিরে তাঁর চোখের দিকে চাইলাম।

আকাশলীনা! তোমার এই নামটা আমরা কেউ রাখিনি। সমরেন্দ্র রেখেছে। ও খুব বিখ্যাত লোক। কবি। তোমার দাদিমা এ নামের অর্থ বুঝবেন না। তাঁকে দোষ দিও না। কিন্তু মায়ের ওপর রাগ করছ কেন? তোমার কী হয়েছে? আমার ধারণা ছিল, সবার উপর তুমি রাগ করতে পার, কিন্তু মায়ের উপর কখনওই করবে না। এই সংসারে মা তোমার সব।

বাবা হয়তো আরও কথা এক নাগাড়ে বলে যেতেন। কিন্তু আমার মুখ দিয়ে অদ্ভুত কিছু অপ্রাসঙ্গিক বাক্য বার হয়ে এল। বললাম—তোমার কথার অনেক দাম বাবা! লোকে শোনে। গুরুত্ব দেয়। কিন্তু মা আমার সব, একথা তোমার মুখে শুনলে আমার কষ্ট হয়। আকাশলীনা কথাটার মানে তুমি বলতে পারবে? তোমার জীবনে আমি কোথায় আছি বল তো?....

দেখলাম, বাবা কেমন কেঁপে উঠলেন। হাতের লাঠিটা ছাদের মেঝেয় ঠকঠক করে

BanglaBook.org

ঠুকে গেল বার কতক। বাবার শরীর মুহূর্তে শক্ত দেখাল। চোখ ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠে অত্যন্ত কোমল আর সরু হয়ে দিগন্তে ভেসে গেল।

চেপে রাখা শ্বাস দলিত হয়ে বার হয়ে এল বাবার গলা দিয়ে—নেই!

শুধু ছোট্ট নেই, আর কোনও উচ্চারণ করলেন না। ঘুরে দাঁড়ালেন। ঘাড় নিচু করে লাঠি ঠুকে ঠুকে অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে চলে গেলেন। বাবা নামতে পারেন, ওঠার সময় বাবাকে ধরে তুলতে হয়। হাত এবং কোমর ধরে।

হঠাৎ নীচের থেকে বাবার ডাক শোনা গেল।

—আকাশলীনা! আকাশ!

আমি নেমে যাই। বাবার সামনে দাঁড়াই। বাবা কেমন সসংকোচে শুধালেন—তুমি বাংলা অনার্স পড়, তাই না?

—কেন!

—না, তাই বলছি। আমার লেখা গদ্য কি তোমার ভাল লাগে?

—না।

আমার কথায় বাবা তেমন আহত হলেন না। এক সেকেন্ডেই সামলে নিয়ে বললেন—আমি জানতাম।

—কী?

—আমার লেখা তুমি পছন্দ কর না।

—লেখার কথা তুমি শুধোওনি। গদ্য কেমন জানতে চেয়েছ।

—প্রবন্ধ-গদ্যের অপ্রশংসা, ধরে নেওয়া যায় রচনারই নিন্দা। তাই না?

—তোমার যুক্তি ভাল। উপমা খারাপ।

—উপমা পারতপক্ষে দিই না। তোমার নামটার মধ্যে একটা লুকনো উপমা আছে বোধ করি!

আমি এবার চুপ করে থাকি। মাথা নিচু করে বলি—কবি সমরেন্দ্রকে একমাস আগে চিঠি লিখেছিলাম। প্রশ্ন করেছিলাম, আপনার দেওয়া আমার এই নামটির শ্রুতি-মাধুর্য ছাড়া আর কী আছে?

—সমরেন্দ্র সবই বলেছে। কলকাতায় এক পাবলিশারের দোকানে দেখা হয়েছে গত সপ্তায়। জানি আকাশলীনা, তুমি কী উত্তর পেয়েছ। বলেই বাবা আমার চোখ থেকে চোখ দ্রুত সরিয়ে নিলেন, কবি সমরেন্দ্রের কথা বলতে বলতে আমি বাবার চোখে দৃষ্টি তুলে ধরেছিলাম। চোখ নামিয়ে নিয়ে বাবা লাঠি ঠুকে ঠুকে বাড়ি ছেড়ে রাস্তার দিকে নেমে চলে গেলেন।

স্বর্ণদীপা। দীপা। আমি চলে যাচ্ছি। সাবধানে থেকো! তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে জানি না। আবার হয়তো পুলিশ আমাকে অ্যারেস্ট করবে।

একথা শুনতে শুনতে মা সেদিন দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠেছিলেন।

—আমি এসেছিলাম একথা কেউ যেন জানতে না পারে স্বর্ণদীপা! মাকেও বোলো না। তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে টের পেলে পুলিশ তোমারই ওপর অত্যাচার করতে পারে।

—মায়ের সঙ্গে একবার দেখাও করবে না?

—তাতে আরও বিপদ হতে পারে দীপা! শোন! খোকাকে মানুষ কোরো। ও জেগে উঠতে পারে। আমি চলি! এখানে খুব অসুবিধা হলে ছেলেকে নিয়ে সন্তোষপুর চলে যেও।

BanglaBook.org

—একথা কী করে ভাবলে তুমি যে, মায়ের ওখানে থেকে আমি রুদ্রকে মানুষ করতে পারব ! ওখানে আমার জায়গা আছে, একথা মনে এল কী ক'রে তোমার ?

—এখানেও তো তোমার সুবিধা হচ্ছে না স্বর্ণদীপা !

বাবা এবং মায়ের জীবনটাকে আমি কতকগুলি কাল্পনিক সংলাপ এবং দৃশ্যের সাহায্যে গড়ে তুলি নিত্যনিয়ত এবং বিশ্বাস করি, আমার গড়ে তোলা কাল্পনিক জীবনটা অসম্ভব বাস্তব, প্রকারান্তরে এই সবই ঘটেছে, তাছাড়া আর কী বা ঘটতে পারত।

আমার বাবার নাম আহসান ইমাম। মা স্বর্ণদীপা ইমাম। দাদা রুদ্র আহসান। আমি আকাশলীনা। সৈয়দা আকাশলীনা। এরকম বিচিত্র নাম ভারতবর্ষে নতুন একটি প্রজাতির নাম বলা যেতে পারে। বাবা এবং দাদা তাঁদের নামের আগে সৈয়দ ব্যবহার করেন, ওই টাইটেল আমার বেলা স্ত্রীবাচক হয়ে আমি হয়েছি সৈয়দা আকাশলীনা। বলা বাহুল্য, স্কুলে ভর্তির সময় দাদির দাবি উত্থাপিত হয় আকাশলীনার আগে সৈয়দা টাইটেল বসাতে হবে। অথচ মায়ের ইচ্ছে ছিল আকাশলীনার আগে পরে কোনও কিছু বসবে না।

আমি যখন ক্লাশ এইটে পড়ি, তখনকার একটি ঘটনা দিব্যি মনে পড়ে। বছরের শেষাশেষি সময়ে আমাদের স্কুলে নতুন একজন অঙ্কের টিচার সদ্য চাকরি পেয়ে এলেন আসানসোল থেকে। আমাদের ক্লাশে সেদিন প্রথম এসেছেন ক্লাশ নিতে। কী করে ওঁর নামটা আমরা প্রায় প্রত্যেকেই জেনে গিয়েছি। হয়তো ওঁর নামের জন্যই ভেবেছিলাম উনি দেখতে খুব ফর্সা হবেন। দেখা গেল উনি যথারীতি কালো।

সে যাই হোক। রোল কল করতে বসে দ্বিতীয় রোল নম্বর ধরে ডেকে উঠেই যেন খানিকটা হোঁচট খেয়ে সৈয়দাকে উচ্চারণ করলেন সাঈয়েদা এবং একটু থেমে আকাশলীনা। তারপর আপন মনে খানিকক্ষণ কী যেন গজগজ করতে থাকলেন। অতঃপর বললেন—অদ্ভুত !

এবং সঙ্গে সঙ্গে গলার স্বর একটু চড়িয়ে বললেন—এমন তো দেখিনি। মুসলমানরা আজকাল এরকম নাম রাখে নাকি ! অনেক অ্যাডভান্সড হয়েছে দেখছি। বাট হোয়াই সাঈয়েদা ?

আমি খুব অবাক হয়ে জানতে চাইলাম—কেন স্যার ?

স্যার বললেন—তুমি কি রাগ করছ ?

বললাম অপ্রসন্ন স্বরে—না। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

তিনি বললেন—আকাশলীনা। এরকম একটা কবিত্বপূর্ণ শব্দের পাশে সাঈয়েদা কিনা ! আচ্ছা সৈয়দ থেকেই সাঈয়েদা, তাই তো ?

—হ্যাঁ।

—সৈয়দ কি খুব অভিজাত পদবী ?

—মনে হয়। পদবী কিনা জানি না।

—তুমি জানো না ?

—আপনি শিক্ষক হয়ে না জানলে আমি জানব কী ক'রে ?

—আমি তো মুসলমান নই। সত্যি বলতে কি তোমাকে দেখেও ঠিক বোঝা যায় না।

—কী ?

—তুমি কি রাগ করছ ?

—আপনাকে দেখেও কিন্তু বোঝা যায় না স্যার !

—কী !

BanglaBook.org

—আপনার নাম আবীরলাল।

—কেন ?

—ভেবেছিলাম আপনি বুঝি খুব ফর্সা হবেন। কিন্তু....

কথা শেষ করার আগেই দেখলাম সারা ক্লাশ হাসির গুঞ্জন তুলেছে। কালো আবীরলালের মুখটা আরও কালো হয়ে উঠেছে। গলার স্বর অতি অসম্ভব গম্ভীর করে হঠাৎ আবীরলাল বললেন—তুমি তো ভারী সেয়ানা !

এই ঘটনায় ক্লাশের বন্ধুরা আমার সাহস আর বুদ্ধির তারিফ করেছিল কেউ কেউ। মেয়েদের মধ্যে দু'একজন অত্যন্ত ভীরু বলে আমার সাহসকে স্পর্ধা বিবেচনা করেছিল। কিন্তু এই তর্কের কথা টিচারসরুম পর্যন্ত কী করে পৌঁছে গিয়েছিল আজও বুঝতে পারি না। আমার ধারণা আবীরলালই হয়তো শিক্ষকদের কাছে গল্প করেছিলেন।

বোধহয় আরবি স্যারের কাছে সৈয়দ পদবী কিনা এবং অর্থ কী, এর উৎপত্তি এবং প্রসার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে থাকবেন—আরবি স্যারও নামের আগে সৈয়দ ব্যবহার করেন।

সেদিনই ফোর্থ পিরিয়ডে আরবি-সংস্কৃত ক্লাশ। যারা আরবি পড়ে, ওই নির্দিষ্ট ক্লাশটির জন্য মূল ক্লাশরুম ছেড়ে অন্যত্র অন্যঘরে আরবি-স্যার মৌলানা সৈয়দ নূর আলির কাছে যেতে হয়। আমি একমাত্র মুসলিম মেয়ে যে কিনা সংস্কৃত পড়ে আর মাত্র একজন মুসলমান ছেলে এই সাবজেক্ট নিয়েছে।

আরবি ছেলেমেয়েরা লম্বা টানা সুদীর্ঘ বারান্দার একপ্রান্তের ছোট আরবিঘরে চলে গেছে। সংস্কৃত-স্যার হরিপ্রসাদ মৈত্রেরও ক্লাশে আসার সময় হয়েছে। আমরা দু'একজন ক্লাশ শুরু হওয়ার আগে বাইরের বারান্দায় অপেক্ষা করছি, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ভিতরে বসে গল্প করছে। এমন সময় আরবি-স্যার বারান্দা দিয়ে চলে যেতে যেতে আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

কাছে এগিয়ে এসে প্রসন্ন হাসি হেসে মোলায়েম করে বললেন—সৈয়দা একটি পদবী বইকি, কিন্তু তুমি বলতে পারনি। বহুৎ শরম কী বাত। তুম সে হুয়ে নিকলা কি, তুম মুসলমান নহী হো। নাম কে আগে সাঈয়েদা লিখনা তুমহারে লিয়ে ঠিক নহী। তোমার মাকে বলেছিলাম, মেয়েকে আরবি দাও, সমাজে থাকতে হলে আরবি-শিক্ষার প্রয়োজন আছে। বাপ জেল খেটে মরছে, দু'টি ছেলেমেয়ে নিয়ে একা সামলাতে পারছ না, সমাজের সঙ্গে গদ্দারি মাৎ করো, এখানে তোমাকে টিকে থাকতে হবে, মেয়ে আরবি শিখবে না, মেয়ের ভবিষ্যৎ ভাল হবে না। ছেলে তো নয়, বিয়ে-শাদী কী করে দেবে ?

ধীরে ধীরে টিপে টিপে সুর করে কথাগুলি আউড়ে যেতে থাকেন নূর আলি মৌলানা।

আমি চুপ করে রয়েছি। আমি জানি, কথা বললে আরবি-স্যার উত্তেজিত হবেন, রেগে যাবেন। কিন্তু নূর আলি খানিকটা সময় চুপ করে রইলেন, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলেন—তুমি চুপ করে আছো কেন ? বলি কি সৈয়দা, নিজের নামের অর্থ-অনর্থ জেনে নিতে হয়, না জেনে বুঝে কাউকে অপমান করা অন্যায়। আরবি শিখলে সহবত শেখা যায়, বাপ তো বিপ্লবী, কখনও যদি দেখা হয়, বলব, বউকে হিন্দু করে রাখলে আমরা সহ্য করেছি, কিন্তু ছেলেমেয়ে যেন নবীর ধর্ম পালন করে। এক নোকতা আরবি না শিখে মুসলমান সেজে থাকা, এটা কি ঠিক করছ, মাকে শুধিয়ে এসো। আর আবীরলালের কাছে মাফি মাঙ্গনা জরুরী হ্যায়, খেয়াল রাখখো। যাও, ক্লাশে যাও।

আরবি-স্যার চলে গেলেন। বারান্দার রেলিঙের থামের কাছে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অবাক হয়ে গেলাম। আরবি-স্যারের চেয়ে আমার ক্রোধ হচ্ছিল অঙ্ক-স্যারের

BanglaBook.org

উপর। কেননা আরবি-স্যারের পক্ষে আরব্য-প্রীতি যথার্থ, তাঁর অস্তিত্ব আরবির সঙ্গে জড়ানো। মুসলমান না হলে তাঁর বেঁচে থাকার সুবিধা থাকে না। আবীরলাল যা করলেন, তাতে রয়েছে এক ধরনের অহংকার। সৈয়দা শব্দটি সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা এবং অবজ্ঞা দুইই সমান এবং এই অজ্ঞতা তাঁর শিক্ষার স্বভাব—মুসলমান সম্পর্কে না জানা যেন একটা দারুণ শিক্ষাভিমান, জেনে ফেললে বোধহয় শিক্ষার অহংকার ক্ষুণ্ণ হয়।

সেদিন ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করতে পারিনি, আমার কান্না পাচ্ছিল। বাপ জেল খাটছেন, মা হিন্দু, আমি সহবত শিক্ষা করিনি, আমার কী হবে? মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনে মনে ঠিক করেছিলাম, কখনওই আবীরলালের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব না। ক্ষমা চাইবার মতো কোনও ঘটনাই ঘটেনি।

তবু মনের মধ্যে বারংবার বিস্ময় উত্থিত হচ্ছিল, সত্যিই কি আমি কোনও অন্যায় করেছি!

মা বলেছিলেন—তুমি সংস্কৃতই নেবে। তাতে করে বাংলাটা ভাল শিখতে পারবে। আর একথা আরবি-স্যারের কাছেও বলেছিলেন মা। সেকথা শুনে উঠোনে মোড়ার উপর বসে থাকা, সাদা ধবধবে কলিদার এবং চুস্তপরা স্যার অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে রইলেন। চোখ তুললে দেখা গেল অসম্ভব থমথমে মুখ। বললেন—তোমার মেয়ে বাঙালি হতে চায়। বেশ, ভাল কথা। মাধ্যমিকে বাংলায় কত নম্বর তোলে দেখা যাবে। তবে আরবি পড়েও বাংলায় ভাল করার নজির এই স্কুলে যথেষ্ট আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। বাংলা ভাল শিখবে এ হল অজুহাত দীপা। অছিলা। আমার আর্জি না শোনার পরিণাম হাড়ে হাড়ে টের পাবে। সমাজটাকে তুমি চিনলে না!

দাদিমা বলেছিলেন—ও আরবিই শিখবে মৌলানাসাহেব। আমি কথা দিচ্ছি।

—না। আপনি কথা দিতে পারেন না। কী শিখলে ওর ভাল হয় না হয় আমাকেই সিদ্ধান্ত নিতে দিন। ওটা আমিই ভাল বুঝব। আরবি-স্যারের সামনেই ব'লে উঠলেন মা। আমি ক্লাশ সেভেনে পড়ি তখন। মনে আছে সব।

মৌলানার সামনে মায়ের জিদ দাদিমার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন ঠেকেছিল। তিনি ক্রমশ অপমান বোধ করছিলেন। হঠাৎ গলা পানসে করে বললেন—তোমার ছেলেমেয়ে আমার পুষ্যি বউমা। যে পোষেপালে তার ইচ্ছে অনিচ্ছের দাম নেই কোনও? বল, দাম নেই?

—আছে।

—কোথায় আছে?

—কেন, ওই সৈয়দা তো আপনারই রাখা।

—জোর করে। প্রথম ভর্তির সময় তুমি নামের আগে ওই পদবী নিতে চাওনি। ছেলেমেয়ের রেজিস্টারি খাতায় নাম উঠছে মেয়ের, কেরানি লিখছে, ওই আমাদের সুদেব কেরানি। মনে আছে? ধর্মের কলমে এসে শুধালে, ধর্ম কী? বলুন কী লিখব? আমি রেগে গিয়ে বললাম, আমার ধর্ম কী জানো না সুদেবলাল?

মা প্রায় স্বগত সুরে বলে ওঠেন—হ্যাঁ, রিলিজিয়ন। তারপর কাস্ট।

—কী বললে? একটু জোর করে বলে শোনাও। মৌলানা শুনে যাবেন।

—কাস্ট।

—হ্যাঁ কাস্ট। ইংরেজিতে লেখা ওই কলমে আমি বললাম, লিখে দাও সুদেব, আমরা সৈয়দ। মেয়ে যখন, সৈয়দা লেখো। দ্যাখো, প্রাইমারিতে হেড-পণ্ডিত মুবারককে লেখা করিয়েছি সৈয়দা আকাশলীলা। এখন ফাইভের অ্যাডমিশনে কাস্ট এসেছে, ধর্মের কলম

BanglaBook.org

আছে। এ ছাড়া ভর্তি করা যায় ? তখন তুমি কী বললে বউমা ?

—রিলিজিয়ন ইসলাম।

—হ্যাঁ।

—কাস্ট, সুন্নী।

—তাহলে ? কোথায় যাবে তুমি ?

—একদিন এ সবকিছু থাকবে না মা !

—যখন থাকবে না তখন দেখা যাবে। এখন তো আছে। ওইসব কথা যদি না লিখতে, মেয়ের ভর্তি হওয়া হত ? দ্যাখো, এই মেয়েকে নিয়ে বচসা করতে তোমার বাধে না ? ওকে জাত দাও, ধর্ম দাও। প্রমাণ কর, ওর বাপ আছে। ও মাগনা দুনিয়ায় আসেনি।

—মা ! স্বর্ণদীপা কেমন আর্তনাদ করে উঠলেন। সেই চাপা আর্তস্বর উপভোগ করলেন মৌলানা নূর আলি। দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মুখে ভেসে এসে লাগল স্মিতরেখার হাসি, পরম হৃষ্টভাব খেলে উঠল মুহূর্তে

আমার বাবার জীবনের সমাজ বদলানোর সহিংস রাজনীতির প্রায় কোনও সমর্থনই এই গ্রাম-সমাজে ছিল না। মৌলানাদের দুর্বোধ্য ক্রোধ ছিল বাবার উপর। স্বর্ণদীপাকে ভালবেসে বিয়ে করে ইমাম যে অপরাধ করেছিলেন, সেই অন্যায় শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের জন্য। আমাদের জীবনের সমস্ত ক্ষতি এই সমাজের বৃহদংশের মানুষ উপভোগ করতে চেয়েছে। তারা দেখতে চেয়েছে, আহসানের ছেলেমেয়ে দু'টি মানুষ হচ্ছে না। স্বর্ণদীপা পাগলের মতো কী করে সন্তানদের টেনে নিয়ে ফিরছে, তা দেখে তারা আনন্দ পেয়েছে।

সেই আনন্দেরই অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছিল সেদিন নূর আলির মুখে। আজ বুঝতে পারি, আমার জন্মের দোষ ছিল আর আমাকে জাতধর্ম দিয়ে সেই কারণে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার দরকার বোধ করেছিলেন দাদিমা। অথচ আমার জন্ম সত্যিই যে অবৈধ তার প্রমাণ কখনও দাদিমাও দেখাতে পারেননি। যেহেতু মায়ের হাতে বৈধতার প্রমাণও কিছু ছিল না। তাই দুর্জ্ঞেয় জন্ম আমার, বড়ই অসহায়। অবশ্য ধীরে ধীরে একদিন বুঝতে পেরেছিলাম, মাকে কলঙ্কিত করার একটা ছুতো সমাজই খাড়া করে তুলেছিল।

বাবার গোপন সংবাদ মায়ের কাছে পৌঁছে দিত এমন একজন, যার চরিত্রের সুনাম ছিল না। জেলা-শহরে তার কুখ্যাতি ছিল মস্তান হিসেবে। আমাদের গঞ্জ এলাকায় লোকটা মাঝে মাঝে টহল দিতে আসত। শোনা যেত স্বরূপগঞ্জে লোকটার চেন আছে। ওর চেলাচামুণ্ডা বদ সাগরেদরা তোলা তুলে বেড়ায়। বাবার দলের নামে তোলা নেয়।

একজন অত্যন্ত খারাপ লোক, অথচ অমন ভদ্র চেহারা কল্পনা করা যায় না।

—লোকটা তোমার কাছে আসে কেন ? কে লোকটা ? কঠোর গলায় দাদিমা জানতে চাইলেন একদিন।

মা বললেন—ও একজন। আসে।

—কেন আসে, তাই পুছতাছ করছি বউমা।

—ওর কাছে রুদ্রর বাবার খবর থাকে।

—গাঁয়ের মোড়লরা গাওনা করছে, লোক ভাল নয়। ওর দেওয়া পয়গাম তুমি একিন করো ?

—করি।

BanglaBook.org

—কেন কর ! তুমি আমাকে আর কত বিপদে ফেলবে বউমা !

—না, ফেলব না। আপনার ছেলেই ওকে পাঠিয়েছে। সঙ্গে চিঠি এনেছিল।

—একথা যদি প্রকাশ পায়, বিপদ ঠেকাতে পারবে ?

—আমি আপনাকে বলতে চাইনি।

এই সংলাপ এবং দৃশ্যগুলি আমার রচনা। অর্থাৎ এগুলি আমি কল্পনা করে নিতে পারি। কারণ আমার তখনও জন্ম হয়নি। সেই অত্যন্ত খারাপ লোকটার নাম ছিল অনন্ত। অনন্ত কাকা।

একটা কাহিনী আমি ক্রমশ খাড়া করে তুলছি। এই জন্যেই এটাকে আমি কাহিনী আখ্যা দিচ্ছি যে, এ কাহিনীর অনেক কথা কল্পনা দিয়ে গড়া। আমি যা দেখিনি অথচ আমি যা জানি, যা শুনিনি, অথচ যা শ্রুতির অগোচর থাকে না, যা ইচ্ছে করলেই শোনা যায় ; দৃশ্যে, কথায় এবং ভাবের মগুনে মূর্তি ধরে, তারই নাম কাহিনী। এ কাহিনীকে যদি মাতৃতান্ত্রিক গল্প নাম দেওয়া যায়, তবে মন্দ হবে না। মা আমার সব।

তবে গল্প জিনিসটা তোয়ের করা অনুশীলনের ফল। ওসব আমার অভ্যেস নেই। তাহলেও সব মানুষেরই গল্প বলার একটা লোভ থাকে। আমার এ কাহিনীর শ্রোতা হল আমার একটা ছোট আয়না। হাত-আয়না। গোল। আমার মুখটুকুও তাতে ধরে না, উপচে যায়।

এখানে একটা ঘর আছে। মাটির কাদা লেপা দেওয়াল। এখানে দাদিমা মাঝে মাঝে এৎকাফ নেন। এৎকাফ কথাটির সঠিক অর্থ আমি জানি না। এই ঘরে ঢুকে দাদিমা দোর বন্ধ করে খোদার নাম করেন। তিনদিন হয়তো পড়ে রইলেন ঘরে। অত্যন্ত সাবধানে চৌকাঠের তল দিয়ে খাবারের থালা ঢুকিয়ে দিতে হয়। সেই সব খাবার দাদিমা খান বলে তো মনে হয় না।

ইত্তেকাফ অথবা এৎকাফ নিশ্চয়ই ধ্যানমগ্ন উপাসনা। ভাব-সমাধি যেমন। এ এক কঠিন তপস্যা। সংসার থেকে হঠাৎ নেওয়া স্বেচ্ছানির্বাসন।

—ওই ঘরে অমন করে যাও কেন দাদিমা ?

—যেতে হয় মা !

—কেন ?

—সংসারে অনেক কালিমা, শঠতা, বঞ্চনা খুকি ! ওই ঘরে গিয়ে সব সাফ করে আসি। ওখানে খোদাকে পাই। খোদা আর আমি। কেউ নেই আর। খোদার ৯৯টা নাম। যে কোনও একটা ধরে জপি। ধ্যান বোঝো না ?

দাদিমার এৎকাফ ঘরখানির ভিতরে ঢুকে আমি দেখেছি। আমার বয়েস তখন চৌদ্দ বৎসর সবে পড়েছে। আমার জেদাজেদিতে পরাস্ত হয়ে দাদিমা আমাকে ওই ঘরে ঢুকতে দিয়েছিলেন। অবশ্য তার আগে ভাল করে আমাকে চান করিয়ে শুদ্ধ পোশাক পরিয়ে তবে ঢুকতে দেন, সেকারণে মনে আছে সব। তাছাড়া এ ঘটনা ভোলাও যায় না।

কী দেখেছিলাম সেই ঘরে ? মাটির দেওয়ালে পোঁতা আছে কিছু ভাঙা আয়নার বিম্বক্ষম কাঁচ, তাতে ছায়া পড়ে। একখানি নামাজ পড়ার আসন, রঙিন মাদুর, তার ওপর বিছিয়ে দেওয়া মক্কার কাবাশরিফের ছাপঅলা বড় রুমাল। উঁচু তেপয়ার উপর ছোট কোরানশরিফ এবং দেওয়ালের তারকাঁটার গোঁজে ঝুলন্ত তসবিহ্। মোতিশুভ্র ঘরের ছিদ্রপথে আলো এসে পড়েছে। জ্বলজ্বল করছে সেই জপের মালাটি। কোরানশরিফ সাদা কাপড়ে জড়ানো।

একজন মানুষ যখন নামাজি মুদ্রায় ধ্যানে বসেন, তখন বিম্ব পড়ে দেওয়ালের পোঁতা

আয়নায়, দু'পাশে এবং পিছনে। একজন মানুষ দেখতে পান, হেথা তাঁর ছাড়া আর কোনও প্রাণিবিম্ব নেই। প্রাণ বলতে তিনি আর জীবন্ত বলতে কোরান। তেপায়ার তলে একটি গোল ক্ষুদ্র আয়না পড়ে আছে, তাতে ছায়া পড়েছে তেপয়ের।

—এই গোল আয়না কেন দাদিমা ?

—ওটা থাকে লীলা !

—কেন থাকে ?

—দরকার হয়।

—কী দরকার হয় ?

—মুখ দেখি।

—কেন ?

—সুর্মা দিই চোখে।

—কেন ?

—নজর বাড়ে। নবীর সুর্মা কিনা ! তুর পাহাড়ের সুর্মা।

আমার অবাক লাগছিল সব। স্বল্প আলো আসছে ঘরে। আয়নায় ছায়া পড়েছে, আমারই ছায়া। কিন্তু ছায়া মাত্র। স্পষ্ট অবয়ব নয়। কারণ এঘরে আলোর স্পষ্টতা নেই। আমিই অজস্র ছায়ায় পরিণত হয়েছি। ছায়ামূর্তি না বলে ছায়ামুখ বলা যায়।

—এত ছায়া কেন দাদিমা ?

—এ সবই তুমি। তুমি ছাড়া কেউ নেই। আসগর আলি মস্তানা পীরজাদা এই কল্পনা দিয়েছে মা। এ ঘর শরিয়তপন্থীরা চেনে না। শরিয়তীরা দু'তিনজন একসাথে ঘরে ঢুকে এৎকাফ নেয় আর কপাল ঠুকে সালাত কায়েম করে।

—সালাৎ ?

—হ্যাঁ মা। নমাজ।

—তুমি নমাজ কর না দাদিমা ?

—না।

—কী কর তাহলে ?

—নাম জপি। একটা যে কোনও নাম। বলি রব রব রব। রব মানে খোদা। সহস্র মুখে এক নাম। রব, রব, রব। শরিয়তপন্থীদের ঘরে আয়না থাকলে নমাজ হয় না, নিজের ছায়াকেও তারা মূর্তি মনে করে। ভাবে, নিজেকেই সিজদা করছে। আমি বলব, শরার মানুষ এৎকাফ বোঝে না।

—কেন ?

—এৎকাফের ঘরেও তারা পাঁচ রোকনের এক দুই রোকন সঙ্গে বেঁধে আনে। রোকন বোঝো ?

—না।

—রোকন হল খুঁটি। স্তম্ভ। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত আর কলমা। ইসলামের পাঁচ খুঁটি। তার উপর ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে। আসলে দাঁড়িয়ে রয়েছে শরিয়ত। প্রকৃত ইসলাম দাঁড়িয়ে থাকে মানুষের আত্মার উপর। কল্‌ব-এর উপর। এই বুকের বাঁ পাশে কল্‌ব আছে। ধুকধুক করছে আর উচ্চারণ করছে রব, রব, রব।

—কী বলছ তুমি দাদিমা !

—হ্যাঁ মা আকাশ। এৎকাফে নমাজ লাগে না। সংসারে তুমি আছো, শরায় মজে রোকনে বেঁধে সেই সোনার আত্মাকে শায়েস্তা করছ পাঁচবেলা। আর এই ঘরে রয়েছে

BanglaBook.org

মারেফতের পথ। মারফতী লাইন, এখানে আছো তুমি আর খোদা। তুমিও যা খোদাও তাই। পীর বলেছেন, শরিয়তপন্থীদের এ ঘর দেখাবে না জৈবুনউন্নিসা। ওরা তোমাকে মারবে, কাটবে। তোমাকে অবিশ্বাস করবে।

—তুর পাহাড়ের সুর্মা দাদিমা, সেটা কেন ?

—ওই পাহাড়ে নবী পয়গম্বর এৎকাফে যেতেন।• কথা হল 'শৌখে দিদার অগর হ্যায় তো নজর পৈদা কর।' খোদার দর্শন চাও, তবে তোমার নিজেকেই নিজের দৃষ্টিদান করতে হবে। কামেল পীরের কথা মা ! গুরুতর কথা কি জানো ? এ হল আত্মদর্শন।

—জি দাদিমা !

—প্রথম নবী আদম। এই দুনিয়া তাঁর কাছে আশ্চর্য, পরমাশ্চর্য বস্তু। কিন্তু যেদিন তিনি শান্তজলে নিজের ছায়া দেখলেন, আশ্চর্যের আর শেষ রইল না। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল, তাহলে এই আমি ! আমি একরকম ! কোথা থেকে এলাম ? কেন এসেছি ? কোথায় যাব ? কেনই বা যাব ? আদম সেই প্রথম মানুষ যিনি কখনও মানুষের মৃত্যু দেখেননি, অথচ একদিন তাঁরই চোখের সামনে নিজের দুই সন্তান মারামারি করল এবং এক ভাইয়ের হাতে আর এই ভাইয়ের মৌৎ হয়ে গেল। আদম দেখলেন, মানুষের মৃত্যু হয়। মানুষ থাকে না।

বলতে বলতে দাদিমা হু হু করে কেঁদে ফেললেন। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠলেন—আদমের চোখের সামনে সন্তান মরল। হত্যা। হিংসা। আর আমার সন্তান, একমাত্র সন্তান কিভাবে মরে যাবে আমি জানতেও পারব না। কেন এই মাটির কোলে জন্মেছি, এত কষ্ট মা গো ! আমি যে আর পারি না স্বর্ণদীপা !

এৎকাফ ঘরের বাইরে মাটির পৈঠায় বসে দাদিমা কেঁদে যাচ্ছেন, এই দৃশ্য কল্পনায় তৈরি করতে হয় না। এ ঘটনা বাস্তবিক ঘটেছে, মা বিস্ময়ে বেদনায় অভিভূত হয়ে দাদিমার কান্না দেখছেন অপলক, আমার মনে পড়ে।

ধর্ম-দর্শনের এমন উপলব্ধির কথা যাঁর মুখে শুনেছি, যেন তাঁকেই দেখেছি শরিয়তী-নিগড়ে বদ্ধ জীব, এৎকাফ শেষে ক্রমশ বদলে যাওয়া মানুষ। এৎকাফ শেষ হলে দু'চার দিনেই তাঁর আত্মদর্শনের ঘোর কেটে যায়। বস্তুত তিনি তাঁর এৎকাফের গোপন জীবনকে শরিয়তের ভয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখেছেন চিরকাল।

দাদিমাকে সংসারে রোকনের বেড়িপরা এক নিষ্ঠাবতী প্রৌঢ়া ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। তাঁর সামনে জলকে পানি উচ্চারণ করতে হয়। স্নান না বলে গোসল বলতে হয়।

এৎকাফের ছায়া-শরীর যখন রক্তেমাংসে জাগ্রত হয়ে চোখের সামনে ঘোরাফেরা করে তখন তাকে ভয় করে। কখনও মুখ ফসকে জল বার হয়ে এলে ভয়ে চোখে পানি এসে পড়ে।

এই দাদিমায়ের জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ, তিনি স্বর্ণদীপাকে মুসলমান করতে পারেননি।

—তুমি আমার ধর্ম নিলে না বউমা !

—কোনও ধর্মাচার আমি করি না। আপনার ছেলেও করে না। তাহলে এ প্রশ্ন কেন তুলছেন ! আমরা পরলোক, স্বর্গ-নরক, ঈশ্বর বিশ্বাস করি না। এমনকি ধর্মকে মানবতার শত্রু এবং কুসংস্কার মনে করি। আমি চাইব, আমার ছেলেমেয়ে যেন কোনও ধর্ম পালন না করে।

—ধর্ম ছাড়া মানুষ হয় ?

—হয়।

BanglaBook.org

—গায়ের জোরে একথা বলছ তুমি ?

—আপনার মনে আঘাত দিতে আমি চাই না। ধর্ম আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কারণ প্রত্যেক ধর্ম ব্যক্তি-মোক্ষের কথা বলে। পাপের ভাগ কেউ নেয় না, পুণ্যের ভাগও কাউকে দেওয়া যায় না। রত্নাকরের গল্প তো আপনি জানেন। বাল্মীকির কথা। রত্নাকর ডাকাতি করত, সেই পাপের ভাগ তো স্বামীপুত্র কন্যা কেউ নিতে চায়নি। ওই জন্যে বলি, ধর্ম ব্যক্তিগত জিনিস। কারও বিশ্বাস থাকলে তিনি করবেন।

—তুমি করবে না ?

—না।

—তোমার ছেলেমেয়ে ?

—আগেই বলেছি, আবার বলছি, তারা যদি ভাল মনে করে, ধর্ম করবে। বাধা দেব না। তবে উৎসাহও দেব না।

—বেশ।

—হ্যাঁ। তারা যদি মনে করে দাদির ধর্ম ভাল তাই-ই তারা করবে। যদি মনে করে বাপমা যেমন আছে, তারাও তেমনই কাটাবে, তাই-ই করবে তারা।

—তাহলে তোমার ছেলেমেয়ে জলকে পানি বলবে না ?

—কেন ?

—তুমি তো বল না।

—বলি না এই জন্যে যে, জলকে পানি বা পানিকে জল বলার ধর্মকে ঘৃণা করি। এই ঠেলাঠেলির নাম সাম্প্রদায়িকতা, এটা ব্যাধি। রোগ। ধর্ম নয়।

—নয়ই তো।

—তাহলে এ প্রশ্ন করছেন কেন ?

—করছি এই জন্যে যে, এই দেশে ধর্মের বিপদ হয় না, সম্প্রদায় বিপদে পড়ে। আমি মনে করি তোমার ছেলেমেয়ে পানি বলতে শরম [illegible] লজ্জা করে।

—অন্য রাজ্যে গেলে দেখবেন, হিন্দুরাও পানিই বলছে।

—এ রাজ্যে তুমি তাহলে জলই বলতে চাও ?

—দেখুন, এই তর্কের তো মানেই হয় না। ঠিক আছে, অ্যাই লীনা এদিকে আয় ! আয় বলছি এদিকে !

মা সহসা যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়ে ছুটে এসে আমার হাত ধরে হেঁচকা টেনে নিয়ে গিয়ে দাদিমার সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন—শোন ! দাদিমার সামনে পানি যেন কখনও জল না হয় ! পানিকে পানি বলতে পার না ?

বললাম— পারব কী করে মা ? সন্তোষপুরে দিদার সামনে গেলে পানিকে যে জল বলতে হয়। পানি বললে ছোটমাসিরা হাসাহাসি করে বলে, সৈয়দা পানি চাইছে গো ! যেই পানি বলা, অমনি আমাকে লীনা না বলে সৈয়দা ডাকে। আমার খুব কান্না পায় মা !

কী তুচ্ছ ঘটনা, অথচ তাতেই চোখে অশ্রু ঘনিয়ে ওঠে। আমি ভাবি, ছোট মাসীরাই বা অমন হাসে কেন, সৈয়দা ডেকে হঠাৎ পর করে দিতে চায় কেন ? সৈয়দা দাদিমার তকমা, এই লজ্জে তাঁর মুসলমানি আভিজাত্যের ঠিকানা। ফের ওই শব্দই আবীরলালের সংশয় কৌতূহল। এই সৈয়দাই নূর আম্মির আক্রমণস্থল। জানি, দাদিমার লক্ষ্যবিন্দু আমি, আমাকে তিনি তাঁর মতো করতে চান। আমাকে দিতে চান তাঁর জাতধর্ম। ছাত্রছাত্রীর রেজিস্টার্ড খাতা থেকে তিনি তাঁর জাতধর্মের সমর্থন খুঁজে বার করতে পারেন।

BanglaBook.org

দাদিমা আমার চোখের জল দেখেন না। তাঁর কি চোখে পড়ে না, আমি কাঁদছি! আমার অশ্রুর সামনে মা অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। তবু জানি দাদিমা আমাকে ভালবাসেন।

একদিন ফজরবেলা, সেই খুব প্রত্যূষলগ্নে আমি দাদিমার নামাজ-নিষিক্ত মূর্তির সামনে মেলে ধরি এৎকাফের গোল আয়না। দাদিমা দু'দিন আগে এৎকাফ থেকে বার হয়েছেন, এখনও তাঁর চোখে পবিত্র তুর পাহাড়ের সুর্মা, এখনও তিনি এবং তাঁর ঈশ্বর একাকার। আয়নায় বিম্ব পড়ে তাঁর। তিনি চমকে উঠে বললেন—এ কী করেছ তুমি ; এই আয়না বার করে আনলে কেন আসমানতারা ?

—আমি এটা নেব দাদিমা ! দাও না আমাকে !

—কী করবি তুই ? ও রে এ দিয়ে কী হবে তোর ? রেখে আয়, রেখে আয়। যাঃ ! পীরের জিনিস মা !

—না, এটা আমি নেব ! নষ্ট করব না, বলে দিচ্ছি তোমাকে ! আমি মুখ দেখব এতে !

হঠাৎ দাদিমা কী ভেবে খুশি হয়ে বললেন—ঠিক আছে, রাখ ! যখন চাইব দেবে কিন্তু !

আয়নার সামনে আমি বলে চলেছি আমার বৃত্তান্ত।

২. অজুর ঘোড়াগাড়ি এবং প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

রুদ্র আমার চেয়ে দেড় বছরের বড়। তাইতেই ও আমার উপর হামেশা গার্জেনি করে। আজ ঈদের দিনেও ও কিন্তু স্বরূপগঞ্জে আসেনি, কলকাতায় ওর ছাত্রাবাসে থেকে গিয়েছে।

রুদ্রকে সুর্মা পরতে হল না, ঈদের নামাজ পড়তেও হল না। খুব ভোরে একটা ঘোড়াগাড়ি করে বাবা চলে গিয়েছেন চাঁদেরঘাট, দাদিমাকে হয়তো বলে গিয়েছেন, ওখানেই তিনি ঈদের নামাজ পড়ে নেবেন। একথা না বলে গেলেও দাদিমাকে ধরে নিতে হবে বাবা সেই রকমই একটা চান্স নেবেন। বলা বাহুল্য, ঘোড়াগাড়িতেই বাবার ঈদের নামাজের সময় কাবার হবে, গাড়ির চালক বাবার চেয়েও কড়া ধর্ম-বিদ্বেষী। ওর নাম অজু, বাবার এককালের কমরেড।

বাবা যখন বার হচ্ছেন, দাদিমা একটু পানসে করে বলেছিলেন—ঈদের দিনে অজুর গাড়িই তোমার পছন্দ হল বাবা !

বাবা বললেন—অজু ছাড়া আর কেউ রাজি হল না মা ! লম্বা রাস্তা, অজুর তাজী ঘোড়া আছে, চাঁদেরঘাটে আমার খুবই কাজ মা !

—নমাজ ধরতে পারবে ?

—দেখি।

বাবা একপ্রকার দাদিমাকে ওই দেখি-র সংশয়ে জানিয়ে গেলেন, রাস্তায় অজুর ঘোড়ার পায়ে বাতের ব্যামো ধরবে। নামাজ তিনি পড়বেন না।

বাবা যখন লাঠি ধরে রাস্তায় নেমে গিয়েছেন, অত্যন্ত কষ্টে কাঁপতে কাঁপতে অজুর গাড়িতে উঠছেন, তখনই ফরহাদ এল। বাবার একহাতে লাঠি, অন্য হাত ফরহাদের কাঁধে। ফরহাদ আমার বাবার দ্বিতীয় অবলম্বন। অনেক সময় চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়, বাবার দু'হাতে দু'টি নির্ভর, একটি কাঠের অন্যটি রক্তমাংসের। যখনই বাবা

BanglaBook.org

গ্রামে বা আমাদের জেলা-শহরে এসে থাকেন, তখনই দেখতে পাই, ফরহাদ নইলে বাবা এক পা-ও নড়তে পারেন না। কথাটি আক্ষরিক এবং ভাবার্থেও সমান সত্য। লাঠির সঙ্গে বাবার মানসিক সম্বন্ধ ওতপ্রোত, ঠিক একই সম্বন্ধ ফরহাদের স্কন্ধ অবলম্বনে জড়িত।

যার উপরে প্রতি দণ্ডে মানুষকে নির্ভর করতে হয় তা যদি নিষ্প্রাণ পদার্থ বা দ্রব্যও হয় তবু তারই মধ্যে মানুষ একপ্রকার প্রাণ সঞ্চার করে নেয়, লাঠি যেন বা বাবার সঙ্গে কথাও বলতে পারে। লাঠির উপর বাবার মমত্ব স্বাভাবিক। ভাবি, লাঠির বেলা যদি এই-ই হয়ে থাকে, তাহলে ফরহাদ সম্পর্কে বাবার নির্ভরতা কত গভীর, দুর্বলতাও কত গুরুতর! কিন্তু ফরহাদ শুধু কোনও দেহ নয়, ও এক গভীর মস্তিষ্ক এবং আশ্চর্য চরিত্র।

ও এবার এম এস সি ফাইনাল দিয়েছে। ম্যাথস অনার্স ছিল। ও রুদ্রকে অঙ্ক শিখিয়েছে, গৃহ শিক্ষকের মতো। কিন্তু ওকে কখনও দাদিমা অথবা মা মাইনে দিয়ে গৃহ-শিক্ষক বানাতে পারেননি। ও কারও শিক্ষক হতে চায় না। দাদিমাকে বলে—দ্যাখো নানী, ওই মাস্টারি জিনিসটা আমার ভারী অপছন্দ। দাদিমাকে নানী ডাকে ফরহাদ।

—তাহলে পাশ করে কী করবে? মা শুধালেন।

ফরহাদ বলল—দেখুন মামি, আমার সাবজেক্টটা খুব ভাল। জ্ঞান দিতে হয় না। কষে দেখালেই চলে। হায়ার ম্যাথ ইজ নট এ কাপ অফ টী, এ ম্যানস কাপ অফ টী। জানি, অঙ্কের খুব ওপরের জায়গায় কিন্তু দর্শন এসে পড়ে। কিন্তু আমি যা শিখব এবং শেখাব তাতে দর্শনের আমল নেই, তাই জ্ঞান দিতেও হবে না। অতএব ফার্স্ট কেলাশ। দুধে জল মেশানোর অঙ্কে লাভ লোকসানের হিসেব। যেমন সমাজ তেমনি তার অঙ্ক—এতে কী মাস্টারি করব বলুন তো!

এই জন্যেই ফরহাদদাকে আশ্চর্য লাগে। সমাজকে ও খোঁচা না মেরে কথাই বলতে পারে না—এদিকে ওর অসম্ভব শক্তিশালী মস্তিষ্ক, যদিও তার নিজের কাছে, ওই মস্তিষ্ক একটা এলেবেলে ব্যাপার।

ও আমার হাত ধরে টেনে সেই চৌদ্দ-পনেরোয় একদিন বললে—শোন্ লীনা। তোদের জলপানির সমস্যাটা হল গে কালচারাল প্রবলেম, রিলিজিয়াস প্রবলেম। বুঝলি তো, এই জিনিসটার একটা সায়েন্টিফিক সলভেসন আছে। আমাকে তুই দিদার গঙ্গাজল আর দাদির জমজমার পানি দে, তারপর চ ল্যাবরেটারিতে গিয়ে দেখি সমস্যাটা কী দাঁড়ায়। আমার চোখে জলপানি, মানে জল অথবা প্যানি হল, এইচ-টু-ও (H_2O)।

একটু থেমে ফরহাদ বলল— দু'ভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন। ব্যাস! নো প্রবলেম। ধর্মের কোনও গ্রন্থে নেই, হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মেশালে জল হয়। এত জলবৎ তরলং জিনিসটাকে এমন শক্ত করে তোলা হয়েছে যে তুই কাঁদছিস। ধ্যাত, এটা কি একটা সমস্যা নাকি!

—তোমার সব ব্যাপারটাই সহজ। বলেছিলাম আমি। তারপর বলেছিলাম—তুমি কিচ্ছু জানো না।

তা শুনে ফরহাদের সেই চওড়া আর উচ্চ হাসি, ওই হাসি শুনলেই মনে হয়, ওর বুকটা কত বড়। আর চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়েসেই আমার মনে হয়েছিল ওর কাছে সবকিছুর সহজ সমাধান আছে। ও আমার হাত ধরে আছে, সেই প্রথম মনে হয়েছিল, এই হাত কখনও কারও ক্ষতি করে না। এই হাত দিয়ে ও কত জটিল অঙ্ক করে ফেলে, ওর গণিত-জ্ঞান স্কুলের স্যারদের হামেশা টপকে যায়। শোনা যায় স্যাররাও ওকে সমীহ

BanglaBook.org

করে। ও আমাকে অঙ্কের ধাঁধা শিখিয়েছে দু'টো, বলেছে আরও শেখাবে।

—আমি অঙ্কে এত কাঁচা, তোমাকে বললেই বলবে, জলবৎ তরলং। কিন্তু মাথাটা একদম খাটে না। কেন বল তো! ইস! আমি যদি তোমার মাথাটা পেতাম!

—নিবি, নে। কেটে নে। আমি দিয়ে দিচ্ছি, দেখবি কী হয়!

—কী হবে? জেল হবে আমার, তোমার মাথা আমি কেটে নিতে পারি?

—আমিই তো দিচ্ছি তোকে! জেল কেন হবে! তোকে পাশ করতে হবে। অঙ্কে ভাল রেজাল্ট করতে হবে। তারপর তুই বড় হবি। ভাবি, আমার মাথা কি সত্যিই তোর কাজে লাগবে! দ্যাখ, আমার চেহারাটা একদম ভাল নয়। এই মুখের দিকে কতক্ষণ চেয়ে থাকতে পারবি, মাথার ভেতরটা তো দেখা যায় না লীনা, আর তা দেখতেও সুন্দর নয়। কী হবে এই মাথা নিয়ে?

—তুমি বুঝি সুন্দর নও?

—নাহ্।

—একদম বাজে কথা!

—আচ্ছা, তোর.....বলেই আবার চওড়া হাসি। তারপর ফরহাদ বলেছিল—আমি তো কালো রে! তোর ফেবারিট কে? উত্তমকুমার না সৌমিত্র?

—দেখিনি।

—তুই এদের কারও সিনেমা....

—একটা দু'টো দেখেছি, সুচিত্রা ছিল। একটার নায়ক অশোককুমার, আরেকটার বসন্ত চৌধুরী আর হ্যাঁ আরও একটা দেখেছি, ওমা তাতেও উত্তম নেই। বিকাশ রায় নায়ক, না, ওটা ওই আর একজন, কে ঠিক মনে পড়ছে না।

—বেশ। তোকে আমি দেখাবো।

—কী হবে?

—দেখবি। আবার কী! নায়কদের পছন্দ না করতে পারলে আধুনিক হওয়া যায় নাকি!

—ওর কাছে আর সিনেমার গল্প করতে হবে না ফরহাদ, ওর হাত ছেড়ে দাও! হঠাৎ এ ঘরে এসে মা বলে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফরহাদ কেমন হয়ে গেল। বড়ই অপ্রস্তুত দেখালো তাকে। হাত ছেড়ে দিল সে। কখনও সে আর আমার হাত ধরেনি।

ফরহাদ, তুমি সেই নায়ক নও যে কিনা নায়িকার চট করে হাত ধরতে পারে। তুমি আমাকে আধুনিক হওয়ার পরামর্শ দিয়ে নিজে থেকে যাও উত্তমকুমারের মতন পুরনো। উত্তম সুচিত্রার একটি আলিঙ্গন দৃশ্যের জন্য একদা সিনেমা-পরিচালককে সমস্ত ফিল্ম খরচ করে সিনেমার শেষ দৃশ্যের জন্য অপেক্ষা করতে হত।

ফরহাদ সেদিন সংকোচে হাত ছেড়ে দিয়েছিল, কেন অত লজ্জা পেয়েছিল বুঝতে পারি, মায়ের গলায় এক অসম্ভব অসহিষ্ণুতা খেলে উঠেছিল, আমার হাত ধরে কথা বলা মায়ের চোখে শোভন হয়নি। অথচ আমার মন কেবলই চাইছিল, ফরহাদ যেন আমাকে ছেড়ে না দেয়। ও যে অঙ্কের ম্যাজিক জানে, ও ম্যাজিকের মতো অঙ্ক করতে পারে, ও সমস্ত জটিল সমস্যার ভার লাঘব করে দিতে পারে অদ্ভুত কথায়। একটু ছেলেমানুষিও থাকে হয়তো ওর কথার সহজ সমাধানে, কিন্তু ওর সব কথা আমার বিশ্বাস করতে ভাল লাগে।

ফরহাদ আমাকে ক্লাশ টেনের পাটিগণিত করাচ্ছে সেদিন, তখন আমি ষোল। মাঝখানে ছোট টেবিল, দু'টি চেয়ারে মুখোমুখি আমরা। সেদিনই আবীরলালের সঙ্গে

স্কুলে কথা কাটাকাটি হয়েছে, নূর মৌলানা ক্ষমা চাইতে বলেছেন, স্কুলের ঘটনা আমি কাউকে বলিনি বাড়িতে।

ভেতরে ভেতরে একটা অব্যক্ত অপমানবোধ এবং দুর্বোধ্য কষ্ট ছিল ; মনে হচ্ছিল আবীরলালের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়াই কি উচিত ? কী বলে চাইব সেই ক্ষমাটুকু ? ক্ষমা চাইতে যে লজ্জা করবে আমার !

—জানো, ফরহাদদা, স্কুলের নতুন অঙ্ক স্যারকে আমি....বলেই গলার স্বর বুজে এল। স্বর বুজে এল, মাথাটা আমি আমারই বুকে যেন লুকিয়ে ফেলতে চাইলাম, চোখ নত, ঘাড় ভেঙে পড়েছে, হঠাৎ হাত-ফাঁসে পাকানো বেণীচূড় ঘাড়ের পিছনে খসে গেল। আমার মাথায় অনেক বড় চুলের কালো গোছ। চোখ ছলছল করছে।

ওই অবস্থায় টেবিলে ফেলে রাখা আমার নিটোল হাতের একটি ফরহাদের হাতকে ধরবার জন্য অজান্তে এগিয়ে গেল। মন বলছিল ওকে ছুঁতে পারলে আমার কষ্ট দূর হবে। মন যা বলে, তা যে কেউ শুনতে পায় না।

আমার হাত একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিল আর ওর হাত একটু একটু করে সরে যাচ্ছিল—তারপর ফরহাদ হাত গুটিয়ে তুলে নিল গালে এবং অপর হাতখানি টেবিলের তলে কোলে রাখল। অবাক হয়ে শুধাল—নতুন অঙ্ক স্যারের সঙ্গে কী হয়েছে ?

আমার আর কথা বলতেই ইচ্ছে করল না। যদিও মনে হচ্ছিল স্কুলের ঘটনার কথা ফরহাদকে না বলতে পারলে মনের উপর চেপে থাকা ভার হালকা হবে না। কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হল, যাকে আমি স্পর্শ করতেই পারি না, তাকে কেন গোপন বিপন্নতার কথা বলব ?

—বল, কী হয়েছে ? কথা বল !

—না। ও তোমাকে বলা যাবে না। কাউকে বলা যাবে না। তুমি কিচ্ছু বোঝো না ! আমার অনেক দোষ আছে। আমারই দোষ। আমার জন্মের ঠিক নেই। বলতে বলতে গলায় কান্না আটকে যায় এবং হঠাৎই শব্দ করে কেঁদে উঠি।

তারপর সহসা মনে হয়, এভাবে কান্না অনুচিত। মা যদি দেখে ফেলেন নির্ঘাত ফরহাদকেই ভুল বুঝবেন। আমি প্রবল চেষ্টায় কান্না দমাতে মুখে উড়নির আঁচল চেপে ধরি।

আমার জন্মের ঠিক নেই বলা মাত্র দেখি কান্নার সম্মুখে বিচলিত ফরহাদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক নিমেষ দাঁড়িয়ে থাকার পর বলল— আমি আজ চলে যাচ্ছি লীনা ! আমার কাজ আছে। একটা কথা খালি বলে যাচ্ছি, শুনে রাখো, তোমার জন্ম সম্বন্ধে লোকে যা বলে, আমি তা বিশ্বাস করি না। একথা তুমি যদি আর কখনও আমার সামনে বল, আমি তাহলে আর এ বাড়ি আসব না। এই সব কথা তোমার বাবার কানেও গেছে। অনেক আগেই গেছে। ভাবতে খারাপ লাগে, তুমি এই সব বাজে কথার গুরুত্ব দাও।

—আমারই দোষ।

—না।

—তো ?

—অকারণ কষ্ট পাবে কেন ? তোমার কণ্ঠস্বর তোমারই মায়ের মতো, আদল মায়ের মতো, হাবভাব, হাঁটাচলা মায়ের মতো, চাউনি, ঘুরে দাঁড়ানো, চোখ নামিয়ে নেওয়া এবং হাসিকান্না সবই মায়ের মতো। যখন তুমি রাগ কর মায়ের মতো কর।

ফরহাদ বলতে বলতে দম নেয়। প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘর্মাক্ত মুখ

BanglaBook.org

এবং ঘাড় মোছে। রুমাল পকেটে রেখে ঘরের কোণে রাখা মাটির কুঁজো থেকে নিজে হাতে জল গড়িয়ে নিয়ে ঢকঢক করে গলায় ঢালে। কাঠের পাটার উপর কুঁজোর পাশে কাঁচের গেলাশ রেখে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে—তোমার গোল আয়নায় তুমি তোমার মুখ দেখে বুঝতে পার না তুমি কী ? তোমার হল মাতৃমুখ।

—আমি কখনও সুখী হব না। আমার পিতৃমুখ দরকার ছিল ফরহাদদা ! আমার দেহে কোথাও বাবার ছাপ নেই। কেন নেই বলতে পার ? বলেই আমি ওর দিকে ঘাড় ফিরে চাইলাম। দেখি, ফরহাদ একটু কেমন থমকে গেল।

নীরব রইল এক মিনিট। তারপর কষে লেগে থাকা জল হাতের উল্টো পিঠে মুছে নিয়ে বলল— মায়ের কাছে প্রশ্ন করতে পার না ? তোমার বুদ্ধি হয়েছে। হয়নি ?

—প্রশ্ন করেছি। যতবার ভেবেছি, বলব। মাকে বলব, অনন্ত কাকার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কী মা ? দেখেছি, সাহস পাইনি। বরং কান্না পেয়েছে আর জিজ্ঞাসা করেছি, বাবা কবে আসবে মা ? মনে হত, বাবা ফিরে এলে মাকে আর অপমান সইতে হবে না। আমার মা খুব পবিত্র ফরহাদদা !

ফরহাদ এবার খুব আশ্চর্য হয়ে আমার চোখে চেয়ে রইল। এতই বিস্মিত হয়েছে যে, চোখ সরাতে পারছে না। একটুখানি এগিয়ে এল কাছে। বোধহয় আমাকে স্পর্শ করতে চেয়েছিল, হঠাৎ ওর মনে পড়ল, আমাকে স্পর্শ করা ঠিক নয়। হাত বাড়িয়ে হাত টেনে নিল। নিজের মুখ চেপে ধরল আলতো মুঠোয়।

ক্ষিপ্রস্বরে সে বলল—তুমি তোমার মায়ের মতো লীনা। তুমি পবিত্র। তুমি শুধু ভাববে, তুমি পবিত্র। ব্যাস।

ফরহাদ এরপর আর দাঁড়িয়ে থাকেনি। দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বার হয়ে চলে গিয়েছিল। তাকে বলা হয়নি স্কুলে কী ঘটেছে। ও চলে যাওয়ার পর আরও কান্না পেয়েছিল আমার। আমি পবিত্র। ব্যাস। আর কিছু সে জানতেও চায় না। আবার সে আমাকে স্পর্শও করতে পারে না। মা সম্পর্কে একটি খারাপ কথাও ভাবতে সে নারাজ। এই মনকে স্বর্ণদীপা কি চেনেন ?

বাবাকে ফরহাদ অজুর ঘোড়াগাড়িতে তুলে দিচ্ছে। বাবা তাকে আসতে দেখেই অজুর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে নেমে পড়েছেন, লাঠিতে ভর সামলে কাঁপছেন—এত অসহায় মনে হচ্ছে বাবাকে। ফরহাদ আসামাত্র তাঁর মুখে হাসি আর সাহস ফুটে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ফরহাদের কাঁধে ভর দিয়ে গাড়িতে দিব্যি উঠে পড়লেন।

তারপর ডাকলেন—এসো ! তুমি উঠে এসো।

—আমি যাব ?

—কাল রাতে তো সেই রকমই কথা হল ! এক কাজ কর, তোমার মামির কাছে গিয়ে ভাড়ার টাকা নিয়ে এসো, পঞ্চাশ টাকা মতন চাইবে। আর বলবে, আমি ফিরে এসে দিচ্ছি। একখানা চেক পেয়েছি, সেটি ক্যাশ করা যায়নি, ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছি। আমার তো বাঁধা রোজগার কিছু নেই।

—এই কথাটা এতবার করে বলেন কেন ?

—বলি এই জন্যে যে বিপ্লব-ভাবনার কথা লিখে আর জেলের কাহিনী প্রকাশ করে রোজগার করব ভাবিনি।

—অন্যায় তো করেননি। আপনি লিখেছেন যন্ত্রণায় আর তাগিদে।

—কিন্তু দুর্মুখরা মনে করে আমি জীবনী লিখে খাচ্ছি। বিপ্লব শেষ হয়ে গেছে, আমি লেখার মধ্যে রোমাঞ্চকর গল্প লিখে চলেছি। বিপ্লবের স্মৃতিচর্চা করে পয়সা কামাচ্ছি।

BanglaBook.org

অথচ স্বর্ণদীপার স্কুলের চাকরি না হলে আমার ছেলেমেয়ে কী ধরে দাঁড়াত কেউ জানে না। একেক সময় মনে হয়, এই যে জেলের অভিজ্ঞতার কথা লিখলাম, এর কি সত্যিই কোনও প্রয়োজন ছিল ?

—আজকাল দেখি, আপনার মধ্যে একটা কী ঘটছে মামা ! এসব আপনাকে মানায় না।

—ভাগ্যিস অনন্ত স্বর্ণদীপার চাকরিটা জোগাড় করে দিয়েছিল....একটা কথা কী জানো ফরহাদ, অনন্ত পরে নষ্ট হয়ে গেল, ওর শুরুর দিনগুলো ছিল অন্য রকম।

—জানি।....আপনি পথের উপর এভাবে কথা বলবেন না। আমি আসছি। বলে ফরহাদ মায়ের কাছে এসে টাকা চায়।

—তোমরা কোথায় যাচ্ছ জানতে পারি ? মা শুধালেন।

—হ্যাঁ, চাঁদেরঘাট।

—কত চাইলেন উনি ?

—পঞ্চাশ।

—আমার মাসের শেষ।

—মামা এ টাকা পরে ফেরত দেবেন আপনাকে।

—অমনই বলেন উনি। ভাবখানা দেখান, কতই না রোজগার করছেন। আমি তাঁকে কখনও লিখে পয়সা কামাতে বলিনি।

—কার্ল মার্কসও তাঁর লেখা থেকে রোজগার করতেন মামি।

—লোকে সেকথা জানে ? বলেই পঞ্চাশ টাকার দশ পাঁচ দুই এক টাকার খুচরো নোট, এগিয়ে দিলেন মা। বললেন—নাও, এতেই তোমাদের সুবিধা হবে। এবার একটা কথা বলি তোমাকে। আজ ঈদ। নামাজ পড়লেই পারতে।

—আমি ?

—হ্যাঁ, তুমি। তোমার কী, কোথায় তোমার বাধা ? ওঁর না হয় ধর্মকর্ম চলে না, তোমারও কি তাই ?

—হঠাৎ অদ্ভুত এই প্রশ্ন আপনিই করছেন মামিমা ? আমাকে ? আমাকেই করছেন ?

—তবে আর কাকে করছি !

ফরহাদ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। চরম বিস্ময়বোধ তাকে বিঁধতে থাকে, সে অনেকক্ষণ বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকে। যেন সে সব কথা হারিয়ে ফেলেছে।

ঘাড় নিচু করে চৌকাঠ পর্যন্ত এগিয়ে থেমে পড়ে ফরহাদ। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে—আমি বিপ্লবী নই। সাধারণ ছেলে মামি ! আমাকে কেন মামা পছন্দ করেন বুঝতে পারি না।

—ওঁর সব সময়ই একটা সাহায্যের লোক দরকার হয় বলে করেন। বুঝতে পার না ? ওঁর যেমন একটা লাঠি দরকার হয় তেমনি। হতে পারে তোমাকে ছাড়া ওঁর চলে না। কিন্তু ঈদের দিনে অজুই ওঁর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ফের একথা তুমি বলতে যেও না যেন। যাচ্ছ যাও ! তোমার হাতে টাকা গুনে দিচ্ছি, মানুষ মনে করবে, আমি তোমাদের ঠেলে পাঠাচ্ছি। তুমি বিপ্লবী নও। কিন্তু আমিও যাকে বলে সামান্য স্ত্রীলোক।

—আপনি তো কখনও ধর্মকর্ম.....

—না, করিনি। আমার কথা ধরছ কেন ? তুমি কী করবে, তাই ভাব। যাও।

ফরহাদ এবার যেন অদৃশ্য চাবুকের আঘাতে চমকে উঠল। ঘাড় নিচু করল ফের। আমার দিকে চোখ তুলে চাইল না অবধি। চলে গেল।

এই ঘটনার পর বেলা চড়েছে, ঈদের গোসল করেছি আমি। সালোয়ার কামিজ উড়নি

BanglaBook.org

পরেছি, চুড়ি দুল পরেছি এবং সুর্মা টেনেছি চোখে। গত পরশু হঠাৎ ফরহাদ একটি বিদেশী পারফিউম এনে আমার হাতে দিয়ে বলল—তুই নে।

—কোথায় কিনেছ ?

—নেপাল বেড়াতে গিয়ে আমার জন্য এনে দিয়েছে দীপক। তা আমি তো এসব কখনও ব্যবহার করি না, তোকেই দিচ্ছি।

—মাকে দাও।

—তুই রেখে দে। ভাল না লাগলে ফেলে দিবি।

সেই গন্ধ গায়ে ছড়িয়ে মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই মা ঈষৎ চমকে উঠে বললেন—বাঃ ! ভাল গন্ধ তো ! কোথায় পেলি ?

এই সময় দাদিমাও কাছে এসে দাঁড়ালেন। দাদিমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললাম—ঈদের আতর দাদিমা !

—না, এ আতর নয়। বিলাতি চিজ। ঈদের আতর আমার কাছে আছে। মক্কার আতর। দাঁড়া, তোকে দিচ্ছি। এ জিনিস আজ রাখো।

আমি নেপাল হয়ে আসা ফরাসি এই সুগন্ধ কী ভেবে দাদিমার গায়ে আচমকা ফস করে ছড়িয়ে দিতেই তিনি আঁতকে উঠলেন। তারপর অসম্ভব রেগে গিয়ে বললেন—আমি আতরই মাখি না, তুই এ কী করলি ? মোটেও ঠিক করলে না।

—তুমি রাগ করছ কেন দাদিমা ! আমি তোমার সুর্মা পরেছি।

—সুর্মা আতর নবীর জিনিস। মাখবে পরবে, কিন্তু যা তা একটা লাগালেই তো চলবে না। আজ এটা বার না করলেই পারতে ! কে দিল এ চিজ, তোমাকে ?

—ফরহাদদা প্রেজেন্ট করেছে, সবার জন্যে।

মা এবার অবাক হয়ে আমার দিকে চাইলেন।

—তুমি নিলে কেন ? দিলে আর নিলে, ব্যাস ? মা বলে উঠলেন।

—অন্যায় তো করিনি। খারাপ জিনিস তো দেয়নি। ও ব্যবহার করে না বলে আমাদের দিয়ে গেছে। ঠিক আছে এটা আমি ফেলে দিচ্ছি।

—না। ওটা আমাকে দাও।

—তুমি নেবে কেন ? আমিই ফেলে দিতে পারব। আমি কি তাহলে ফরহাদদার সঙ্গে কথাও বলব না মা ?

—তা কেন, আমি তো তা বলিনি। বলেই মা কেমন অস্বস্তিকর একটা অভিব্যক্তি ঘটালেন চোখেমুখে। দাদিমার দিকে চেয়ে দেখলেন তল চোখে। তারপর অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন—তুমি দাদিমাকে বিরক্ত করছ কেন ? তোমার উদ্দেশ্য কী ? এভাবে হঠাৎ স্প্রে করবার মানে কী ? বল, এমন কেন করলে ? চলো, ওপরে চলো !

নীচের তলা থেকে, দাদিমার সামনে থেকে, আমাকে হাঁকিয়ে তুলে আনেন মা, উপরের তলায়, এ ঘরে মা থাকেন। রাত্রে আমি নীচের ঘরে দাদিমার সঙ্গে শুই।

ওইভাবে দাদিমার গায়ে ফরাসি সুরভি ছড়িয়ে দেওয়ায় দাদিমা যে অপমান বোধ করেছেন সন্দেহ নেই। বিধবা মেয়ে আতর মাখবেন, দাদিমার সেটি অপছন্দ। যদি নিতান্ত মাখতেই হয়, আতরই মাখবেন তিনি। বিলাতি খিস্টানি দ্রব্য মেখে নবীর অসম্মান না ঘটানোই ভাল। সুগন্ধির এমন জাতবিচার আমি আজ সহ্য করতে না পেরেই কি তাহলে দাদিমার গায়ে সুরভি ছিটিয়ে দিয়েছি।

মা উপরে তুলে এনে গম্ভীর গলায় বললেন—এ সবই বাড়াবাড়ি হচ্ছে তোমার ! অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে। মানুষকে এভাবে অপ্রস্তুত কর কেন ?

BanglaBook.org

—ফরহাদদাকে তুমি অপমান করনি ?

আমার এই আকস্মিক প্রশ্নে মা অবাক হলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন—অপমান করেছি ? তুমি কি তাহলে অপমানের শোধ নিতে চাও ?

—ধর্মকর্ম না করাটা তোমাদের সাজে, ফরহাদের সাজে না !

—আমি তা বলিনি আকাশলীনা ! তোমার বাবা বিপ্লব করেছেন, আমি তো করিনি। জেলে থেকেছেন উনি, মার খেয়েছেন, কিন্তু বাইরে তাঁর কাজের কৈফিয়ত আমাকেই দিতে হয়েছে। পুলিশের ভয়ে আমাকেও অনেক দিন পালিয়ে ফিরতে হয়েছে। তুমি তো জানো না সেই সব দিনের কথা ! তুমি তখন কতটুকু ! তুমি তখন কোথায় ? কেউ আমায় আশ্রয় দেয়নি সেদিন ! ভয় পেয়েছে।

বলতে বলতে মা একদণ্ড চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—তুমি কী জানো ? কিছুই জানো না। তোমাকে আমি সব কথা বলতেও পারব না। দু'টি ছেলেমেয়েকে বুকে ক'রে কত রাত্রি ফুটপাতে কেটেছে আমার ! এ ঘটনা সিনেমায় হয়। যখন জীবনে সেই ঘটনা ঘটেছে, মনে হত, আমাকে দেখে কোনও চেনা মানুষ বিশ্বাস করতেই চাইবে না, আমি স্বর্ণদীপা !

মা আবার চুপ ক'রে গেলেন। আলনার কাছে সরে গিয়ে কাপড় গোছাতে থাকলেন। মায়ের মুখে এইসব কথাবার্তা নতুন নয়। মা যখন এই সব কথা বলতে শুরু করেন, আমার বাস্তবিক কষ্ট হয়, বেশিক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনতে অবধি পারি না।

এই সব কথা মা সম্পর্কে আমার মনে যে উচ্চ ধারণা গঠন করে, তা এতই উচ্চ যে মাকে আমি পবিত্র ভাবি। সেই ভাবমূর্তিতে কোনও ভাবে চিড় ধরুক, আমি চাই না। আমার চোদ্দ-পনেরো বছর বয়েসে যেদিন ফরহাদ প্রথম হাত ধরল, আর সিনেমার গল্প করছিল, মনে পড়ে মা ঘরে ঢুকে এসে নাটকীয়ভাবে রুক্ষস্বরে আমার হাত ছেড়ে দিতে বললেন ফরহাদকে—সেদিনই মায়ের পবিত্র ভাবমূর্তিতে সূক্ষ্ম চিড় ধরে গেল। আমার মনে হল, মায়ের সংগ্রামী জীবনের সঙ্গে এই ঘটনা একেবারেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ফরহাদ চলে যাওয়ার পর কেবলই ভেবেছি, ফরহাদ কি কোনও অন্যায় করেছে ! আমি কি খারাপ মেয়ে ? তাহলে কি ওই বয়েসেই আমার মনে ভালবাসা যাকে বলে, তাইই অঙ্কুরিত হয়েছে, মা কি তা টের পেয়েছিলেন ? মাত্র একমাস আগে, মায়ের ওই আচরণের উত্তর পেয়েছি আমি ! কিন্তু যেভাবে সেই প্রশ্নের জবাব এল তা কাউকে বলা যায় না। এবং সেকথা বলতেও মানা।

৬ ডিসেম্বর ১৯৯২ সালের সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। রাত আটটা উনচল্লিশের দিল্লির সংবাদ শুরু হয়েছে টেলিভিসনে। বাবা মা দাদিমা রুদ্র এবং আমি প্রত্যেকেই ব্যাটারি চালিত টিভি সেটের পর্দায় চোখ রেখে চমকে উঠলাম। অযোধ্যার ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ হয়ে গেল, সেই সংবাদের অব্যবহিত পরেই প্রধানমন্ত্রীর মুখ ভেসে উঠল—গলার স্বর কাঁপছে, অপমানে বিমর্ষতায় সেই মুখটি যেন অদ্ভুত ক্লিষ্ট।

প্রধানমন্ত্রীর চোখের দিকে চাইতে পারছিলাম না আমরা। বোধহয় তিনিও আমাদের দিকে চেয়ে কথা বলতে পারছিলেন না। নীচের তলায় আমাদের ৩৬ সেন্টিমিটারের টিভি বক্সটা পড়ে থাকে, মাঝে মাঝে সংবাদ শোনা এবং মাঝেমধ্যে ভাল দু'একটি ফিচার ফিল্ম দেখা ছাড়া যন্ত্রটি চালু থাকে না। আমি জিলাশহরে বাসে যাতায়াত করে কলেজ করি, কখনও কখনও শহরে মায়ের এক আত্মীয়ার বাড়ি থেকে যাই। মায়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয়া, কিন্তু আমি বাসে বাসে যাতায়াতের কষ্ট করি বলে মহিলা হামেশা দুঃখ প্রকাশ করেন। মহিলাটি মায়ের আত্মীয়া এবং বান্ধবী। সে এক ভিন্ন প্রসঙ্গ।

BanglaBook.org

কথাটি এই, টিভিটা যদি আমি না চালাই, ওটি চালাবার লোক নেই। আমিই ৬ ডিসেম্বর নীচের এই ঘরটায় নিস্তব্ধ পড়ে থাকা যন্ত্রটা চালু করি। চালু করি খবরের আগে। মায়ের হাত ধরে বাবা উপর থেকে নেমে আসেন হয়তো খবর শুনবেন ব'লে এবং প্রধানমন্ত্রীর ইংরেজি ও হিন্দিতে পিঠোপিঠি বলা ভাষণ শুনতে শুনতে বলে উঠলেন—ভাবা যায় না। ফের মনে হচ্ছে, এ খুব আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু এটা হতে পারল কিভাবে!

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের পরও টেলিভিসন চালু রইল। দশ মিনিট বাদে, হঠাৎ কোথা থেকে ফরহাদ এসে ঘরে ঢোকার আগেই উঁকি দিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠল—শুনেছেন মামা?

বাবা কেমন হতাশ গলায় ছোট জবাব করলেন—হ্যাঁ।

তারপর টেলিভিসনের চলন্ত পর্দায় চোখ রেখে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। ফরহাদ বোকার মতন চৌকাঠের কাছে হতবাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। কথা বলছে না এবং বললে কী বলবে বুঝতে পারছে না। তার দিকে চোখ তুললেন বাবা।

এক মিনিট ফরহাদের দিকে চেয়ে থেকে বললেন—আমাকে ধরো ফরহাদ, চলো উপরে যাই। টিভি বন্ধ করে দে আকাশ! বলেই লাঠিতে ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন আহসান ইমাম। স্বর্ণদীপার দিকে চাইলেন। ফরহাদ ঘরে ঢুকে এসে বাবার হাত ধরল।

বাবা বললেন—ভাবছি, এখন না দাঙ্গা বেধে যায়।

দাদিমা ভয়ে হঠাৎ ত্রস্তস্বরে বলে ফেললেন—আমরা বাঁচব তো বাবা!

প্রত্যেকেই আমরা তখন বাবার মুখ থেকে আমাদের অস্তিত্বের কথা শুনতে চাইছিলাম। দেশের সম্ভাব্য বিপর্যয়ের আগাম চিত্র বাবা হয়তো তুলে ধরবেন, এমন একটা প্রতিক্রিয়া সম্ভব বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু বাবা শান্ত গলায় বললেন—ভয় পেও না মা! অনেক তো সহ্য করেছ। কত ভয়ের মধ্য দিয়ে তোমায় যেতে হয়েছে, বেঁচে থাকতে হয়েছে। এ তো তোমার পারিবারিক বিপদ কিছু নয়, দেশের বিপদ।

দাদিমা বললেন—নীচে এখন একটু থাকো না কেন ইমাম! উপরে উঠে যাচ্ছ কেন! আমি কি একা থাকব।

বাবা পা বাড়িয়ে থেমে পড়লেন। এবং বললেন—একা কেন থাকবে! আমরা তো সবাই রয়েছি!

তারপর ঠোঁটে টেপা হাসি ফুটিয়ে তুলে বাবা বললেন—তোমার হিন্দু বউমা, মুসলমান ছেলে, তারপর নাতি-নাতনি সবাই তোমাকে ঘিরে রয়েছে।

—এই বিপদের মধ্যেও তুমি রসিকতা করছ ইমাম!

দাদিমায়ের একথার সরাসরি জবাব না দিয়ে বাবা বললেন—তাছাড়া তুমি একা থাকতেই তো পছন্দ কর! তুমি আর তোমার খোদা! ভয় কি তোমার! রুদ্র তোমার কাছে থাক। চলো ফরহাদ। আমাদের অন্য কথা আছে!

দোতলায় উঠে এসে বাবা চুপচাপ খাটের উপর বসে রইলেন। সম্মুখে চেয়ারে বসে মাঝে মাঝেই বাবার মুখের দিকে চাইতে থাকল ফরহাদ। সে বারবার প্রত্যাশা করছিল বাবা হয়তো এক্ষুণি কোনও কথা বলে উঠবেন। কিন্তু সময় বয়ে যাচ্ছিল, বাবা দীর্ঘক্ষণ নীরব রইলেন।

বাবা ও ফরহাদের পিছু পিছু আমিও দোতলায় উঠে এসেছিলাম। আমিও চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম বাবার অদ্ভুত নীরবতা। বাবা নির্বাক মূর্তির মতন বসে রয়েছেন, মনে হচ্ছে

BanglaBook.org

যেন মূর্তিই মাত্র, মানুষটি মানুষ নয়।

এক সময় নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করলেন বাবা। বললেন—আমাদের অনেক কাজ বেড়ে গেল ফরহাদ।

ফরহাদ বাবাকে সমর্থন করে বলল—জি।

ঠিক তখনই মা এবং রুদ্র দাদিমাকে নীচে ফেলে উপরে উঠে চলে এল। বাবা আশ্চর্য হয়ে বললেন—মাকে একা নীচে ফেলে চলে এলে কেন তোমরা! রুদ্র! তোমায় না থাকতে বলে এলাম!

রুদ্র মাথা নিচু করে বলল— দাদিমা নামাজ পড়ছেন।

বাবা বললেন—তবু কাছে থাকলে পারতে! শুধু খোদার ভরসায় মানুষ এখন নির্ভয় থাকতে পারে না। এখন কথা বলার মানুষ দরকার করে! যাও, আকাশলীনা, তুমি নীচে গিয়ে থাকো!

—যাই বাবা! বলে আমি নীচে নামার জন্য প্রস্তুত হই।

সহসা বাবা বললেন—মা একা থাকার কথা বলেছে, কিন্তু আমার চেয়ে নিঃসঙ্গ আজ কেউ নয়। আজ আমার তেমন কোনও সংগঠন নেই, যা দিয়ে আমি অন্তত এই গ্রামটার সাহস জোগাতে পারি। শুধু মায়ের ওই একটা কথাই আমাকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছে। 'আমরা বাঁচব তো বাবা!' সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র-পরিস্থিতি মানুষের মনে যে ভয় জড়ো করে, তাই-ই তাকে দিয়ে অভাবিত অনেক খারাপ কথা বলিয়ে নেয়, সবটাই তার মনের কথা নয়। আবার অনেক সময় মনের চেপে রাখা মানুষের গভীর সঙ্কীর্ণতা অবলীলায় আত্মপ্রকাশ করে। এ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে।

বলতে বলতে থেমে গেলেন বাবা। আমি নীচে নেমে এসেছিলাম। দাদিমা নামাজে নিমগ্ন। তাঁর গায়ের পাশে স্পর্শ বাঁচিয়ে আমি বসে রয়েছি। অনেকক্ষণ পর দাদিমা আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে আমার দিকে ঘাড় ফেরালেন।

দাদিমা বললেন—বাবরি মসজিদে নামাজ হত?

আমি বললাম—না দাদিমা। ওটা একটা ঐতিহাসিক নিদর্শন। খুব পুরনো। নামাজ হত না।

—তোর বাপ কী বলছে রে?

—তোমার কাছে আমাকে.....

—ওহ্! আরে না না। ভয় পাইনি আমি। ভয় কেন পাব! আমার হিন্দু বউমা, মুসলমান ছেলে!

—ওই কথায় তোমার বুঝি অভিমান হয়েছে!

—অভিমান নয় আসমানতারা। অহংকার হয়েছে। আমার কাছে তুই থাকবি তো মামণি! তুই, তোকেই বলছি। তোর সঙ্গে আমি ফরহাদের শাদি দেব।

—দাদিমা!

—হ্যাঁ মা! একদিন ফরহাদকে বলেছি।

—কী বলেছ?

—তুই তো ফরহাদ। তোর শিরিঁ কই রে, আছে নাকি! ও কি বললে জানিস?

—কী?

—আমার নামটা ভয়ানক নানী। শিরিঁকে কি আমি পাব? সে তো আকাশ-প্রতিমা নানীমা! কী যে কষ্ট হল বাছা! আমি তো চাষার ছেলে, আমাকে পছন্দ কর তুমি? বললে ছোকরা। ওই একটা ছেলে....তো আকাশ-পতিমে কথাটা বুকে খালি বাজে

BanglaBook.org

ফরহাদ, শিরির একটা মূর্তিই তো গড়েছিল, তাকে জীবনে পায়নি। কুঁদে কুঁদে বাটালি ছেনি দিয়ে পাথর কেটে কেটে একটা মনের মতন মূর্তি.....

—আর ব'লো না দাদিমা ! সইতে পারি না !

সে কী রে ! বলেই দাদিমা আমাকে আচমকা বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। জায়নামাজের সামনে মেঝেয় বসানো সরু মোমবাতি পুড়ছে। স্বল্প আলোয় চোখ আমার কান্নায় ভরে গেছে।

—তোর ভাল হবে মা। আলবাৎ ভাল হবে। আমি দোয়া করছি। খোদার কাছে আমি দরখাস্ত্ করছি তোমার জন্যে !

দাদিমার কথা শেষ হতে না হতেই সদর দুয়ারে বাইরে থেকে কড়া নাড়ার শব্দ হয়। দাদিমা আমাকে তাঁর বুকের আশ্রয় থেকে সস্নেহে ঠেলে তোলেন, তারপর বলেন—যাও, কে এসেছে দ্যাখো !

দোর খুলে দিতেই পাড়ার একদল মুরুব্বি এবং জোয়ান ছেলে ঢুকে আসে। অনেকেই মাতব্বরশ্রেণীর মানুষ। ওঁদের মধ্যে যাঁর বয়সের প্রাচীনতা অধিক, নাম জহির বিশ্বাস হাজী সাহেব—আমাকে বললেন—বাপকে ডাকো, গিয়ে বল, হাজী সাহেব দেখা করতে চান।

বাবাকে উপর থেকে ধরে নামিয়ে আনে ফরহাদ। রাত্রি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়ির উঠোন লোকজনে ক্রমশ ভর্তি হয়ে যায়। যাঁরা বাবাকে দীর্ঘকাল তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের জন্য ত্যাগ করেছিলেন এবং মনে মনে ভয়মিশ্রিত ঘৃণা করে চলতেন, তাঁদেরই কেউ কেউ আজ বাবারই কাছে ছুটে এসেছেন।

জহির বিশ্বাস বারান্দায় মোড়ার উপর বসেই বলে উঠলেন—তুমি গ্রামেই আছো জেনে দেখা করতে এলাম আহ্সান ! আমরা খুব শঙ্কিত হয়ে পড়েছি। মসজিদটা কি সত্যিই ভেঙে ফেলেছে মনে হচ্ছে ?

বাবা বললেন—হ্যাঁ। প্রধানমন্ত্রী তো সেই কথাই বললেন।

জহির শুধালেন—বিশ্বাস করতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা ! আমাদের নিরাপত্তার কী হবে, জানমাল নিয়ে কোথায় যাব ! তোমার বুদ্ধি আছে, তুমি আমাদের পরামর্শ দাও।

বাবা বললেন—আমার মনে হচ্ছে, গ্রামের মধ্যে মন্দ কিছু না ঘটাই উচিত। আমরা হিন্দু-মুসলমান যেমন একত্র রয়েছি, সেই সদ্ভাব বজায় রাখতে হবে। তার জন্য কতকগুলো গ্রাম-কমিটি গঠন করতে হবে। কোনও ধরনের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা যাতে সৃষ্টি না হয়, সেই চেষ্টা করতে হবে। এই এলাকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বরূপ গঞ্জের চারিদিকের গ্রামগুলি মুসলমান অধ্যুষিত, স্বরূপগঞ্জ হিন্দু-প্রধান। এখানকার প্রধান প্রধান ব্যবসা-বাণিজ্য হিন্দুদের, বড় চাকুরে সাধারণত হিন্দু। চাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষ নব্বুই ভাগ মুসলমান, স্কুলের চাকরিতে দু'একজন মুসলিম রয়েছে। ছিটেফোঁটা অন্যান্য চাকুরিতে মুসলমান আছে বটে কিন্তু তা নিতান্তই নগণ্য।

বলতে বলতে বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর শ্রোতাদের উপস্থিতি লক্ষ করলেন এবং বললেন—দেখুন, এই বৈশিষ্ট্যের কারণে বরাবরই এই জোতে হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ রয়েছে, তারাই এখানে সংখ্যালঘুশ্রেণী। অতএব সদ্ভাব এবং সম্প্রীতি বজায় রাখার প্রধান দায়িত্ব মুসলমানের। বাবরি ধূলিসাৎ হওয়ায় মুসলিম মনে যে নিরাপত্তার প্রশ্ন উঠেছে তা অমূলক নয়, কিন্তু মনে রাখতে হবে বৃহদংশের হিন্দু-সমাজ এই ঘটনার ভালমন্দ কিছুই জানেন না। খেটে খাওয়া মানুষের কাছেও মসজিদ-মন্দির বিবাদ একেবারেই গুরুত্বহীন, তার অস্তিত্বের সঙ্গে এই ঘটনার

BanglaBook.org

সরাসরি কোনও যোগ নেই। আমি মনে করি, গ্রামে কোনও মন্দ ঘটনা ঘটবে না।

—তুমি ভবিষ্যৎ বলে দিচ্ছ আহসান! কিন্তু আমরা তো নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। যতই তুমি হিন্দু মেয়ে বিয়ে কর, তোমাকে আমরা মুসলমান বলেই জানি।

—সেটাই আমার সমস্যা হাজী সাহেব। আমার কাছে আপনারা এসেছেন সমস্যা কী তা জানবেন ব'লে। আমার যা জ্ঞানবুদ্ধি তাইই আমি বলব, সেই মতো বোঝাব। মানুষ যা বলে, নিজের বিচারবোধ অনুযায়ীই বলে। আমার স্ত্রী হিন্দু বলেও আমাকে ধর্ম এবং সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ হতে হয়েছে, কারও পক্ষ ধরে কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।

—তাহলে কেন বলছ যে, দাঙ্গাহাঙ্গামা হলে তার দায় বর্তাবে মুসলমানের ওপর। এই তোমার নিরপেক্ষতা?

—না। আমি সেকথা বলছি না। এই এলাকার কথা বলছি, এখানে....তাছাড়া দাঙ্গার কথা বলিনি....শুনুন....ভুল বুঝবেন না আপনারা!

হঠাৎ শ্রোতাদের কণ্ঠে গুঞ্জন শুরু হয়। একজন তার পাশের জনকে উঠে পড়ে বোঝাতে শুরু করে। এক সময় দেখা যায়, কে কাকে বোঝাচ্ছে বোঝার উপায় নেই, প্রত্যেকেই কথা বলে চলেছে।

ফরহাদ উঠে দাঁড়িয়ে হাঁক দিয়ে বলল—শুনুন। চুপ করুন সকলে। কথা শুনতে এসে এত কথা বলছেন কেন? আগে না বুঝে শুনে.....

লোকগুঞ্জন থামে ধীরে ধীরে। কিন্তু মুখ নিচু করে থাকা বাবার মনে অসম্ভব ধাক্কা লেগেছে বোঝা যায়।

হঠাৎ শ্রোতাদের একজন বলে ওঠে—আপনি ইমাম সাহেব কথার মোহড়া ধরতেই ভুল করলেন। স্বরূপগুঞ্জের হিন্দু বাবুরা আমাদের হীন করে, মানুষ ভাবে না। তারা নিরপেক্ষ না হলে আপনি কী করে হবেন, সেইডা বুঝান দেখি!

ফরহাদ বলল—তোমরাই তো আমাদের শিক্ষা দিতে চাইছ শরবতী সেখ।

গায়ে হাত দিয়ে ফরহাদকে থামিয়ে বাবা বললেন—দেখুন! আমাকে আপনারা কথা শেষ করতে দিলেন না।

—ওহে ওঠো, ওঠো। কথা আর শেষ হবে না। মরলে চাষা মরবে। একটা খোঁড়া মানুষ নিজেই কী করে বাঁচে ঠিক নাই! চলে এসো! বলে উঠল আর এক মাতব্বর।

ফরহাদ সচিৎকারে বলল—শুনুন চাচা। আপনি জড়েল লোক। এ দিগরে সবাই সেকথা জানে। একই জীবনে চারপাঁচটা দলের রাজনীতি করা হয়ে গেছে। আপনার ছেলেরা করে বাম তো আপনি করেন ডান। এই লোকগুলিকে বিভ্রান্ত করবেন না। ইমাম সাহেবের জীবনে কোনও স্বার্থ নেই, সাধারণের স্বার্থ ছাড়া। তাঁকে এই দুঃসময়ে বাড়ি চড়াও হয়ে অপমান করে যাচ্ছেন....ওঁর কথা শুনতেই দিলেন না.....কেন এসেছিলেন তাহলে?

—তুমি বাবা মাস্টার লোক। ইজ্জতের ছেলে। এখানে কেন তাঁবেদারি করছ পড়ে পড়ে। কী স্বার্থে আছো, আমরা বুঝি না? ওহে চলো চলো! বলতে বলতে শ্রোতাদের অর্ধাংশ বাইরে বার হয়ে চলে যায়।

কয়েকজন শিক্ষিত ছাত্র এবং অর্ধশিক্ষিত জোয়ান এবং নিরক্ষর দু'একজন এবং দু'জন প্রৌঢ় আর এক বৃদ্ধ উঠোনে শীতবস্ত্র গায়ে বসে থেকে যায়।

হঠাৎ বাইরে থেকে ভারী একটা গলা ভেসে আসে—ডালিম রাঙিয়ে উঠেছে, তাই পাহারা দিচ্ছে বাবাজীবন! সব ভণ্ড!

কোনও একটা কঠোর নবীন তেজালো স্বর ভণ্ড শব্দটিকে উৎক্ষিপ্ত করে চলে গেল।

BanglaBook.org

তা শরের মতন এসে বিঁধল বাবার বুকে, ফরহাদের চোখদু'টি ধক করে জ্বলে উঠে নিবে গেল। মাকে দেখালো অসম্ভব বিপন্ন।

কেবল দাদিমা যেন সেই উচ্চারণ শোনেননি, সেইভাবে শেতলপাটির উপর বসে থাকা লোকজনের উদ্দেশে বললেন—তোমরা বসে আছো কেন বাবারা! তোমরাও যাও।

একজন বলল—আমরা শুনব বলে আছি জৈবুনখালা।

মা বললেন—ঠিক আছে, আপনারা পরে আসবেন। রাত হয়েছে। এখন যাওয়াই ভাল।

একসময় লোকজন সকলেই উঠে গেল ধীরে ধীরে।

ফরহাদের কাছে একজন ছাত্র চলে যাওয়ার আগে এগিয়ে এসে বলল—স্যর! জহির হাজী হল জহর হাজী, জানেন তো! ও জ্ঞান দেয়, জ্ঞান নেয় না স্যর! কিছু মনে করবেন না। আমরা আছি।

সবাই চলে যেতেই বাবার মুখের উপর হ্যারিকেনের আলো তুলে ধরে মা বললেন—তুমি মেনে নিলেই পারতে!

রুদ্র বলল—বাবা! তোমার কথা লিখে বল, মুখে বলে বোঝাতে পারবে না।

ফরহাদ শুধাল—মামা কী মেনে নেবেন মামি?

মা বললেন—কেন, উনি মুসলমান! মেনে নাও, তুমি মেনে নাও।

বাবা চেয়ার ছেড়ে থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে হাত বাড়ালেন, আমি ছুটে গিয়ে বাবাকে ধরলাম। বাবার বাঁপাশে ফরহাদ এগিয়ে এল। আমাদের দু'জনের উপর ভর দিয়ে বাবা দোতলায় ওঠার সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন একটু একটু ক'রে—এক একটি ধাপে উঠে দম নিচ্ছিলেন। মা সামনে আলো ধরে পথ দেখাচ্ছেন। বাবা সহসা বলে উঠলেন—না স্বর্ণদীপা! বলে তিনি মাথা নাড়তে থাকলেন, বাবার চোখ চিকচিক করে উঠল।

৩. মুসলমানি সমস্যা : ডাক্তারি উত্তর

ছয় ডিসেম্বর সমস্ত রাত্রি বাবার ছটফট করে কাটল বিছানায়। মা বুঝতে পারছিলেন বাবা কিছুতেই ঘুমাতে পারছেন না। এক সময় বাবা রুদ্রকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। দাদিমার পাশে শুয়েছিলাম আমি। আমারও ঘুম আসছিল না। ফরহাদ যখন চলে যাচ্ছে, আমিই ওকে হ্যারিকেন হাতে সদর দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিই। আশেপাশের বাড়িগুলোয় এ গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে, খুঁটি কেনার সামর্থ্যের অভাবে আমরা বিদ্যুৎ পাইনি। অনেকে আলগা তার টেনে বিদ্যুৎ পোড়াচ্ছে, পুরোপুরি চুরি।

এমনকি আলিয়া মাদ্রাসা নাম হলেও, বস্তুত বিশাল অট্টালিকার একটি মক্তব রয়েছে গাঁয়ে। যেখানে আরবি দ্বীনিয়াতি শিক্ষা দেওয়া হয়। শতকরা নব্বুই ভাগ কিশোরী এবং শিশুকন্যারা সেখানে আরবি-শিক্ষা করে। এই মেয়েদেরই একটি অংশ মর্নিঙে মক্তবে পাঠ নিয়ে দিনের বেলা এই গ্রামেরই জুনিয়র হাইস্কুলে সাধারণ শিক্ষার জন্য উপস্থিত হয়। সেখানেও বিদ্যুতের চুরির তার গেছে। আমি প্রথমাবধি এই মক্তব অথবা জুনিয়র হাইস্কুলে পড়িনি। স্বরূপগঞ্জের হাইস্কুলে পড়েছি। আমার পাঠশালার শিক্ষা মায়ের কাছে। স্বরূপগঞ্জের একটি পাঠশালায় আমাকে ক্লাশ থ্রি-তে ভর্তি করা হয় সরাসরি,

সর্বসাকুল্যে ক্লাশ থ্রি-তে একমাস ক্লাশ ক'রেছি হয়তো, ফোরে প্রমোশন হয়েছে।

মক্তবে দু'দিন আমাকে জোর করে পাঠিয়েছিলেন দাদিমা। তা নিয়ে মায়ের সঙ্গে দাদিমার বিরোধ হয়। সেই শৈশব থেকেই আমি বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু।

—বাপ থেকেও নেই। আমার মেয়ে গরিব জানি। তা বলে তাকে আমি মক্তবে দেব না। কিছুতেই দেব না। ওর পড়াশোনার দরকার নেই। ও মূর্খ হয় হোক। ও যতটুকু পারবে বাড়িতে থেকেই শিখবে। আমার বিদ্যা যতটুকু, আমি ওকে তাই-ই শেখাব।

মায়ের এই জিদ আমাকে বাংলা অনার্সের শেষ বর্ষ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে, পরীক্ষাও দিয়েছি ফাইন্যাল। কোথাও আটকায়নি আমার। মাঝে মাঝে নীচের ক্লাশে পড়তে পড়তে পড়া বন্ধ থেকেছে, মা ঘরে বসে সেই সব অভাব পূরণ করেছেন। কী পড়ালে ভাল হয়, কোন্ বই কোথায় পাওয়া যাবে সবই জোগাড় করেছেন মা। নিজে খেটে অল সাবজেক্টস সাজেশনস তৈরি করেছেন—আমার রেজাল্ট আশ্চর্যভাবে ভাল হয়েছে। আমার শৈশবে দুঃখ ছিল, আমি পাঠশালে যেতে পাই না, কেঁদেছি কতদিন আর ভেবেছি, বাবা নেই তাই আমাদের এমন হচ্ছে। আমরা কখনও মানুষ হব না।

আমি স্কুল যেতে পাই না। ক্লাশ সেভেনে উঠে আরবি-সংস্কৃতের বিবাদে পড়ে গেলাম। দাদিমায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে মা আমাদের দু'ভাইবোনকে সঙ্গে করে সন্তোষপুর রবীন্দ্রনগর পালালেন। স্কুলে ক্লাশ শুরু হয়ে গেল। রুদ্র সেভেন-এইট দু'বছর যে আবশ্যিক আরবি তা না পড়ে সংস্কৃত পড়েছে ফলে ছেলেকে পারেননি, মেয়েকে নূর আলি মৌলানাও ছাড়তে চাইলেন না। এমনকি ক্লাশ নাইনে উঠেও আরবি-স্যার অ্যাডিশনাল সাবজেকট আরবি নিতে বলেছিলেন আর বলেছিলেন সেভেন-এইটে'র প্রাথমিক জ্ঞান উনি বাড়িতে গিয়ে বিনে বেতনে শিখিয়ে নেবেন। আরবিতে ঢেলে নম্বর আসে, মেয়ের ডিভিসন আসবে।

বুঝতে পারি, আরবির সঙ্গে মুসলমানিত্বের যোগ নিবিড়। এ সমাজ আরবিকে বিসর্জন দিতে পারে না। তার বিরুদ্ধাচারণ দাদিমা সহ্য করতে পারবেন কেন? কিন্তু গতিকে দাদিমা তাঁর দাবি বাধ্য হয়ে ত্যাগ করেছেন। আবার কোথাও জিতেছেন।

মা বলেছেন—শোন আকাশলীনা! তুমি নামাজ পড়বে না, পুজোও করবে না। যদি আমার মেয়ে হও.....

ও কথা শুনে আমার কান্না পেয়ে গিয়েছিল। কারণ নামাজ-শিক্ষার একখানা বাংলা অক্ষরে লেখা আরবি বই একদিন আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে দাদিমা বললেন—পড়ে শোনাও আসমানতারা। আমার চোখ নরম হয়েছে।

আমি কৌতূহলবশে পড়ে চলেছি, মা দোতলা থেকে গম্ভীর গলায় ডাকলেন—শুনে যা লীনা।

মায়ের গলায় শঙ্কাঘনতা। কাছে যেতেই বললেন—কী পড়ছিলে?

বললাম—নামাজ-শিক্ষা বই। দাদিমা পড়ে শোনাতে বললেন।

মা বললেন—উনি বললেন, আর অমনি তুমি লেগে পড়লে!

বললাম—হ্যাঁ।

ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন মা। বললেন—তার মানে?

বললাম—বলছি তো হ্যাঁ।

মা আমার গলায় একটা গোঁ লক্ষ করছিলেন। ঈষৎ আহত এবং অদ্ভুত বিস্মিত গলায় বললেন— তুমি কী চাও? তোমার বয়েস হয়েছে।

বললাম—আমার চাওয়া না চাওয়ার উপর কিছুই নির্ভর করছে না মা।

BanglaBook.org

—কী নির্ভর করছে না ?

—কোনও কিছুই। বললাম তো, নাথিং ইজ ডিপেন্ডেব্‌ল্‌।

—ফট ফট করে ইংরেজি বোলো না। ওটা বদ অভ্যাস। বাংলা বল।

—কথায় ইংরেজি না মেশালে আভিজাত্য আসে না।

—কেন, তোমার সৈয়দা ?

—মা! ইটস টু মাচ। তুমি আর ও কথা বোলো না। তুমি কি জানো, আমাকে ঠাকুর-প্রণাম করতে হয়েছে।

—কবে ?

আমি এবার চুপ ক'রে রইলাম। আমার বাস্তবিকই অসহায় ক্রোধ আর উদ্রিক্ত অশ্রু এসে পড়েছিল। আমি আর রুদ্র রবীন্দ্রনগর থেকে স্বরূপগঞ্জ ফিরব সেদিন। সরকারি বাস ধবর এসপ্ল্যানেড বাস-গুমটি থেকে। সন্ধ্যা হয়েছে সবে। আমরা আর কিছুতেই থাকতে চাইছিলাম না। ভাল লাগছিল না আমাদের। পোশাক পরে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নিয়েছি। চলে যাচ্ছি, সেকথা দিদাকে বলবার জন্য বড় ঘরে ঢুকে দেখি দিদা আহ্নিকে বসেছেন। আহ্নিক শেষে রোজই দিদা চিনির মুড়কি দেন, ঠাকুরের প্রসাদ। তীব্র মিষ্টি দানা। খেতে হয়।

ঘরে ঢুকে তেল-প্রদীপের ক্ষীণালোক চোখে পড়ল। দিদাকে ছায়ামূর্তি মতন দেখা গেল। বাস ধরবার বিষম তাড়া। বলে উঠলাম—দিদা, যাচ্ছি এখন। বলেই প্রণাম করবার জন্য এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে দিদা বলে উঠলেন—আমাকে নয়। ঠাকুরকে।

নারায়ণ আর শিবের শায়িত পুতুল রয়েছে জোড়া হয়ে—একটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র মশারি ঢাকা পালকি-সদৃশ পলকা কাঠের আধারে।

বুঝতে পারলাম, কথা ঠিক। পূজায় উপবিষ্টাকে প্রণাম চলে না। করতে হলে, ঠাকুরকেই করতে হয়। আপনা থেকে আমার হাত কপালে উঠে গেল।

—আমার আর আপত্তি নেই মা!

—কেন, তুমি বলতে পারলে না, তুমি ঠাকুর বিশ্বাস কর না।

—ভয় করল মা!

—ঠাকুরকে ভয়!

—না, দিদাকে। পুজো করছিলেন, তাঁকে।

—তুমি ছেলেবেলা থেকেই খুব তর্ক করতে পার। ওহ্‌!

—তুমিই আমাকে তর্ক করতে শিখিয়েছ। দিদার সঙ্গে তর্ক করেছিলাম বলে সেদিন ছোটমাসি অদ্ভুত কথা বলল মা।

—কী ?

—বলল, এত সুন্দর মুখ তোর সৈয়দা। তোর তর্ক মানায় না। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, আমার মুখ সুন্দর বলে আমার তর্কে অধিকার নেই। এমনকি ছোটমাসি বললে, এত তর্ক করছিস, কোনও ছেলে তোকে পছন্দ করবে না। মনে মনে বললাম, ও আমার বয়েই গেছে।

মা স্নেহমেদুর বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। আমি বললাম—হঠাৎ ছোটমাসি বলল, আচ্ছা সৈয়দা বাবাকে কী ডাকিস রে তুই ? আব্বা ? স্বরূপগঞ্জে আব্বা, এখানে বাবা, তাই না! আমার বেদম হাসি পেয়ে গেল, একদিন ছোটবেলায় এই সমস্যার ফাঁদে পড়ে আমরা দুই ভাইবোন কেঁদেছি কত। আজ তর্ক

BanglaBook.org

করতেই ইচ্ছে হল।

—কী বলে তর্ক করলে তুমি? বলে মা খাটের উপর ফেলে বালিশগুলোর কেচে শুকিয়ে তোলা ওয়াড় পরাতে থাকলেন। কাঁধের উপর একটু উঁচিয়ে তোলা ফাঁস-ঝুঁটি, কাঁধের পাক খাওয়া চুলের রিঙগুলো বারবার আমার চোখে পড়তে লাগল। মা সত্যিই বড় সুন্দরী। এত ঝাপটা সওয়ার পরও লাবণ্যময় সজীবতা নষ্ট হয়নি, বয়েসের জোরালো কোনও ছাপ পড়েনি। তুলনায় বাবা অনেকটা জরা কবলিত এবং মায়ের চেয়ে বয়সে দশ বছরের বড়। বাবার বক্তৃতা শুনে মা বাবার প্রেমে পড়েছিলেন এবং সেই অগ্নিদীক্ষিত বাবার বক্তৃতাকে ভালবাসা কত দুরূহ আজ সংসারের দিকে চাইলে বুঝতে পারি।

মা একবার সপ্রশ্ন চোখ তুললেন আমার দিকে। আমি সচকিত হয়ে উঠে বললাম—তর্ক ঠিক নয়। বললাম, ছোটমাসি তুমি এম এ পাশ করে গেছ। তুমি অন্তত আশ্চর্য হবে না যে, বাবা শব্দটা ফার্শি। সংস্কৃত নয় একেবারেই, আরব্য রজনীর কেচ্ছায় আছে, আলিবাবা, কাশিমবাবা। আছে না? খোদা শব্দটা ফের আরবি নয়। ওটা পারশিয়ান লব্জ। খোদ মিন্‌স স্বয়ং, তা থেকে খোদা। যাকে সয়ম্ভু বলে, তারই পারস্য উচ্চারণ খোদা। মুসলমানরা সেই খোদাকে আরবির মতন ব্যবহার করে। জানে না, যাকে সে ধর্ম বলছে, তা-ও সবটা আরব্য নয়। তার সঙ্গে পারস্য মিশে আছে। আরব্য কালচার আর পারস্য কালচার এক নয়। আল্লার নিরানব্বইটা নাম, কিন্তু খোদা ফার্শি বলে ওই নামের মধ্যে পড়ে না। আরব্য কালচার আর পারস্য কালচার এক নয় আর এভাবে যদি ভাষাচর্চা করি মাসি, কারও জাত বাঁচবে না। বাবাকে আমি বাবাই বলি।

—তো? মা আরও কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।

আমি তখন ব'লে উঠি—মাসি মুখে ঝামটা দিয়ে বলল, বেশ কর। তাহলে বাবার বাংলাটা কী হবে? বললাম, বাবার বাংলা বাবা। খুব যদি জোর কর, তাহলে বলব পিতা। টিভির রামায়ণ অনুযায়ী পিতার সঙ্গে তুমি একটা শ্রী লাগাতে পার। পিতঃ পিতঃ করতে পার। তা বাঙালির কানে কি খুব শ্রুতিকর ঠেকেছে মাসি? টিভিতে যখন সিরিয়াল হচ্ছিল? শুনে মাসি না পারল মানতে না পারল ফেলতে। গোঁজ হয়ে বসে থেকে বলল, তুই তোর দাদিকে বোঝাতে পারবি এই সব কথা? বললাম, একদম না। তুমিই তো বুঝছ না।

মা ওয়াড় পরাতে গিয়ে বালিশের সঙ্গে পরাস্ত হচ্ছিলেন মাঝে মাঝেই। মনে হচ্ছিল তিনি যেন তাজী ঘোড়ার মুখে লাগাম পরাচ্ছেন। সহসা কেমন রেগে উঠে বললেন—এই সব কথা কোথায় পেলে তুমি?

—পেয়েছি। বই খুঁজলেই পাওয়া যায়।

—না। কে বলেছে তোমাকে?

—ফরহাদদা। তাছাড়া আমি নিজেও যাচাই করেছি। আশ্চর্য মা, ও না জেনে বলে না। ও মক্তবে পড়েছে, হাই মাদ্রাসায় পড়েছে, ফের অঙ্কে অনার্স করল কী করে ভেবে দেখো! এ সমাজে থেকে ওর মতো হওয়া যায় না।

—ভাল ছেলে। কিন্তু ও হল আনসারি।

—মানে?

—ফরহাদ আনসারি।

—হ্যাঁ, তাইই তো। হবেও বা।

আমি জানি না ওর নামের পদবী আনসারি। কিন্তু আনসারি হলে কী হয়।

—ফরহাদ জোলা। ছোট জাত। কিন্তু ওর বাপ ওকে স্কুলে ভর্তির সময় আনসারি

BanglaBook.org

গোপন করে ফরহাদ আহমেদ নামে ভর্তি করেছে। একথা আমিও জানতাম না। ফরহাদটা যে বোকা তা জানি। ও নিজেই কত আগে, একদিন হাসতে হাসতে গোপন গলায় বলল, আমরা জাতে জোলা জানেন তো মামি। আমরা তরতিপুরের লোক, বিলাসপুরে বাপের শ্বশুরের ভিটেয় আমরা চলে এসেছি। সবাই জানে না, আমরা কী ? তারপর কতটা আহামক ছেলে ভেবে দেখো। বললে, নিজেকে ছোটজাত ভাবলে বেশ ভালই লাগে মামিমা ! কবীর ছিলেন এই জোলা। সন্ত কবীর। শোন, আকাশলীনা। তোমার দাদি কিন্তু জানেন না, ফরহাদের পদবী। তাই না ? যাও, নামাজ শিক্ষা কর গিয়ে। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন ? বাবা আরবি না ফার্সি জানার চেয়ে আনসারি জোলা না তাঁতি তোমার জানা বেশি দরকার নয় কি ? এটাও দরকার। যাও !

মা মুহূর্তের মধ্যে এক অদ্ভুত শূন্যতার ভিতরে আমাকে নিক্ষেপ করে দিলেন। আমি কখনও জানি না, ফরহাদ ছোট জাত। আনসারি তার পদবী। মুসলমানদেরও জাত-বেজাত আছে শুনেছি, কিন্তু তা যে আমারই এত কাছে দাঁড়িয়ে জানা ছিল না। জাতভাগের তীব্রতা কমে এলেও সৈয়দীয় অহংকার দাদিমার কণ্ঠে মাঝে মাঝেই খেলে উঠতে দেখেছি। যদি বংশগৌরব কথাটি এতই অর্থহীন হত তাহলে আমার নামের আগে সৈয়দ কেন ? মায়ের কথার মধ্যে ইঙ্গিত লুকনো আছে, দাদিমা আনসারি ঘরে আমার বিয়ে দিতে চাইবেন না। অথবা দাদিমা যখন জানবেন, ফরহাদ জোলা, তখন কী হবে কেউ জানে না।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ঠেকেছে, বিপ্লবী-পত্নী স্বর্ণদীপা কেন তাঁর নামের আগে সৈয়দা ব্যবহার করেন। একটা কথা বুঝতে পারি, স্বর্ণদীপা তাঁর বাবা-মায়ের কাছে একটি অদ্ভুত কথা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন যে, তিনি মুসলমানকে বিয়ে করলেও মুসলমানদের মধ্যে অভিজাত শরিফ পরিবারে ঢুকেছেন, ইতরবর্গ অবলম্বন করেননি। ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে সৈয়দ পদবীর জন্য অকারণ গর্ব বোধ হয়েছে। মুখে কোনও গুরুত্ব না দিলেও আবীরলালদের মতো মানুষ এবং দাদিমা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আমরা নিকিরি নই, আবদাল নয়, আরজাল শ্রেণীভুক্ত নই, আমরা উচ্চ জাতি।

হঠাৎ সব অহংকার যেন চূর্ণ হয়ে গেল। বারবার মনে হতে লাগল, আমরা মুসলমানদের মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতের লোক। ফরহাদ ব্রাত্য। ও বোকা ছেলে, নাকি তা নয়, কায়দা করে মাকে তার গোত্রবর্গীয় পরিচয় জানিয়ে দিয়েছে, তার বোকামি ছাড়া একথা জানানোর উপায় ছিল না ? যাইই সে করে থাক, কারণ যাই-ই হোক, আমায় সে কিছুই বলেনি কেন ? বিলাসপুর গ্রাম এখান থেকে চার-পাঁচ মাইল দূরে। ওই গ্রাম থেকে এই গ্রাম চাঁদপুর সে আসে, বাবার টানে। শুনেছি, ওদের গাঁয়ে পালকিবাহক কাহাররা বাস করে। পাঝরা বলেও একটা জাত আছে। পালকির ব্যবসা উঠে গেছে, আতরাফি বদনাম আছে।

আমার মধ্যে এক দুর্বোধ্য অসহায়তা ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল, ফরহাদ আনসারির পরিচয় না জেনে দাদিমা তার সঙ্গে আমার শাদির পরিকল্পনা করেছেন, এই কল্পনা তাঁর অন্তরে এক গভীর সুখানুভূতি সৃষ্টি করে চলেছে, কিন্তু সুখ যে কত মিথ্যা তিনি হয়তো জানেন না।

যদি ফরহাদের মনে কোনও হীনম্মন্যতা না থেকে থাকত, তাহলে সে মাকে তার জোলা পদবীর কথা ওভাবে বলত না। হাসতে হাসতে বললেও সে তার সংকোচের কথাই প্রকাশ করেছে।

৬ ডিসেম্বর ও যখন বিলাসপুর ফিরে যাচ্ছে, সেই গভীর রাতে, আমি তাকে সদর দোর

BanglaBook.org

পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম, হ্যারিকেনের আলো আবছা হয়ে লেগেছে ওর মুখে।

মনে মনে বললাম— জানি, তুমি কেন আমার হাত ধরতে পার না।

মুখে বললাম— সারারাত বাবার ঘুম হবে না।

ফরহাদ বলল— ঘুমনোর মতন পরিস্থিতি সত্যিই নয় লীনা! তাছাড়া বাবার কষ্ট আরও আলাদা। তাঁকে কী বোঝাব বল! এই দেশটার সত্যিই কী হবে বুঝতে পারছি না। এখন মনে হচ্ছে, আমাদের কথা হয়তো কেউ বুঝতেই চাইবে না।

—তোমার কথা?

—হ্যাঁ, আমি মুসলমান হলেও, ইমামের লাঠি তো...তাছাড়া...

—বল!

—তুমি যাও, এভাবে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না।

—কেন?

—আমি ভণ্ড কি না, শুনলেই তো! আমার স্বার্থ আছে।

—ও। ওই কথাটা সত্য বুঝি!

আমার আকুল জিজ্ঞাসার সামনে আজ ফরহাদ কেমন সমাধানহীন অঙ্কের জটিলতায় আটকে ছটফট করে উঠল। আমার চোখের দিকে চেয়ে থাকতে পারল না। বলল— রাত হয়েছে লীনা! তোর বয়েস হয়েছে। উপরে যা। দোর বন্ধ করে দে। আমি চলি।

ফরহাদ আমাকে উপরে দোতলায় বাবার কাছে থাকতে বলে গেল, ও জানে না, রাত্রে আমি দাদিমার কাছে শুয়ে থাকি। দাদিমার বুকে মুখ গুঁজে আমি কখন মনেরই অজান্তে ফুঁপিয়ে উঠলাম। মাথার পিঠে চুলে হাত বুলাতে বুলাতে দাদিমা প্রশ্ন করলেন— ফরহাদ চলে গেছে?

বললাম— হ্যাঁ, দাদিমা!

দাদিমা বললেন— কাঁদছিস কেন মা? জহির বিশ্বাস তেড়ে অপমান করতে এসেছিল। বেকটে পড়লেই ওরা আমাদের জুলুম করতে আসে। যারা বাবরি ধসিয়ে দিলে, তাদের তো জহির হাতের কাছে পাবে না। ভয় পেয়ে এসেছিল, আমার খোঁড়া ছেলেকে দুষল, যে জাতধর্ম বোঝে না, তার ওপর মর্দানি করা সহজ আসমানতারা।

একথা বলে অনেকক্ষণ দাদিমা চুপ করে রইলেন। সন্তানকে স্তনদান করার সময় মা যেমন কাত হয়ে শুয়ে তালুতে গাল রেখে বালিশের উপর বাহুমূল স্থাপন করে বাহুকে ঠেকনোর মত খাড়া রাখেন এবং মাথার ভার হাতের উপর রেখে বুকের তলায় সন্তানের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, দাদিমা সেইভাবে আমার কান্নার স্পন্দন লক্ষ করছিলেন। তাঁর বাঁ হাতখানি আমার পিঠের উপর পড়েছিল, চৌকাঠে পলতে কমানো হ্যারিকেনের ক্ষুদ্র শিখা মোলায়েম স্বল্প আলোয় ঘরময় বিকিরণ করছিল। দাদিমার ছায়া পড়েছিল দেওয়ালে, অর্ধশায়িত সেই ছায়া বৃহদাকৃতি জননী ঈভের মতন চিত্রার্পিত ছিল গুহাগাত্রে, শুধু আলোর শিখা ছাড়া এই ঘরকে গৃহ মনে করার কারণ ছিল না। আমি বিশাল মাতৃবক্ষে ভয়ে এবং নিরাপত্তার আবেষ্টনীতে পড়ে ছিলাম, আমার অশ্রু-উৎস বাঁধ মানছিল না।

আমার চাপা, মৃদু আর অর্ধস্ফুট কান্না শুনতে শুনতে দাদিমা সহসা সবেগে আমাকে তাঁর বুকের মধ্যে আকর্ষণ করলেন। অধিক নিবিড় করে চেপে ধরে বললেন— তোর কষ্ট বুঝি মা। মনে মনে ফরহাদকে তুই কত ভালবেসেছিস খোদা-ই জানে, ভালবাসলে, ওই মুহব্বত আপসে আপ আঁসু টেনে বার করে।

BanglaBook.org

আমার মুখ দিয়ে বার হয়ে এল— ওকে কেউ ভণ্ড বলবে ভাবতেই পারি না দাদিমা।

দাদিমা বললেন— গাঁয়ের মানুষের মুখের কথাই ওই ধারা। তাছাড়া হিংসে!

—হিংসে কিসের?

—তুই যে সুন্দরী লীলা! ওরা জানে, এই গ্রামের মধ্যে কোথাও তোর বিয়েশাদি হবে না। তোর মা হতে দেবে না। এই সমাজে তোর মা তোকে মিশতে দেয়নি। এই সমাজকে তোর মা পরোয়া করে না, ঘৃণা করে। ঘৃণা না করুক, উপেক্ষা করে। অথচ তোর ওপর সবার লোভ আছে। লোভ থাকলেই বুঝবি হিংসে আছে। এই বাড়িতে ফরহাদ ছাড়া কোনও ছেলের জায়গা নেই, ঢুকতেই পারে না। যারা আসে, ওই উঠোন পর্যন্ত আসে।

—ফরহাদ না এলে বাবাকে কে দেখবে? সঙ্গে থাকবে কে? বাবা যে ওকে না হলে চলতে পারেন না। একজন বুদ্ধিমান মানুষের আর একজন মেধাবী মানুষ চাই, বাবা কার সঙ্গে কথা বলবেন!

—কথা সবার সঙ্গেই বলতে চায় ইমাম। ছোট বড় করে না। তোর মা এই সমাজকে ভালবাসতে না পারে, কিন্তু ইমাম বাসে।

—লোকে বোঝে না দাদিমা!

—বাপ যদি তোর এই গাঁয়ের মাতব্বর-ঘরে শাদি করিয়ে দেয়, তাহলে আর গোল থাকে না আসমানতারা। তা করলে ভালবাসা জাহির হয় খুকি। জেল খেটেছে ইমাম, সে কিছু না। লোকে ভাবে, ওটা একটা রোখ। ইমাম তার জেদে মরেছে, সমাজ তার কী করবে!

—অথচ বাবা এই সমাজের জন্যই তো করেছিলেন!

—ফরহাদ তাইই মনে করে লীলা! আর কেউ করে না।

—আমি করি।

—তুই তো মেয়ে, তোর কথা কে ধরছে!

দাদিমা এবার অসম্ভব চুপ করে গেলেন। আমিও চুপ করে থাকি।

দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলে হঠাৎ দাদিমা বললেন— ভণ্ড শুধু ফরহাদকেই বলেনি ওরা। তোর বাপ-মা আর আমাকেও বলেছে। দুঃখ কোরো না। ঘুমোও।

—তুমি সৈয়দ বলেও কি আমরা এ সমাজে আলাদা দাদিমা?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়!

—ও!

আমার কণ্ঠস্বর যেন আর ফুটে উঠতে চাইল না। অদৃশ্য অযুত শৃঙ্খল আমার চারপাশে ঘিরে আসতে থাকল। মনে হল, দাদিমার এই বৃহৎ বুকখানির মধ্যে আমার কোনও আশ্রয় নেই। দাদিমা এমন জোর দিয়ে 'হ্যাঁ নিশ্চয়' বলে উঠলেন যে, মনে হল তিনি মুহূর্তে স্বাতন্ত্র্যবোধের এক সুকঠিন কারা-প্রাচীর খাড়া করে তুললেন।

রাত আরও গভীর হয়েছে। সহসা কোথাও দূরবর্তী গ্রামে গুলির আকাশস্পর্শী আওয়াজ ভেসে উঠল। মনে হল, নক্ষত্রে নক্ষত্রে সেই সহিংস শব্দ ধাক্কা দিয়ে চলে গেল। দাদিমা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তাঁর কানে এই শব্দ পৌঁছল না। আমি উঠে পড়লাম। দোতলায় রুদ্রর গলা শোনা গেল। রুদ্র বাবাকে ডাকছে। মাকেও ডেকে উঠছে। উপরে উঠে আসি আমি।

বাবা খাটের উপর উঠে বসেছেন। মা বাবার কাছে উঠে এসেছেন পাশের ছোট খাট থেকে, পাশের ঘর থেকে হ্যারিকেন উসকে তুলে ছুটে এসেছে এ ঘরে রুদ্র।

আমি যখন ঢুকলাম, কেউ কোনও কথা বলছে না। রুদ্র একটি অনুচ্চ টুলে বসে পায়ের কাছে হ্যারিকেন বসিয়ে রেখেছে। আমাকে দেখে বাবা বললেন— দাদিমা কি জেগে আছেন ?

বললাম— উনি শোনেননি। ঘুমিয়ে গেছেন।

—তুমি জেগে ছিলে ? কেউ আর আমরা ঘুমাতে পারছি না। ঘুম আর আসবেও না। ভাবছি, ফরহাদটা আবার ঠিক পৌঁছতে পারল কিনা।

একথায় রুদ্র বাবার মুখের দিকে উচ্চকিতভাবে চাইল। দৃষ্টি কঠিন করে বলল— তোমার এই গ্রামে সত্যিই আর টেঁকা যায় না বাবা ! এই গ্রাম দিয়ে তুমি শহর ঘিরতে চেয়েছিলে ? সেই তুমিই আজ শান্তি কমিটির মেম্বার, ওই কমিটি দিয়ে মস্তানবাহিনীর কার্যকলাপ রুখবে, ঘরে ঘরে আজ বন্দুক-মাস্কেট, গোলা-বারুদ, আজ আর চাষীর হাতে বন্দুক তুলে দেওয়ার দরকার করে না।

—চাষীর হাতে বন্দুক নেই রুদ্র। মস্তান আর চাষীকে তুমি এক করে দেখছ কেন ?

—চাষীর উপর মায়া কিন্তু এখনও তোমার গেল না বাবা ! কিন্তু মস্তানগুলো তো শহর থেকে আসেনি। রাজনৈতিক দলগুলোর পুষ্যি এরা। থানার সঙ্গে যোগসাজসে গুণ্ডাবাহিনী গড়ে উঠেছে। পাড়ায় পাড়ায় এরা খোলা তলোয়ার হাতে, পিঠে বন্দুক ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবাই চাষীঘরের ছেলে। এমন যে হবে কেউ ভেবেছিল কখনও ? অবশ্য আমি ভেবেছিলাম।

—তুমি ভেবেছিলে ? বাবা আশ্চর্য হয়ে রুদ্রর চোখে সরাসরি চাইলেন।

—হ্যাঁ, ভেবেছিলাম বইকি ! রুদ্র প্রায় নিশ্চিত স্বর ফোটায় কণ্ঠে।

মা বললেন— থ্রি মাস্কেটিয়ার্স বলে একখানা উপন্যাস পড়েছি, কিন্তু চাষার মুখে মাস্কেট শুনব ভাবিনি। এখানকার চাষীবউ পর্যন্ত ইংরেজি বলে, কী বিচিত্র তার উচ্চারণ। অনেক ইংরেজি ফের এখানকার ডাইলেক্ট হয়ে গেছে ! তোমাকে একটা উদাহরণ দেব, শুনবে ?

মা এবং ছেলের যুগপৎ আক্রমণে এই এত রাত্রে বাবাকে কেমন অসহায় দেখাচ্ছিল। বাবা অসহায়ের মতনই অবাক হয়ে বললেন— উদাহরণ !

—হ্যাঁ। এটা যে ইংরেজি, তা বুঝতে আমার বিশ বাইশ বছর সময় লেগেছে। সামনের বাড়ির সফরের বউ খুব দড় মেয়ে। স্বামীকে শাসাচ্ছে সেদিন। বারবার চোখের উপর আঙুল নেড়ে নেড়ে বলছে, দ্যাখো মোল্লার পো, ই'রম কর‍্যা বাউস খেলবা না, দুই মুখা সাপ, একমুখে কাটো তো আর মুখে বুলো কাটো নাই, বাউস খেলবা না এদিক উদিক। আমার মায়ের ঘর যাবা না। এই বাউস আসলে বাউন্স। আমার স্কুলের ক্লার্ক মাধববাবু সেদিন আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, কথাটা হল বাউন্স। বাউস বাউস করে বলেছিল তো···বউ জানেই না এটা ইংরেজি।

বাবা বললেন— তোমার স্কুলের শহুরে দিদিমণিরা চাষীর মুখের ডাইলেক্ট নিয়ে খুব চর্চা করে শুনেছি। তুমিও আজকাল উপভোগ করছ দেখছি।

মা তাঁর চোয়াল ঈষৎ শক্ত করে বললেন— মাস্কেট কথাটাও এখন এই জেলার ডাইলেক্ট হয়ে গেছে কিনা, তাই আমাদের ওইসব চর্চা করতে হচ্ছে বইকি ! ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না বলে এখন অনেককিছুই গায়ে মাখতে হয়। চর্চার কথা বলছ, এই গাঁয়ে আর চর্চার আছে কী ? স্কুলে ভয়ে ক্লাশ পর্যন্ত মন দিয়ে করাতে পারি না। নোংরা পলিটিক্স তো আছেই, এখন হয়েছে মাস্কেটের ভয়। এই যে গুলির আওয়াজ শুনলে···ভোর হতে দাও, জানতে পারবে।

BanglaBook.org

—মরছে তো চাষী ! মার খাচ্ছে কারা ? চাষী চিরকালই নিরস্ত্র। আমরাই চাষীর হাতে অস্ত্র তুলে দিতে চেয়েছিলাম। বল, এত যে মানুষ মরছে, বাবুশ্রেণীর ক'জন মরেছে ? যারা ডাইলেকট নিয়ে উপহাস করে, তারা মরেছে কেউ ?

রুদ্র বলল— মরেনি। তবে মরবে।

—কে মরবে ?

আমরাই মরব। আমরা কি বাঁচব ? তুমি কি ভাবছ, দাঙ্গা হবে না ?

—না। হবে না। বরং কিছুদিনের জন্য এই দিগরে মাস্কেটের উপদ্রব কমবে। তাছাড়া প্রশাসনিক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যাতে করে···

—তোমার মুখে প্রশাসনের গুণগান···আচ্ছা বাবা, তোমার ভবিষ্যতের কথা এই দেশে ফলেছে কতটুকু ? ওয়ান পার্সেন্ট ?

বাবা এবার নিঃশব্দে আপন মনে হেসে ফেলে বললেন— তুই কি রুদ্র এই গাঁয়ে আর থাকতে চাস না ?

—না। একদম না।

—কী করবি ?

—ফিরব না।

—তুমি ? বলে মায়ের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন বাবা।

মা আশ্চর্য নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন সহসা। বাইরে আকাশতলে একদল রাতচরা পাখি উড়ে গেল, দূরে বাগানের মধ্যে আচমকা কর্কশ পেঁচা ডেকে উঠল। কেমন ভয় করল আমার। মা আমার দিকে অত্যন্ত জোরালো দৃষ্টিতে নির্নিমেষ চেয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। মায়ের চোখের সাদা ডিমে তেরছা আলো এসে পড়ল ; রুদ্র হ্যারিকেনটা মেঝেয় রেখে ঘুরিয়ে দিয়েছে। আমরা সবাই মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আছি।

মায়ের ঠোঁটদুটি কেঁপে উঠল মৃদু মৃদু। মায়ের এমন দৃষ্টি কখনও দেখিনি। মাকে আমার কেমন অচেনা মনে হল। ওই দৃষ্টি যেন কাউকেই আর চিনতে চায় না, স্বীকার করতে চায় না।

কথা বলার আগেই মায়ের স্বর ভিজে ভেঙে গিয়েছিল। বাবার সামনে মা মাথা নিচু করলেন। অচেনা এক নারীকণ্ঠ ক্ষোভদীর্ণ অথচ চাপা ভীত এবং নিঃস্ব আর সকরুণ ব্যথায় বলে উঠল— আমি ফিরতে চাই ইমাম।

এ যেন বিদায়-বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত, সমগ্র জীবনোপলব্ধির কণ্ঠনাদ, বিদীর্ণ বিক্ষত এক প্রাণের আকুতি, এ যেন ক্ষমা প্রার্থনা। বাবার মুখের উপর পড়েছে একটি দাগ, হ্যারিকেনের ছায়া। বাবার নাকের উপর হ্যারিকেনের ডাঁটির ছায়াটি বাবাকে দুভাগ করে ফেলেছে।

বাবা বুঝতে পারছেন না, মায়ের কথার অর্থ কী, বাবা বিমূঢ়। মা কোথায় ফিরবেন ? কেউ আমরা কথাও বলছি না কোনও। ভাবছিলাম বাবা জানতে চাইছেন, কোথায় ফিরবে তুমি স্বর্ণদীপা ? তোমার কি কোথাও ঠাঁই আছে ?

মা নিজেই বলেছেন কতদিন। কোথাও তাঁর আশ্রয় ছিল না। জায়গা দিতে হবে বলে প্রত্যেকে তাঁকে ভয় করত। একদা ফুপুমায়ের বর মায়েরই চোখের উপর দোর বন্ধ করে দিতে দিতে বলেছিলেন— অন্য কোথাও দ্যাখো স্বর্ণদীপা, আমি গেরস্ত লোক, তোমাকে রাখলে আমি বিপদে পড়ব। কিছু মনে কোরো না, তোমার বিপ্লবী স্বামীটি একটি ডাকাত। দেশের ভাত খাচ্ছে আর তোমাকে ছেলে-মেয়ে নিয়ে পরের পাত কুড়োতে হচ্ছে, ও সেকথা জানে ? তুমি এখানে থাকলে পুলিশ-চৌকি বসে যাবে আমার উঠোনে।

BanglaBook.org

আমাকে মাফ করতে হবে।

বাবা মাত্র এক বৎসর আগে জ্যোতি বসুর প্রশাসনিক সুমতির কারণে মুক্তি পেয়েছেন। বাবার নামে খুনের অভিযোগ ছিল। বাবা ছিলেন তাঁর দলের তাত্ত্বিক নেতা এবং একদা তাঁর ডাকে শত শত তরুণ-তরুণী উদ্বেলিত চিত্তে আত্মোৎসর্গের রাজনৈতিক দীক্ষা নিয়ে ঘর ছেড়ে গিয়েছিল। সেই বাবাকে চোখের সামনে দেখে বোঝাও যায় না, বাবা এমনই ছিলেন। শুধু বোঝা যায়, তাঁর চোখের দৃষ্টি আশ্চর্য উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ। শরীর কাঁপে, কিন্তু এখনও কণ্ঠস্বর নড়ে যায় না। জীবন তাঁর কাছে এখনও তাৎপর্য হারায়নি।

বাবা হঠাৎ কাতর গলায় বলে উঠলেন—তুমি আজ, এতদিন বাদে এই রকম করে বলছ? আমার সংগ্রাম ব্যক্তিগত স্তরে কোথাও খুব ভুল হয়েছিল এখনও আমি মনে করি না। স্বর্ণদীপা। বিপ্লব হওয়া না হওয়ার উপর একজন প্রফেশনাল বিপ্লবীর সার্থকতা ব্যর্থতা নির্ভর করে না। জীবনটা সে কেমন অতিবাহিত করেছে, তা-ই তার ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয়।

—তুমি বা আজ আমাকে এই সব কথা বোঝাতে চাইছ কেন?

—চাইছি এই জন্যে যে, কোথাও তোমার মনে জীবন সম্পর্কে আফসোস জমা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তুমি কী চেয়েছিলে?

—তোমাকে।

বাবা এবার মাথা নিচু করলেন। বাবার মুখের উপর থেকে হ্যারিকেনের ছায়ার দাগ সরে গেল। রুদ্র হ্যারিকেন হাতে করে উঠে দাঁড়াল। আমাকে আলতো স্পর্শ করে চোখের ইশারায় বাইরে ডাকল। আমরা খোলা ছাদের উপর চলে এলাম। চলে আসতে আসতে শুনতে পেলাম, বাবা বলছেন— তুমি জানতে, আমাকে পেতে হলে, আমার কাজের মধ্য দিয়েই পেতে হবে।

—না, জানতাম না। তবে কাজের মধ্য দিয়ে তোমার একজন কমরেডও তোমাকে পেয়েছে, পার্টি পেয়েছে। ভাবি, আমার বেলায়ও যদি শুধু সেইটুকুই হত, ভাল ছিল।

—তার মানে?

—অন্তত আকাশলীনাকে দেখিয়ে কেউ বলতে পারত না, তোমার এই মেয়ের জন্মের ঠিক নেই। আমার শাশুড়ি-মা পর্যন্ত ভেবেছেন, আমি নষ্ট মেয়ে। তোমার সব কাজের সমান ভাগ বইবার সাধ্য আমার ছিল না। ইস্রাম। ছিল না।

এক মিনিট মা চুপ করলেন। তারপর বললেন— তুমি জেলে রয়েছ। অনন্তবাবুর উদ্যোগে চাকরিটা যখন হল, সবে স্কুলে ঢুকেছি, একদিন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন স্বয়ং হেডমিস্ট্রেস। তাঁর সঙ্গে হাত লাগাল আরও দুজন দিদিমণি। জোর করে ধরে পেড়ে আমার সিঁথিতে লিপস্টিক ঘষে দিলেন ঘষে ঘষে, অমানুষিক বলপ্রয়োগ বলতে পারো। তারপর হেডমিস্ট্রেস কী বললেন শুনবে? বললেন, স্বামী জেলে তো কী হয়েছে, তাই বলে হিন্দুর মেয়ে সিঁথি ফাঁকা করে ঘুরে বেড়াবে, আমার ছাত্রীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা ঠিক নয়।

মা ফের এক মিনিট চুপ করে থেকে বললেন— ওই অবস্থায় বাড়ি ফিরে এলাম। দেখি, নীচের বড় ঘরটায় অনন্তবাবু কখন এসে বসে রয়েছে, মা ওর সঙ্গে ভাল করে কথাও বলেনি। অনন্তবাবুকে দেখেই আমার কেমন কান্না পেয়ে গেল। সে বসে রয়েছে খাটের কাছাকাছি একটা চেয়ারে। আমি খাটে স্বাভাবিকভাবে উঠে বসেই দু'হাতে মুখ ঢেকে কেন যে ফুঁপিয়ে উঠলাম আজও বুঝে পাই না। আমি কাঁদছি আর সে আমাকে

সান্ত্বনা দিচ্ছে। এক সময় সে উঠে এসে আমার পিঠে হাত রেখে বলল, ব্যাপারটাকে অপমান ভাববেন না—এইই সমাজ-ব্যবস্থা বউদি। ...এই দৃশ্য তোমার মা দেখেছিলেন।

মা এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। রুদ্র আমাকে চাপাস্বরে ডাকল— চলে আয়!

হ্যারিকেন হাতে করে ছাদে গিয়ে দাঁড়াল রুদ্র। আমি খোলা ছাদে চলে না গিয়ে তখনও ছাদের তলে বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

মা বললেন— আজ আমি মনে করি, হেডমিস্ট্রেস খারাপ কিছু করেননি। রুদ্র আমার রূপ দেখে ভাবত, আমি মা নই। হাত কান গলা নেড়া, রঙিন শাড়ি পরি, কিন্তু ঝলমলে তো পরি না, কপালে টিপটাও দিই না, সিঁদুর তো নেইই— আমি তাহলে কে? কোনও বিয়েবাড়ি অথবা জলসা, কোনও ফাংশানে আমি যাব, বড় হয়েও রুদ্র বলেছে, তোমাকে যেতে হবে না। তোমার কাজের মধ্য দিয়ে তোমাকে পেতে গিয়ে আমার কী না হয়েছে? রুদ্রর ফাইমোসিস অপারেশনের ঘটনা তোমার জানা নেই। দাদি ওর খৎনা করাবেন, ও না হলে মুসলমান হওয়া যায় না। তা নিয়ে আমার সঙ্গে দাদিমায়ের বিরোধের অন্ত ছিল না। মন কষাকষির চূড়ান্ত হয়েছে। আমি মায়ের কাছে পালিয়ে গেছি। কিন্তু তাঁদের বলতে পারিনি রুদ্রর জন্য রবীন্দ্রনগর চলে এসেছি। চেপে থেকে থেকে...

রুদ্র এবার ছাদে হ্যারিকেন বসিয়ে রেখে ছুটে এসে জোর করে আমাকে ছাদের মধ্যে টেনে আনল। মুখোমুখি বসলাম আমরা দুই ভাইবোন। সম্মুখে হ্যারিকেনটা শিখা কমিয়ে রাখা। আকাশ স্থির।

বললাম— তোর মনে আছে দাদা?

রুদ্র শুধু বলল— হুঁ!

বললাম— সেই যে টসের খেলা। হেড না টেল। দিদা না দাদি! জল না পানি। মনে নেই?

রুদ্র আমার কথার উত্তর না দিয়ে অসম্ভব গম্ভীর হয়ে রইল। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ রুদ্র তার দু পায়ের ফাঁকে মাথা গুঁজে নিঃশব্দে বসে থাকতে থাকতে কেঁপে উঠল। ওর বাঁকানো পিঠ একটু একটু করে ফুলে ফুলে উঠল। রুদ্রর গলায় অত্যন্ত চাপা কান্না প্রবল চেষ্টাতে দমাতে গিয়ে শরীরে তার কাঁপুনি চৌচির হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। বয়েস হলেও রুদ্র এখনও ছেলেমানুষ।

আমি সবিস্ময়ে বললাম— তুই কাঁদছিস দাদা!

রুদ্র মুখ তুলে ভিতরের কষ্টকে মুখ উঁচিয়ে দম ফেলার ভঙ্গিতে প্রশমিত করতে চাইল। সে যে কাঁদছে, তা কাউকে বুঝতে দিতে চায় না।

আমার সব স্পষ্ট মনে আছে। হাত-আয়নাকে বলি, আমরা সেই দৃশ্য ভুলিনি। মা রুদ্র আর আমাকে সঙ্গে করে সন্তোষপুর রবীন্দ্রনগর চলে এসেছেন, খৎনার ভয়ে। কিন্তু দিদাকে সেকথা বলতে পারছেন না। বললে দিদার কী উত্তর হবে জানি না। হয়তো বলবেন, তুমি মুসলমানের বউ হতে পেরেছ আর ছেলের মুসলমানি দিতে পার না? অথবা বলবেন, তোমার ছেলের কী হবে না হবে, তোমারই বিবেচনা, বাপ জন্ম দিয়েই খালাস, দায়-দায়িত্ব তোমারই, তোমার সিদ্ধান্তই বলবৎ হবে। কেন হবে না? তুমিই রুদ্রকে মানুষ করছ, তোমার জাতই তার জাত। ওই রকম একটা বর্বর কাজ না করলেই কি চলে না!

সেদিন রাত্রে চাপা সেই বিপন্নতার মধ্যে লেপের মধ্যে ঢুকে আমরা দুই ভাই-বোন লেপের আড়াল দিয়ে টস খেলছি। ধাতুমুদ্রার এক পৃষ্ঠা দিদা অন্য পৃষ্ঠা দাদি। হেড টেল না বলে আমরা বলি দিদা আর দাদি। এইভাবে আমরা ঠিক করি, আমরা সন্তোষপুর থেকে ভোরে চলে যাব কিনা। যদি যেতে হয়, আমরা মায়ের উপর জিদ করে

BanglaBook.org

কেঁদে-কেটে বার করে আনি। মা বুঝতে পারেন, আমাদের আর ভাল লাগছে না।

আমাদের অস্থিরচিত্ততা মায়ের মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে মায়ের অস্থিরতা পরস্পর সঞ্চারিত হয়। সেদিন টসের সময় দিদা আমার হাতের মুঠো কয়েনসুদ্দো চেপে ধরে বললেন— অত দাদি দাদি করছ কেন এখানে, যাও না কালই চলে যাও। হাতের মুঠোয় কী দেখি!

কেউ সংসারে বুঝবে না আমাদের অস্থিরতার কথা। এমন শক্ত করে ধরে টাকাটা দিদা কেড়ে নিলেন যে আমার কান্না পেয়ে গেল। দিদা বললেন— এত দাদি দাদি করলে কি আর পানি জল হয় লীনা বেগম। হয় না। শোন রুদ্র, দাদি তোর মুসলমানির কথা বলে খুব না রে? তুই কি করবি? আমার যদি নাতি হও, তাহলে ওই...

রুদ্রর শরীরটা তখন কেমন বেঁকে গেল। ধর্ম যেন একটি সুচের মতন ওর শরীরে ঢুকে পড়তে চাইছিল। রুদ্রর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল।

আমরা চাঁদপুর পাড়ি জমাই পরের দিন ভোরেই। দিদা দুঃখ করে বললেন— রাগ করিস না রুদ্র, আমি তোকে ঠাট্টা করেছি। বয়েস হচ্ছে ছেলের, একটা যা হোক মীমাংসা করে নাও স্বর্ণদীপা! বড় হয়ে গেলে কাটতে পারবে না।

মা বললেন— ওকে আমি ডাক্তার দেখাব ঠিক করেছি, ওর পেচ্ছাপের গণ্ডগোল হচ্ছে।

দিদা হাসতে হাসতে বললেন— সাপ যাতে মরে আবার লাঠিও না ভাঙে তাই তুমি চাইছ তো! বুঝি মা।

মা বললেন— না মা। সত্যি বলছি, রুদ্রর অপারেশনের কথাই ডাক্তার বলেছেন, আমি ওর জন্য অশিক্ষিত হাজাম বসাতে পারব না। চোঁচ দিয়ে কাটবে তা আমার সহ্য হবে না।

দিদা বললেন— দ্যাখো, যা ভাল বোঝো কর! আমরা কী বলব!

ফেরার পথে সেই ঘটনাটি ঘটল। মা গঞ্জে নেমে সামান্য কিছু কেনাকাটা শুরু করলেন, আমরা দুই ভাইবোন একসঙ্গে চাঁদপুরের দিকে রওনা দিয়েছি, মা পিছনে আসছেন। বলেছেন— তোরা এগো।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি আমরা। চৌমাথার মুদির দোকানের ওখানে সান্ধ্য-মজলিস বসেছে। একটু দূরে মসজিদ। সন্ধ্যার আজান তখনও পড়েনি।

ওরা আমাদের পথ আটকাল। একজন আচমকা জোর করে ধরে রুদ্রকে উলঙ্গ করে ফেলল। ভয় পেয়ে গেছে রুদ্র। চিকিয়ে কেঁদে উঠেছে। লোকটা একা নয়। দুতিন জন রুদ্রর হাত এবং পা ধরে বল প্রয়োগ করল। কতক লোক হো হো করে হেসে উঠল। একটা অদ্ভুত তামাশার মধ্য দিয়ে উলঙ্গ শিশুর জাত পরীক্ষা করল ওরা। শিশু হলেও রুদ্রর বুদ্ধি হয়েছে। এমনকি লজ্জা এবং আত্মসম্মানবোধ জন্মেছে।

সাম্প্রদায়িক মানুষ শিশুরও অধম, পৃথিবী সম্পর্কে কখনও তাদের কান্ডজ্ঞান জন্মায় না। রুদ্রকে যখন ওরা ছেড়ে দিল, ও প্যান্ট বুকে করে উর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে বাড়ির দিকে ছুটে চলল। দাদিমার বুকে আছড়ে পড়ে বলেছিল— ওরা অমন কেন করল দাদিমা! অমন কেন করল? ওরা মারবে আমাকে?

—না না। ঠাট্টা করেছে বাপ।

—না, মুঠোর মধ্যে ছুরি ছিল দাদিমা! লুকিয়ে রেখেছে।

—না, তোমার ভয় নেই। কোনও ভয় নেই। চলো, কে অমন করেছে, আমি দেখছি। জাত নিয়ে চুলোচুলি করবে, আমি বরদাস্ত করব না। বাচ্চা ছেলে কী বোঝে!

বড় হবে এই ছেলে, তখন তার এই সব ঘটনা মনে পড়বে না ? তোমার ইসলাম কি এই রকম ? নবী তাই বলেছিলেন তোমাদের ? সাচ্চা ইমানদার কে ? যে কিনা তার হাত এবং জিভ দিয়ে অন্যকে অত্যাচার করে না— সেইই তো মোমিন মুসলমান। মসজিদে পাঁচবেলা আজান হাঁকাচ্ছ আর মুঠোর মধ্যে ছুরি লুকিয়ে রাখো। তুমি দেখেছ ঠিক ?

আমি তখন দাদিমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে অবিরল অশ্রু ঝরাচ্ছি ভয়ে, চূড়ান্ত বিপন্নতায়। বলা বাহুল্য, রুদ্রর ফাইমোসিস অপারেশনই হয়েছিল। মুঠোর মধ্যে ছুরিকা রুদ্রর কল্পনা মাত্র। দোতলার ছাদে বসে আবার শোনা গেল গুলির শব্দ। রুদ্র বলল— এই দেশটা আমাদের নয়। কিছুতেই আমাদের নয় লীনা ! ভাবছি, ফরহাদদা পৌঁছতে পেরেছে তো !

৪. বকুলের জুতো এবং ফরহাদ আনসারি এবং এক বৈষ্ণবী

রুদ্র কত ভোরে বাড়ি ছেড়ে বার হয়ে গেছে আমরা টের পাইনি। এ বাড়ির কিষেণ মুস্তাফা ওকে সাইকেল বার করতে দেখেছে। আকাশ রাঙিয়ে ওঠার অনেক আগে অন্ধকার ফিকে হয়নি তখনও যথেষ্ট, রুদ্র পথে নেমে গেল। মুস্তাফা শুধিয়েছিল কোথা যাও দাদা, রুদ্র কথা বলেনি। কিষেণ বয়সে বড় হলেও রুদ্রকে দাদা ডাকে।

আমার কেন যেন মনে হল, রুদ্র বিলাসপুর চলে যেতে পারে। ও রাত্রে বারংবার ফরহাদের কথা বলছিল। স্বরূপগঞ্জে পৌঁছে আরও দু'খানি ছোট বড় গ্রামের পথ ঠেঙিয়ে পার হলে, তবে উত্তরের গ্রাম বিলাসপুর।

ফরহাদ রাত বিরেতে একা চলে যায়। সঙ্গী কেউ থাকে না। ওর ধারণা ওকে মারবার লোক পথে বসে নেই, সে ক্ষুদ্র মানুষ। অবশ্য এই যুক্তি যে কত হাস্যকর, তা সে নিজেও জানে। আসলে গ্রাম তো ক্ষুদ্র মানুষেরই জায়গা, এখানে বৃহৎ মানুষ কোথা থেকে আসবে। এক কাল ছিল, যখন বিদ্যাসাগর জন্মাতেন। এখন গ্রাম পলিটিক্যাল ক্যাডার এবং জঙ্গি নেতা ছাড়া কিছুই উৎপন্ন করতে পারে না। তবে বাবার মতন তাত্ত্বিকচিন্তাবিদ মানুষ ইদানীং কেন, সব কালেই আকছার জন্মেছে বলে জানা নেই। বাবা চাঁদপুরে জন্মালেও বাবাকে ক্ষুদ্র গ্রামটির সীমানার মধ্যে কখনও আঁটেনি, প্রায় প্রথমাবধি তিনি তীক্ষ্ণ মেধার জোরে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন।

আমার ক্ষুদ্র গোল আয়নায় আমার মুখমণ্ডল যেমন ধরে না বা আসে না বা উপচে যায়, বাবার মেধার সমগ্র অবয়ব তেমনি এই গ্রামের ফ্রেমে বাঁধা যায়নি, উপচে ছড়িয়ে গিয়েছিল একদা। এসব কথা আমার মনে হলেও গ্রামের মানুষ তাঁকে একজন পঞ্চায়েত-প্রধানের চেয়ে গুরুতর কেউ, ভেবে উঠতে পারে না, চিন্তাশীল মানুষকে গ্রাম সহ্য করে না—গ্রামের মাস্টাররা পুরোপুরি গেরস্ত, ওরা বাবাকে করুণার চোখে দেখে। সবচেয়ে কম বিদ্যা, সবচেয়ে চালাকি এবং পার্টি-তোষণ করে যে সার্ভিস পাওয়া যায় তাই-ই হল মাস্টারি। বড় বড় ডোনেশান দিয়ে এই চাকরিতে ঢুকতে পার, তবে পার্টির সমর্থনও লাগবে, শুধু ডোনেশানই যথেষ্ট নয়।

অবশ্য এই সব ঘটনার তীব্র ব্যতিক্রম ফরহাদ। স্রেফ মেধার জোরে ওর চাকরি। প্রায় অলৌকিক তার গাণিতিক মেধা, চাকরিই তার কাছে পায়ে সেধে গেছে। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির মেম্বারদের সামনে ইন্টারভিউ দেবার দিন ও বলেছিল—দেখুন ! আমাকে যদি ব্ল্যাকবোর্ডে গিয়ে চক-পেন্সিল ডাস্টার হাতে অঙ্ক কষে দেখিয়ে জ্ঞানের পরীক্ষা দিতে হয়, তাহলে আমি চলে যাচ্ছি। তাছাড়া টাকা-পয়সা চাইলে দিতে পারব

না। আমার বাপ ছোট চাষী, দেবার মতন পয়সাকড়ি আমাদের নেই। দ্বিতীয়ত আমার একটি শর্ত আছে, আমি এম এস সি পড়ব। দু'বছর চাকরি করার পর আমাকে উচ্চশিক্ষার জন্য ছুটি মঞ্জুর করতে হবে। তারই পূর্ব প্রতিশ্রুতি আমার চাই।

পলিটিক্সের আখড়া হল স্কুল। মাগগি ভাতার বৃদ্ধি ঘটলে স্ল্যাব অনুযায়ী বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করা টিচারদের একটা চিত্তাকর্ষক অঙ্ক। ফরহাদ একদিন বাবাকে এসে বলল— সবাইকে বললাম আমি, এই অঙ্ক আমার কলেজের সিলেবাসে ছিল না, স্কুলের কোর্সেও নেই, ওটা আমি কষতে পারব না, ওটা আপনারাই দেখুন। দু'দুটো পিরিয়ড টিচার্স রুমে স্ল্যাব দেখে দেখে কাটিয়ে দিলেন আপনারা, এখনও শেষ হল না। আরে যা পাওনা, তার হিসেব ক্লার্কই তো করেছেন! এ সব কাজ.....যাক গে....টিচাররা যে এত বিষয়ী হয় আমার জানা ছিল না।

—তা কেন থাকবে, তোমাকে তো ডোনেশন দিয়ে ঢুকতে হয়নি এখানে! তোমার অহংকার হয়েছে। আমাদের নতুন সেক্রেটারি ফের শিক্ষাব্রতী কিনা, ম্যাট্রিকে হ্যাট্রিক। মানে তিনবার ফেল করা নন-ম্যাট্রিক ফেলো। ওই গোঁয়ারটাই তোমাকে ঢুকিয়ে ছাড়লে, নইলে বুঝতে কত ধানে কত চাল। বলে উঠল অ্যাসিসট্যান্ট হেডমাস্টার মন্মথ গনাই। আমার প্রশংসা না নিন্দা বুঝতে পারলাম না মামা! বলে হাসতে লাগল ফরহাদ।

বাবা শুধালেন—তুমি কি ঠিক টিকতে পারছ না?

ফরহাদ বলল—কোথায়? স্কুলে? নাহ্—আমি তো একা! রাজনীতি করি না। টিউশন করি না। করি ফ্রি-তে। একটা অবাস্তব ব্যাপার। এ যুগে আমি বেমানান। তিনবেলা টিউশানি করছে মাস্টাররা। আপনার ভাষায় ইকনমিক বিস্ট্। টিউশানি করে ঘাড়ে কড়া পড়ে গেছে প্রত্যেকের। আশ্চর্য! আমি করি না বলে ওরাই আমাকে ব্যঙ্গ করে। আর আপনার কাছে আসি বলে ওরা ভয়ানক তাজ্জব হয়ে যায়। আমার সাবজেক্ট অঙ্ক। টিউশানির ব্যবসা খুললে বড়লোক হয়ে যেতাম। তবে আমাকে হয়তো অঙ্কের পেপার আউট করে ব্যবসা জমাতে হত।

—তা-ও হয় নাকি!

—হয়ই তো। খুব হয়। শুনুন তাহলে বলি। কী মানসিকতা দেখুন। আমাদের আর একজন বয়স্ক টিচার আছেন, প্লেন বি এস সি। কিন্তু অঙ্ক পড়ান। ভালই। তো, ওর টিউশানি-ক্লাশ আর একটা স্কুল। হ্যাদাম্যাদা সব ছাত্রছাত্রী ওখানে জোটে। পরীক্ষার আগে সবাইকে উনি লাস্ট-মিনিট সাজেশন দিয়ে দেন। অর্থাৎ প্রশ্নপত্রটাই বলে দেন। তা উনি যা করেন তা করেন। অরুণবাবু হঠাৎ আমাকে গত বৎসর অ্যানুয়াল এগ্‌জামের আগে শুধালেন, ফরহাদ কোশ্চেন কেমন হবে? ক্লাশ নাইনের পাটিগণিত থাট্টিনথ্ লেসন থেকে দিয়েছ নাকি, ওটা একটু হেভি হয়ে যায়। বললাম, আপনি কি কোশ্চেন জানতে চাইছেন? উনি একগাল হেসে বললেন, আ রে না না। তবে মেয়েটা আমাকে জ্বালাচ্ছে খুব। খুব ডাল, বুঝলে! কে? আমি প্রশ্ন করি। অরুণবাবু আমারও স্যর। বললেন, আর বোলো না, ওই তোমার অ্যাসিসট্যান্টের মেয়ে, প্রণতি। তোমার কাছে যাবে, একটু সাজেশন দিও। কী অবলীলায় বললেন স্যর। পরে দেখলাম, উনি আমার উপর কায়দা করে চাপ দিচ্ছেন। প্রণতি পাশ না করলে অ্যাসিসট্যান্টের অর্থাৎ সহকারী হেডমাস্টারের সামনে অরুণ ভট্টাচার্য্যির আর মুখ থাকে না। প্রণতি অরুণবাবুর টিউশনের ছাত্রী।

একনাগাড়ে ঘটনা বলে যেতে যেতে দম নেয় ফরহাদ।

বাবাও সহাস্য মুখে বললেন—তাহলে অভিজ্ঞতা হচ্ছে বল!

ফরহাদ বলল—অভিজ্ঞতা কী বলছেন!

BanglaBook.org

আমি দু'হাতে দু'টি ভর্তি চায়ের কাপ, বাষ্প উঠছে, পা টিপে টিপে ওদের মাঝে ঢুকে টেবিলে রাখি। ফরহাদ তখন কথারই মধ্যে ডুবে আছে, খালি আমাকে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে দেখে নিয়ে বলল— রেখে দে। শোন্ এক গেলাশ পানি দিবি তো! তো, এই লোকটা একটা কষাই।

—কে?

—এই আমার স্যর অরুণ ভটচায। বলে বোঝাতে পারা যাবে না, টিউশনের লালসা একটা লোককে কোথায় নামিয়ে দেয়। আমি যখন ছাত্র, তখন একমাস ওঁর কাছে প্রাইভেট টিউশনের ছাত্র হই, আমি তো মাদ্রাসায় পড়েছি। তখন মানুষটাকে এত খারাপ দেখিনি। গরিব গ্রাম। অনেকে অত্যন্ত কষ্টেসৃস্টে টিউশনের টাকা জোগাড় করে। একটা ছেলে। বাপ ক্ষেতমজুর। বাপের রোখ খুব। আমার বাবার যেমন ছিল। ছেলেকে মানুষ করতেই হবে। ভট্টাচায্যির কাছে টিউশন দিয়েছে। মুরগির ডিম বেচা পয়সা দেয় মা, তাই এনে স্যরকে দেয় ছেলেটা। একমাস সে আর ওই টাকা জোগাড় করতে পারল না। পরে ওই বকুলের মুখে শুনেছি, পায়খানা রোগ ধরে ওদের সব মুরগি মারা গেছে। তাই ও দিতে পারছে না। কিন্তু সেদিন ও নতুন জুতো পরে এসেছিল ভট্টাচায্যির কাছে।

বাবা জুতোর প্রসঙ্গ শুনে একটু নড়ে বসলেন। আমি অবাক হয়ে ফরহাদের মুখের দিকে চাইলাম।

ফরহাদ পানসে হেসে বলল—এই জুতো এক অভিজ্ঞতা মামা!

—নতুন জুতো?

—হ্যাঁ। একটু দামি দ্রব্য। কখনও পরেনি ছেলেটা। ওর বড়লোক মাসি ঈদে উপহার দিয়েছে। হঠাৎ ওর পায়ে চোখ পড়তেই স্যর অরুণ ভট্টাচার্য ক্ষেপে গেছেন মনে মনে। চাপা গলায় বললেন, কই এনেছিস?

চরম বিস্ময় হচ্ছিল আমার। জল এগিয়ে দিলাম ফরহাদকে। এক নিঃশ্বাসে জল শুষে খেয়ে গেলাশ ফেরত দিয়ে হাতের উল্টো পিঠে মুখ মুছে দৃষ্টি ঈষৎ তীক্ষ্ণ করে বলল—বকুল বললে, আনতে পারিনি স্যর!

তারপরই ভট্টাচায্যি নিজের নাকের ছিদ্রের লোম আঙুলে টেনে ছিঁড়লেন, নাকের ফুটো অসহ্যভাবে স্ফীত করে বললেন—তাহলে এই নতুন জুতো কোথায় পেলি! ন্যাকামো হচ্ছে! খোল্, জুতো খোল! ওই জুতো আমি বিক্রি করব।

—জুতো বিক্রি করবে! আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠি। বলি— কোথায় বিক্রি করবে? কেন?

—ওহ্ লীনা। তুই কেন প্রশ্ন করছিস! আগে শোন্ না।

—বল! ভট্টাচায্যি তাহলে অন্য কোনও বড়লোক ছাত্রের কাছে ওই জুতো বিক্রি করে দিলেন। বলে ওঠেন বাবা।

ফরহাদ বলল— না। বকুল যখন ধমক খেয়ে পায়ের জুতো খুলতে শুরু করেছে, হঠাৎ কী মনে করে ভট্টাচায্যি গলা নরম করলেন একটু। বললেন, থাক। আর খুলতে হবে না। ওই জুতো বেচে টাকা আনবে, না হলে এসো না।

ফরহাদের চোখ কেমন ছলছল করে উঠল। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একটু একটু পায়চারি করল মেঝেয়। তারপর চেয়ারের কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। এক মিনিট দম ধরে থেকে সহসা বলে উঠল—বকুল পরের দিন টিউশানি ক্লাশে এল। খালি পা। টাকা এগিয়ে দিল স্যরের সমুখে। আর আশ্চর্য, উনি তা নিলেন।

BanglaBook.org

তাঁর একটু দ্বিধা হল না। লজ্জা করল না। কোনও প্রশ্ন পর্যন্ত করলেন না।

—তারপর ? বাবা বলে ওঠেন।

ফরহাদ বলল— টাকা যখন এগিয়ে দিচ্ছে বকুল, হঠাৎ পিছনে হাইবেঞ্চের পায়ায় একটা ঠকঠক করে শব্দ হচ্ছে। একবার পিছনে চেয়ে দেখল বকুল আনসারি। জোলার ছেলে মামা ! দেখল, তারই ক্লাশের বন্ধু তীর্থঙ্কর, ওর জুতো জোড়া পালিশ করে পরেছে, মোজাও পরেছে সঙ্গে। সেই জুতো দিয়ে টো মারছে পায়ায়, তারই শব্দ হচ্ছে তখন। ছাত্ররা আমায় বলেছে, ভট্টাচায্যি সবই লক্ষ করলেন। তারপর টাকা হাতে নিয়ে চোখ বুজলেন। একবার খালি চোখ বন্ধ করে বললেন, শব্দ ক'রো না তীর্থঙ্কর।

এবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফরহাদ। চোখ দু'টি কেমন খানিকক্ষণ সরু করে রইল। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক রইল ওইভাবে। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে একখানা কাগজের বড় টুকরো বার করল সযত্নে। বাবার সামনে টেবিলে মেলে ধরে বলল—এই হল বকুলের পায়ের ছাপ। আমার গাঁয়েরই ছেলে।

—কী করবে এই ছাপ ! এ যে রবীন্দ্রনাথের কাবুলিঅলার মতো হল !

—হ্যাঁ হল। কী করব ! শহরে যাচ্ছি, জুতো কিনে আনব। এখানে গঞ্জের দোকানে পাওয়া যাবে না। বকুল ভাল ছাত্র। ঠিক সেই জুতোই আমি কিনতে চাই। ও যেরকম বিক্রি করেছে তীর্থঙ্করের কাছে।

—তুমি পারও বটে !

—না। এ আমার জেদ। এ আমারই অপমান মামা !

—তুমি সত্যিই শহর যাচ্ছ নাকি ?

—এতক্ষণ তাহলে বলছি কি আপনাকে ? পায়ের ছাপ নিলাম কেন ? আর বকুলকে বলেছি, আমিই তোকে অঙ্ক করাবো। সেম সেম জুতো চাই আমার। সেম সেম। বলতে বলতে পায়ের ছাপঅলা কাগজ পকেটে পুরে ফেলল ফরহাদ। ও চলে যেতেই বাবা আমার মুখের দিকে চাইলেন।

বললেন—চা-টা-ও ভাল করে খেল না। খুবই উত্তেজিত হয়ে আছে। পকেটে করে এখন জুতো বয়ে আনবে। সব করবে। একবার লেগেছে যখন, ছাড়বে না। এই জন্যেই ওকে আমি পাগল বলি। অবশ্য এই রকম টেম্পারামেন্টের ছেলেরাই আমার দলে ছিল একদিন। নিজের সম্পর্কে অসাবধানী উদাসীন। চাষী সম্পর্কে, ক্ষেতমজুর সম্পর্কে, একটু বেশি ইমোশনাল।

বকুলের অসম্মান আর ফরহাদের অসম্মান যে একাকার আজ আকাশলীনা সেকথা জানে। স্পষ্ট সেকথা মুখে উচ্চারণও করেছে ফরহাদ। বকুল আনসারি আর ফরহাদ আনসারি সমগোত্র জীব। এরা জোলা ছোট জাত। 'জুতো এক অভিজ্ঞতা মামা !' একথা মনে পড়ে কতবার।

রুদ্র হঠাৎ এভাবে বার হয়ে যাওয়ায় মা আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। বাবার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন—কী হবে এখন ?

আমি মন্তব্য করলাম—ও মুস্তাফাকে কিছু বলে যায়নি। মুস্তাফা শুধিয়েছিল, কথাই বলেনি।

—দেখেছ ! মা আরও উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।

দাদিমা ফজরের নামাজ শেষ করে উপরে উঠে এসে বললেন—আমি মুস্তাফাকে পাঠিয়েছি বউ মা !

বাবা বললেন—সাইকেল নিয়ে গেছে যখন গাঁয়েরই কোথাও গেছে। ও একা

BanglaBook.org

কলকাতার হস্টেলে থাকে।

মা বললেন—একা থাকে না। ক্লাশমেট, বন্ধু সবাই মিলে থাকে। একা থাকে বলছ কেন ?

বাবা উত্তর দিলেন—আমরা তো ওকে পাহারা দিয়ে রাখতে পারব না। উপায়ও নেই। ওকে এই গ্রামটা চিনে নিতে দাও।

—না। ও চিনবে না। ওর চেনার দরকার নেই। মা সামান্য ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

—তোমার ছেলেমেয়ে গ্রাম চিনবে না ? বাবা বিস্ময় প্রকাশ করেন।

—না।

—কেন ?

—আমি সেভাবে ওদের মানুষ করিনি। ওরা যা হয়েছে, ওরা তা হত না। ওদের হতে দাও।

—কেরিয়ার ছাড়া ওরা কিছু বুঝবে না ?

—না। দেশ, সমাজ, ভারতবর্ষ ওদের বোঝার দরকার নেই। গ্রাম তো নয়ই।

—মাটিতে ওদের পা পড়বে না ?

—না। ওদের পায়ের তলায় থাকবে পিচের প্রশস্ত রাস্তা। রাজপথ।

এই একটা রাতেই মা যেন অসম্ভব বদলে গিয়েছেন। মাকে চেনাই যাচ্ছে না। বাবরির কাঠামো ধূলিসাৎ হওয়া এবং জহির বিশ্বাসের আবির্ভাব কি মায়ের অপরিজ্ঞাত আন্তর-কাঠামোকে ভেঙে চূর্ণ করে অন্যরকম করে দিয়েছে ? অথবা মায়ের পরিবর্তন এক রাত্রির ঘটনা নয় ! তা বাবার বিশ বছরের জেল-জীবনের বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতা, অনুপস্থিতি, মায়ের একাকিত্ব এবং অস্তিত্বের অতলে ক্রমপরিবর্তনশীলতার পরিণাম ?

বাবা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। চূড়ান্ত বধির এক বিস্ময় তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছিল।

বাবা অত্যন্ত শীতল এবং খাদের গলায় বললেন—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না স্বর্ণদীপা ! মাটি ছাড়া মানুষ হয়, এ তো আমি ভাবিনি।

মা বললেন—কলকাতার মেয়ে আমি। বাবা চাকরি জীবনে যাদবপুরে ছিলেন, আমরা ছেলেবেলায় যাদবপুরে শেয়ালের ডাক শুনেছি। মনে হত, যাদবপুর গ্রাম বইকি। তোমার একটা অদ্ভুত ধারণা, গ্রাম ছাড়া কোথাও মাটি নেই।

—না। আমি তা কখনও বলি না স্বর্ণদীপা। শহরের ছেলেমেয়েরাই তো বিপ্লবের স্বার্থে গ্রামে এসে প্রাণ দিয়ে গেছে। তোমার নিজের ভাই, শিশির এই গ্রামেই পুলিশের গুলিতে মরেছে, তার অস্তিত্ব কোথায় শেষ হয়ে গেল, তোমরা জানতেও পারনি। কত এমন হয়েছে দীপা ! এসবই মানুষের প্রতি ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই নয়, আমি বলছি, আমার সন্তানের ভালবাসাও থাকবে না ! ভালবাসাই তো মৃত্তিকা স্বর্ণদীপা ! আমার সন্তান স্বার্থপর হবে ?

—তুমি তোমার ভালবাসার আর কত দাম চাইছ আমার কাছে ? আর কত ? কী নিয়ে আছি, তুমি জানো না ? তুমি তো একটা ছায়া মাত্র, রক্তমাংসের কেউ নও। যার মুখ চেয়ে একদিন ঘর ছেড়েছিলাম তাকে তো আমি পাইনি, মেয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আমি যা পাইনি, ও তা পাবে। ও সম্পূর্ণ ভোগ করবে এই দুনিয়াকে। দুনিয়া তোমার মনের মতন বদলায়নি ইমাম সাহেব। কিন্তু বিশ বছরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তুমি রাশিয়া বা চীন কারও দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলতে পার না, ওখানে সত্য আছে, ওখানে সব আছে। নেই।

মায়ের কথা শুনতে শুনতে বাবা হেসে ফেললেন। কী বলবেন ভেবে না পেয়ে বিস্ময়-ব্যথিত স্বরে শক্ত করে উচ্চারণ করলেন—ভোগ !

—হ্যাঁ, ভোগ !

—শোন স্বর্ণদীপা। ভোগের একটা দিক শরীর আর একটা দিক উপলব্ধি। ভোগ তো ভোগবাদীরা করে, কিন্তু তারা ওই ভোগটাকে উপলব্ধি করতে পারে না।

—কী করে বুঝব ! ভোগ তো করিনি কখনও। ছেলেমেয়েকে অনেক দিন ভাল করে খেতে দিতেই পারিনি। শুধু তাড়া খেয়ে ফিরেছি, এই মেয়ে বুকের তলায় পড়ে পড়ে কেঁদেছে, বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে। একবার পুলিশ আসছে শুনে এই বাড়ি ছেড়ে পালালাম। অনন্তবাবুই পুলিশের খবর আনে। সঙ্গে সঙ্গে ওরই সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হল। অনন্তবাবু কোথায় আমাকে নিয়ে যাচ্ছে জানি না। এক রেলস্টেশনে পড়ে থাকতে হল সারারাত। অচেনা জায়গা। মেয়ে কাঁদে। অনন্তবাবু বলল, মেয়েকে চুপ করান বউদি, পুলিশ আছে। কান্না শুনে ছুটে আসবে, আমাকে তো চেনে। বুকে দুধ নেই, অনন্তবাবু জলের কল থেকে রুমাল ভিজিয়ে এনে মুখে ধরে। মেয়ে চেটে চেটে খায় আর কাঁদে। ওই মেয়েকে বোঝাও, ও কেমন ভোগ করেছে পৃথিবীকে। এই মেয়ে, তোর মনে আছে ?

আমি শিশুরই মতন অবোধ বিস্ময়ে মাথা নাড়তে থাকি। বাবা আমার মুখে শান্তভাবে চাইলেন। তারপর বললেন—তোদের আমি বঞ্চিত করেছি আকাশলীনা। এত দূর বঞ্চিত করেছি যে, আমি যে বাবা তা-ও তোর মা তোকে বলে না দিলে মিথ্যা হয়ে যেতাম। আমি রক্তমাংসের পিতা তো নই। আইডিয়া মাত্র। আমি একটা সংকল্পের ব্যর্থ ছায়া বই তো নই। তবু বলছি, মানুষ যাদের করেছ স্বর্ণদীপা, তাদের মানুষের কাছে যেতে দিও। যাও, আকাশ। যেখান থেকে পার দাদাকে খুঁজে এসো। তোমার সাইকেল আছে। লেডিজ সাইকেল। নেই ?

মা আমার সামনে এক চরম বাস্তবতা, বাবা এক কল্প-সমুদ্র। হাত-আয়নাকে বলি, হে গোলাকৃতি ক্ষুদ্র কাঁচ, তুমি কি আমার উপমা বুঝতে পারছ ? বাবা আমার সম্মুখে রয়েছেন, যখনই এই গ্রামে এসে থাকেন, বস্তুত তাঁর এখনকার কাজ আমরা বুঝতেও পারি না, কলকাতায় কোথায় থাকেন, জানি না—তবু যখন সম্মুখে দেখি, বাবাকে কল্পনা করে নিতে হয়। বাস্তব মনে হয় না।

মা চরম বাস্তব বলেই বাবা যখন আমাকে রুদ্রর খোঁজে সাইকেল নিয়ে যেতে বললেন, মায়ের অনুমতির জন্য চোখ দুটি মায়েরই চোখে চেয়ে রইল। প্রার্থনায়।

—তুমি ওকেও যেতে বলছ তাহলে ? কোথায় যাবে ও ? পথঘাট চেনে ও ? কখনও গেছে কোথাও ? না, ও যাবে না।

—ওকে যেতে দাও স্বর্ণদীপা, আমি বলছি ও যাক। ও জেনে আসুক, কোথাও কিছু ঘটেছে কিনা। গত বছর দুই আগে, যখন কাটরায় নামাজ পড়া নিয়ে একদল নামাজি খুন হয়ে গেল। সেটা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা কি না, প্রকৃত অবস্থার সরেজমিন তদন্তের জন্য কলকাতা থেকে একদল শিক্ষিত ছেলেমেয়ে স্বেচ্ছায় উদ্যোগ নেয় এবং তারা লালবাগ কাশিমবাজার বহরমপুর ঘুরে গিয়ে রিপোর্ট তৈরি করে। তারপর তারা সেই রিপোর্ট চাঁদা তুলে এবং নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচা করে ছেপে বিনামূল্যে বিতরণ করেছে। আমি সেই ছাপানো পুস্তিকা পড়েছি।

—তাতে লাভ কী হয়েছে ?

—লাভ হয়েছে এটাই যে, খবরের কাগজ যে সংবাদ ছাপার যোগ্য মনে করেনি, ওই

BanglaBook.org

ছেলেমেয়েদের কাছে তার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। রাত্রে গুলির আওয়াজ হল কেন, কী ঘটেছে আমরা জানব না ?

—একটু অপেক্ষা কর, ফরহাদ হাঁইফাঁই করে ছুটে এসে সব তোমায় জানিয়ে যাচ্ছে। তোমার লোক তো আছে।

—ফরহাদ হাঁইফাঁই করার ছেলে। এই হাইফাই শব্দটা তোমার মুখে লোকাল ডাইলেক্ট হয়েছে নাকি ?

—আমার কি আর অশিক্ষার কিছু বাকি আছে ভাবো !

—আর যাই কর স্বর্ণদীপা, ছেলেমেয়েকে মানুষ সম্বন্ধে অবজ্ঞা করতে শেখাবে না। যাও আকাশলীনা ! তুমি দেরি কোরো না।

—তুমি একটা কথা শুনে রাখো ইমামসাহেব ! এই গ্রাম তোমার সত্তর-ষাটের দশকের সরলসিধা মুক্তিকামী গ্রাম নয়। প্রতিটি গাঁয়ে বিড়ি বাঁধে মেয়েরা আর পুরুষরা বোমা বাঁধে। দুটিই কুটির-শিল্প এখন। সীমান্ত এলাকার গঞ্জগুলিতে চোরাকারবার চলে অবাধে। মেয়ে পাচার হয় ওই সড়ক দিয়ে। গরু চালান যায় বাংলাদেশে। গোমাংসের বাংলাদেশী ব্যবসা কুয়েত পর্যন্ত গেছে কি না জানি না, তবে কুয়েতের সব্জির হাটে বাংলাদেশের সবুজ ফসল ভরে যায়, হংকং হয়ে কাপড় চালান আসে। তাকে এখানকার ভাষায় গুধড়ি বলে। কার্তুজ আসে। এই দিগরে তার নাম বিচি। তুমি জানো না।

—না। বাবা ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে থাকেন।

আমি বার হয়ে আসি। আমার কলেজে ভর্তি হওয়ার কিছু আগে থেকে এই গ্রাম দ্রুত বদলে যেতে থাকে। গ্রামের পরিবর্তনের চাকাটি আর গরুরগাড়ির চাকার সঙ্গে বাঁধা ছিল না। তা যেন জাপানি রেলগাড়ির মতন চলতে শুরু করে এক বিপুলাকার সুড়ঙ্গ-প্রান্তের গহ্বরের দিকে। হিন্দি সিনেমার বাণিজ্যিক পর্দা যত দ্রুত হিংসাত্মক হয়ে উঠতে থাকে, তারও চেয়ে দ্রুততর গ্রাম হিংসাশ্রয়ী হয়ে যায়।

আমার সাইকেলের চাকায় শিশির এবং শীত। কাদায় জড়িয়ে যাওয়া তাল। তারপর মোরামের লাল সুরকির ধূলা। কাদার রঙ এক্ষণে লাল অথবা হলুদ। বিদ্যুতের খাম্বায় নদীদেশবর্তী নীল মাছরাঙা, কালো ফিঙে। আকাশ নীলিম এবং স্বর্ণরেণু মাখানো, কিরণে চাঁপাপুষ্প মদিরতা। এ সবই প্রাচীন, এ সবই বিভূতিভূষণের দুর্গার ডাগর চোখে ধরা ছিল, এখনও কাশফুল স্থির, এখনও পথে কুকশিমার গন্ধ, এখনও গাঁদাল বনে হলুদ পাপড়িতে শিশির পড়ে আছে। এ সবই মুখ্যত গ্রামের চালাকি ! গ্রাম নয়।

স্বরূপগঞ্জে একটি সিনেমা হল থাকলেও, দুটি ভিডিও হল গড়ে উঠেছে। ভিডিও হলে অধিক রাত্রে হার্ড ব্লু ফিল্ম দেখানো হয়। এখানে যারা গুধড়ির ব্যবসার মহাজন, তাদেরই দু'জন এই ব্যবসা খুলেছে, আগে এরা পাট এবং রবিখন্দের মজুতদারি ব্যবসা করত। তা ছাড়া এরা পার্টটাইম রাজনীতি করে। থানা এবং পার্টিঅফিসে মান্থলি মিট দেয়। অর্থাৎ মাসিক চাঁদা দেয় মোটা টাকার।

একজনের নাম খলিল ঘরামি। একে একদিন আমার স্কুলের এক বন্ধু চিনিয়ে দিয়েছিল। এ মুহূর্তে লোকটা চায়ের দোকানে বেঞ্চে বসে থাইয়ের ত্বক উদোম করে লুঙ্গি কোমরে জড়ো করেছে, দু'পায়ের ফাঁকে গুঁজে শুঁক শুঁক করে চা খাচ্ছে, চোখ দুটি রাঙা এবং বাইরে ঠেলে উঠেছে কী একটা দম্ভে।

এক সপ্তাহ আগে ঘরামির ভিডিও হলে ব্লু সিনেমার উত্তেজক দৃশ্য দেখে তিনজন মস্তান একটি গুধড়ির মেয়েকে নদীর ওপারের চরে উঠিয়ে নিয়ে যায়। কৃষ্ণনগরের মেয়েটার নাম সীমা। স্বামী পরিত্যক্তা এবং ওই খলিলের রক্ষিতা শোনা যায়। খলিল

ঘরামির আড্ডারে মস্তানরা থাকে, থানার সঙ্গে মধ্যস্থতা তারই। খলিলের গুধড়ির ব্যবসা ইদানীং পড়তির দিকে, বাংলাদেশ বর্ডার থেকে মাল আসা কমে গিয়েছে। যা যতটুকু আসে সীমাকেই দেয়। ক্রমশ সীমা বুঝতে পারছিল, এই ব্যবসার দিন এ সীমান্তে খতম হয়ে আসছে। ওকে সম্প্রতি ভিডিও হলের গেটে লম্বা টুলে বসে থাকতে দেখা যেত। ও টিকিট চেক করত।

গুধড়ি চালান দিতে দল বেঁধে কলকাতার মল্লিক বাজারে যেত সীমা, বিহারী মহাজনের কাছে। গুধড়ির ব্যবসা নারী দেহভিত্তিক ব্যবসা। সীমার সৌন্দর্য ছিল এবং দেহে ছিল অটুট তীব্র স্বাস্থ্য।

সেদিন রাত্রে মস্তানরা ওকে নৌকো করে চরের ঘাটে ওপারে নিয়ে যায়। ধর্ষণ করে এবং গলা টিপে শেষ করে দেয়। দেখা গেল, থানা ডেডবডি তুলে নিয়ে গেছে, কিন্তু কাউকে অ্যারেস্ট করেনি। এই ঘটনায় খলিল কেন নির্বিকার রইল বোঝা যায় না।

গঙ্গাপ্রসাদের ওদিকে জঙ্গলের মধ্যে বন্দুকের কারখানা বসেছে। মুঙ্গের থেকে একটা বিহারী পরিবার এসেছে, তারা বন্দুক তৈরি এবং বোমা বাঁধার ট্রেনিং চালু করেছে।

মস্তান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিসে বোমা ও বন্দুক থাকে। মুঙ্গেরি-মাস্কেট থাকে। এরা বাম ঐক্য ধ্বনিত করে স্লোগানে এবং কোনও দল বন্দেমাতরম ধ্বনি দেয়। তারপর তারা শাঁসালো গেরস্তের আঙিনায় উপস্থিত হয়ে মাস্কেট কেনার জন্য অর্থ দাবি করে। গরুর পাল দড়ি খুলে নিয়ে চলে যায়।

আগে বাম দলগুলি জঙ্গি আন্দোলনে হাতের অস্ত্র প্রদর্শন করত। বেনাম জমি, সিলিং বহির্ভূত অথবা পতিত জমি উদ্ধার কিংবা জোতদারের জমির ধান কাটার সময় অস্ত্র ধারণ করত। বাবা বলেছেন, এগুলি ছিল প্রদর্শনী। গলায় লাল রুমাল বাঁধাটাও ছিল টু এগজিবিট দ্য মুভমেন্ট।

লক্ষ করতে হবে, মস্তানদের হাতে প্রয়োগের জন্য যে অস্ত্র উঠে এসেছে, তা আরও বলশালী। এবং আদি অস্ত্র যাকে বলে তা নয়। হেঁসো, তরোয়াল, গুপ্তি বা বল্লম অথবা তীর ধনুক নয়। সবই আধুনিক অস্ত্র। গ্রামের পরিবর্তন বলতে বোঝায় বিপ্লবকামী, ভীরু, হতমান নিরস্ত্র মানুষের নীরবতা, কিন্তু মস্তানের হাতে ব্যবহৃত বা ব্যবহারযোগ্য অস্ত্রের উন্নতি। মানুষের নীরবতার মধ্যেও একটি কামনা যোগ করা হয়েছে। ওটা ভুল। মানুষ নিষ্ক্রিয়, প্রতিবাদবিমুখ এবং ভীত। গ্রাম বলতে বোঝায় অকাট্য প্রগাঢ় নীরবতা। অসহ্য মূক মনুষ্যপুঞ্জ।

মাঝে মাঝে গ্রাম বিস্ফোরিত হয়। যেমন গত রাতে হয়েছে। গত পরশুও হয়েছে। ফরহাদ খবর এনেছিল। শাদিখাঁর দিয়াড়ে এক পাড়ার কুটিরে তখন সন্ধ্যা। বউ সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে দিতে শুনতে পায় পুলিশ আসছে থানা থেকে। মাত্র ছ'মাস আগে নতুন বউ এসেছে ঘরে। স্বামী ক্যাডার ওরফে মস্তান। বাড়িতে বোমা আছে। বউ সেগুলি আঁকুপাঁকু করে সামলাতে চেষ্টা করে। লুকিয়ে ফেলার জন্য বালতিতে ভর্তি করে নেয় বোমা, যেন সে আনাজ তুলছে উঠোন থেকে। বালতি সহসা বিস্ফোরিত হতে পারে বউ জানে না। রাঙা টুকটুকে বউ। আলতা পরা, মেহেদি রঙা বউ, সুগন্ধ মাখা, হিমানি ঘষা বধূটি। ঝলমল করা, টলটল করা বউরানী। একেবারে রাজার বেটি নথনড়ানো, বাজুবাঁধা, বিছের রুপোয় কোমর দোলানি মেয়ে, কোমরে ত্বকের গোত্তা, পায়ে নূপুরের ঝিনিক, বউ বড় ব্যস্ত হয়ে উঠল। তার স্বামী হল মাস্কেটিয়ার কমান্ডার, পঞ্চায়েতের তরণীতে মাল্লা, ভূস্বর্গ গ্রামরজনীর পালাদার, থানায় থানায় তার ডাক পড়ে, সে কিনা এল সি-র মেম্বার।

BanglaBook.org

বোমা বিক্ষত বধূ সেই সন্ধ্যায় পুড়ে গেল। মরে গেল। সমস্ত গা ঝলসে কালো হল, পোড়া বাঁশপাতার মতো সুন্দরীর ত্বক, উদ্ধত বুক দুটি হল বীভৎস করুণা, ও চাওয়া যায় না মা। ও সহ্য হয় না—দেখি, খলিল ঘরামি আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

লোকটা এবার আমাকে হাতের ইশারায় ডাক দেয়। আমি মনে মনে সাহস সঞ্চয় করেও দেখি আমার ভয় করছে। সাইকেল গড়াতে গড়াতে লোকটার কাছে যাই।

ঘরামি চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা চায়ের দোকানের স্থূল ছোট ভাঁটাসদৃশ উনুনের গায়ের নীচে একটি কুকুরের লেজের কাছে রাখে। তারপর গা তুলে রুমালে মুখ মুছে বলে—কোথায় যাও এই বিহানে মা!

বললাম—বিলাসপুর।

—সর্বনাশ! বিলাসপুর ভাল নাই, রাতে শেখর আনসারি জখম হয়েছে, আশা হচ্ছে হসপিটালে লাশ আসবে। বাঁচা মরা খোদার হাত। যেও না বিটি। যেও না। ইদিকে দ্যাখো, হাসপাতালে দ্যাখো। ফরহাদ মাস্টারকেও দেখতে পাবে। যাও। আমি আসছি। থানার বড়বাবু স্পটে গেছে, আমি তারই অপেক্ষায় আছি। লোকাল এম. এল. এ. আসবে। ক্যাডার আসবে। কেমন?

—আজ্ঞে!

—হ্যাঁ মা! সাঁঝে ধ্বংস বাবরি, রাতে ধ্বংস আনসারি—একই নিশিতে নিল দুইটাকে! দেশে সুব্যবস্থা থাকলে ভারবোল বাঁধত সুখচরের বেলাত মুন্সী। কেমন?

আমার শরীর কেমন কাঁপতে লাগল। ধীরে ধীরে গ্রামীণ হাসপাতালের দিকে সাইকেল গড়াতে থাকি। বাবা আমাকে মানুষের কাছে যেতে বলেছেন। 'মানুষ যাদের করেছ স্বর্ণদীপা, তাদের মানুষের কাছে যেতে দিও।' এই কথাই তো বলেছেন বাবা।

আমি এখন কার কাছে যাব? এই শেখর আনসারি ফরহাদের কে? ফরহাদকে হাসপাতালে দেখতে পাব। লাশ সঙ্গে করে আসবে সে বেচারি। কেন? গ্রামের ঘটনা বলে? নাকি শেখর তার কেউ? বাবা! তুমি কোথায় পাঠালে আমাকে? কোন্ দৃশ্যের সম্মুখে যাব আমি? কী দেখব সেখানে?

হাসপাতালে এসে চত্বরের গেটের সামনে কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। কোনও কিছু চোখে পড়ে না। ঝাঁটা এবং বালতি হাতে একজন জমাদার হাসপাতালের মেঝে ধুয়ে চলেছে এবং জলের উপর ঝাঁটা চালিয়ে সাফ করছে আপন মনে। সাদা পোশাক-পরা একটি ফর্সা নার্স ঢুকে গেল। আমাকে দেখেও দেখল না।

আধ ঘণ্টা ধরে একঠাঁই দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখি, কোয়ার্টার্স থেকে একজন ডাক্তার কলবুকে সই করে পাঠালেন। দশ মিনিট বাদে তাঁকে হেঁটে আসতে দেখা গেল। সামনে এগিয়ে যেতেই তিনি ঘাড় বাঁকিয়ে আমার দিকে চাইলেন। প্রশ্ন করলেন—কী হয়েছে?

—আজ্ঞে! বিলাসপুরের শেখর আনসারি! এ নামে কোনও লোক হাসপাতালে এসেছে, মানে ডেডবডি...

—না। ডেডবডি আসবে না। বলেই ডাক্তারবাবু দ্রুত পা ফেলে হাসপাতালের চত্বর পেরিয়ে ভিতরের দিকে চলে গেলেন।

আমি আর দাঁড়িয়ে না থেকে বিলাসপুর রওনা দিই। পুব আকাশে থালার মতন লাল সূর্যটা ক্রমশ ইস্পাতের মতন হয়ে উঠেছে। কিন্তু তত তেজ নেই। আমার গায়ে সোয়েটার আছে, সালোয়ার কামিজ পরেছি। ভালই শীত পড়েছে, পথ ভেজা ভেজা, শিশিরে ধূলা ভারী। এখন মোরাম শেষ হয়ে ধুলাবালির চিকন পথে সাইকেল চলেছে আমার।

BanglaBook.org

সামনে চেয়ে দেখি রুদ্র ফিরে আসছে। আমার ধারণা ঠিক ছিল। রুদ্র বিলাসপুরই গিয়েছিল।

—তুই কোথায় যাবি ? বলে সাইকেল থেকে নামল রুদ্র। আমাকেও নেমে পড়তে হল। খুব কাছে সরে এসে এক হাত বাড়িয়ে রুদ্র আমার সাইকেলের হ্যান্ডেল শক্ত করে চেপে ধরে বলল—শোন্, তোকে আর যেতে হবে না।

—ফরহাদদা...

—বলছি তোকে সব, চল !

—না। আমি স্বচক্ষে একবার দেখব'। এতদূর এসেছি, আমাকে যেতে দে, আটকাস না।

—দেখার কিছু নেই লীনা ! খালি একটা কবর। ফরহাদদা বসে আছে। কথা বলছে না।

—কথা বলছে না কেন ?

—বোধহয় বলতে পারছে না। তা ছাড়া বলার তো কিছু নেই। জোর করে গোয়াল থেকে গরু খুলে নিয়ে চলে যাবে ওরা, এটা রেওয়াজ হয়েছে। প্রথমে মাস্কেট কিনবে বলে টাকা চায়। মোটা টাকা।

—ওরা ?

—মাস্কেটবাহিনী। কিন্তু চাষীর হাতে তো অত টাকা থাকে না। শোন্, তুই যাস না। ফরহাদদার মা নেই জানিস। বছর দুই আগে আত্রিকে মারা গিয়েছে। তখন ফরহাদদা কলকাতায় এম. এসসি পড়ছে। খবর পেয়ে ছুটে এসে মায়ের কবর ছাড়া কিছুই দেখতে পায়নি। আমরা কিছুই জানতাম না। ও বলেওনি। অবশ্য সেই সময় আমাদের সঙ্গে দেখাও হত না। কখন এসে মায়ের কবর দেখে ফিরে গেছে টেরও পাইনি আমরা।

এ কথা বলে রুদ্র অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সহসা ওর চোখদুটি ঈষৎ ছলছল করে উঠল।

আমি গম্ভীর গলায় বলে উঠি—আমি যাচ্ছি রুদ্র।

রুদ্র আবার বলে উঠল—একজন মানুষ, যে কি না আমাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। বাবা ছাড়া এই গ্রামে যার কোনও বন্ধু নেই। আমরা দুই ভাইবোন যার কাছে লেখাপড়া করেছি, তার কোনও কিছুই আমরা জানি না। নিজেকে খুবই স্বার্থপর মনে হচ্ছিল লীনা।

—আমি যাচ্ছি।

—বাড়িতে মা নেই। আছে এক বিধবা দিদি। মায়ের মৃত্যুর ছ'মাস পর দিদি বিধবা হয়ে বাপের ভিটেয় চলে আসে। সঙ্গে দু' বছরের শিশুকন্যা। স্বামী ক্ষেতমজুরি করত। মাটির দেওয়াল চাপা পড়ে মরেছে, ঘরামির কাজ করতে করতে। এত বড় ভয়ঙ্কর ঘটনা, আমরা জানি না। শুনতাম, মাঝে মাঝে ফরহাদদা তার দিদির হাতের রান্নার খুব প্রশংসা করছে।

—হ্যাঁ। আমাকে ছেড়ে দে রুদ্র ! সকাতরে বলে উঠি আমি। আমার সাইকেলের হ্যান্ডেল চেপে ধরে থাকা রুদ্রর হাতের আঙুল আমি ছাড়িয়ে নিজেকে মুক্ত করতে চাই। ও অমন করে চেপে ধরে আছে কেন ? ও তার সমস্ত কষ্টের ভার আমার উপর চাপাতে চাইছে কেন ? সাঁতার না জানা ডুবে যেতে থাকা মানুষের মতো করছে কেন ? ওর আর আমার পাশাপাশি বিপরীতমুখী দাঁড়ানো সাইকেলে ঘষা লেগে একটি বেল বেজে ওঠে। আমার হৃদয় চমকে ওঠে।

—কোনও মানে হয় ! ছেড়ে দে আমাকে ! অমন কেন করছিস ? আঙুল ধরে ছাড়াতে

BanglaBook.org

চেষ্টা করি বারবার। আমার গলায় প্রার্থনা এবং আকুতি চারিয়ে যেতে থাকে।

রুদ্র কিঞ্চিৎ পাগলের মতো বলে উঠল—আমরা কিছুই জানি না লীনা! জানি না, শেখর একজন মুসলমান জোলা। বর্ধমানের এক মৌলবী তার নতুন নাম রেখেছিল ইজ্জত সেখ। এবার যা! যা, চলে যা! বলে রুদ্র আমার সাইকেল ছেড়ে দিল।

রুদ্র সাইকেল গড়াতে গড়াতে অনেক দূর চলে গেছে। আমার দু'টি চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। সামনে পা বাড়াতে পারছি না। আমার আর সাহস নেই সাইকেল চড়ার। সামনে কিছুটা গড়িয়ে গড়িয়ে এসে পিছনে ফিরে চাইলাম। রুদ্র তখনও হেঁটে চলেছে, সাইকেলে উঠে পড়তে পারেনি। প্রবল এক কষ্ট আমার বুকখানাকে জড়িয়ে ধরেছে, কী যেন দলা পাকিয়ে ঠেলে ঠেলে উঠতে চাইছে গলা অবধি।

ইজ্জত সেখ এবং শেখর আনসারি একই লোক। ফরহাদের বাবা। বর্ধমানের মৌলবী তার নতুন নাম দিয়েছিল। আমার নাম যখন আকাশলীনা হয়, তখন শেখরের নাম হয় ইজ্জত। আমি যখন সৈয়দা হই, তখন সে হয় আনসারি। অথবা তিনি আনসারি ত্যাগ করে সেখ হয়ে ওঠেন। এই সেখ হল কৃষক-সেখ, আনসারির এক দুই বিঘত উপরে। তিনি কুয়েতের বণিক-সেখ নন।

কী কষ্টে যে বিলাসপুর পৌঁছেছি কেউ জানে না। মাঠের মধ্যে একটা জমিতে শেখরের কবর হয়েছে। সাধারণ কবরস্থানে ওঁর ঠাঁই হয়নি। এখানকার সুন্নী সেখেরা আপত্তি করেছে। ফরহাদদের কাঁচা বাড়ি। দাওয়ায় ছেলে বুকে করে কাঠ হয়ে বসে রয়েছে ওর দিদি কমলা। আমাকে দেখেও ওর দৃষ্টি কঠিন হয়ে দূর দিগন্তের দিকে স্থির হয়ে রইল। নরম হল না। পলক পড়ল না।

ফরহাদদের ঘরের দেওয়ালে সাইকেল কাত করে রেখে আমি চুপচাপ মাঠের দিকে চলে আসি। কাঁচা কবরের মাটি এখনও কালো এবং নরম আর ভেজা ভেজা। বকুল ফরহাদের কাঁধ ধরে বাড়ির দিকে টানছে। ফরহাদ উঠছে না।

বেলা বেড়েছে। ফরহাদ আর বকুল ছাড়া হেথা আর কোনও জনপ্রাণী নেই। দূরে দূরে জন-মুনিশ দেখা যায়। মনেই হচ্ছে না, এখানে একজন নিরীহ কৃষক মস্তানদের গুলি খেয়ে মারা গেছে। সেই মস্তানরা রাজনৈতিক দলের সাহায্যপুষ্ট গাঁয়েরই ছেলে। ফরহাদ নিশ্চয়ই তাদের চেনে।

একটা জিনিস আশ্চর্যভাবে লক্ষ করেছি, কমলার দাওয়ার নীচে উঠোনে এক বৈষ্ণবী নির্বিকার বসে ছিল। ঝর ঝর করে ওর চোখ দিয়ে চুঁইয়ে জল পড়ছিল।

মাঝে মাঝেই কান্নার মধ্যেই বৈষ্ণবী কমলার চোখের দিকে চেয়ে বলে উঠছিল—কাঁদো মা কমলা, কাঁদো। একবার কাঁদো।

পাথরের মূর্তির মতো বসে ছিল কমলা। বৈষ্ণবীর আর্তস্বর ওর কানে যাচ্ছিল না। কমলার অনুভূতির উপর বৈষ্ণবীর কণ্ঠস্বর কোনও রেখাপাত না করায় কোনও আলোড়ন ছিল না কমলার দেহে। শিশুকন্যা কমলার কোল থেকে নিঃশব্দে বার হয়ে এসে আবার কোলেরই মধ্যে ফিরে যাচ্ছিল।

আমার ছায়া পড়ল ফরহাদের গায়ে, সাদা গেঞ্জির উপর। আমাকে দেখে বকুল থেমে গেল। ঘাড় তুলে বেদনায় ভারী চোখ মেলে ফরহাদ আমাকে দেখল। তারপর ধীরে ধীরে চোখ নামিয়ে নিল।

আমি ওর দেহের পাশে মাটিতে বসে পড়লাম। ওর মাটিমাখা, মাটি শুকিয়ে-ওঠা একখানি হাত কোলে তুলে নিয়ে বললাম—কেমন করে হল ফরহাদদা! আমরা গুলির শব্দ শুনেছি! আমাকে বল, অন্তত আমাকে বল! কথা বল। চুপ করে আছো কেন?

BanglaBook.org

আমরা তোমার কেউ নই ?

ফরহাদ দিগন্ত থেকে চোখ টেনে এনে আমার মুখের উপর নরম করে মেলে ধরে মাথা নাড়তে থাকে একটু একটু। আমি তার কেউ নই, নাকি কেউই তার কেউ নয় অথবা তার মনে অন্য কিছু হচ্ছে, বুঝতে পারি না।

আমাদের বাড়ি এখান থেকে গঞ্জপারে পাঁচ মাইল তফাতে। বাড়ির নীচে নদী আছে বলে জলস্রোতে গুলির শব্দ স্পষ্ট হয়ে ভেসে গিয়েছিল। দূরত্ব ছ'মাইলও হতে পারে।

ধীরে ধীরে এবার পিছনে ফিরে বকুলকে চেয়ে চেয়ে দেখল ফরহাদ। তারপর বলল—পানি !

সঙ্গে সঙ্গে হরিণের মতো ছুটে চলে গেল ছেলেটা।

বকুল বদনা করে জল আনে। কোনও ক্রমে এক ঢোক জল নল দিয়ে গলায় নেয় ফরহাদ। জলের স্পর্শে ওর দেহ কেঁপে ওঠে। চোখের কোণে জলের বিন্দু নড়ে ওঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একমুঠো মাটি অকারণ বাবার কবরের দিকে ছুঁড়ে দেয়। মনে হচ্ছিল, সে যেন এখনও বাবাকে কবর দিতে পারেনি। এখনও বাপের অস্তিত্ব এই পৃথিবীরই কোথাও জেগে আছে। এই শেষ একমুঠো মাটি কবরে ফেলে উঠে দাঁড়াল।

এবার আমার দিকে সহজ দৃষ্টিতে চাইল সে। তারপর উচ্চারণ করল—রুদ্র ?

—চলে গেছে।

—ও ! আমার তো আর কেউ রইল না, আপন বলতে রইল কেবল কমলা। মৌলি ওর মেয়ে। বাচ্চা। ওদের কী হবে ?

—তুমি আছো। তুমি আছো ফরহাদদা !

—বিলাসপুর না এলে বাবা মরত না। জাতি-পরিচয়ের লোভ বাবাকে শেষ করে দিয়ে গেল আকাশলীনা। তুমি উচ্চবংশের মেয়ে, তুমি কেন এসেছ এখানে ?

—বাবা পাঠিয়েছেন।

—আমার বাবার নাম শেখর। শেখর আনসারি। বোঝা যায়, আমরা দু'-এক পুরুষ আগে নিম্নবর্ণের হিন্দুই ছিলাম। এখনও আমরা পুরোপুরি মুসলমান হয়েও উঠিনি, তার একটা চেষ্টা চলেছে।

—রাত্রে তুমি ওইভাবে চলে এলে...

—দক্ষিণবঙ্গে ফুটিগোদা বলে একটা গ্রাম আছে। ওখানে আমার এক বন্ধু থাকে। চিঠিপত্রে যোগাযোগ আছে। ফুটিগোদার বৈদ্যপাড়ায় বাড়ি। ওর খোঁজে একবার ওই গাঁয়ে গিয়েছি, ওর ভাল নাম আনসারুল, তো নাম বলতেই লোকে বললে, বাবু বদ্যিকে খুঁজছেন, বদ্যিপাড়া চলে যান। এই দেশে অনেক মানুষ এখনও জাত খুঁজে পায়নি আকাশলীনা !

—গুলির আওয়াজ যখন হল আমরা আর কিছুতেই ঘুমাতে পারিনি...সারারাত...

—বাবু তার মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, মা আমার সুফি। সুফি মহিলা, বুঝলে ফরহাদ ! বাবু কতবার বলল ওই কথাটা !

—আমি আর রুদ্র, ছাদের উপর...

—বাবুকে শেষে বললাম, তুমি এত সুফি সুফি করছ কেন, তুমি তো বৈদ্য ! ঘটনা হচ্ছে, বাবু একটা দুর্ভেদ্য দীর্ঘ সুড়ঙ্গের কথা বলছিল, ওপারে কী আছে আমরা জানি না।

—বাবা তোমাকে ভালবাসেন ফরহাদদা ! তুমি এমন কেন করছ ?

—বাবু একজন কবি। ওর একটা কবিতার বই আছে, বড় কবি নয়, নিজের খরচায় ছেপেছে। কৃষ্ণেন্দু চাকী চমৎকার প্রচ্ছদ এঁকেছেন। কাব্যগ্রন্থের নাম দুধসর ধানক্ষেত।

BanglaBook.org

দুধসর ধান দেখেছ তুমি ? আছে। আমার কাছে বইটা আছে। তুমি চিঠি লিখে জানতে পার, ওর নাম বাবু বদ্যি কিনা, ওর মা সুফি কিনা !

বকুল বদনা হাতে সম্মুখে একলা আমাদের ফেলে হেঁটে চলেছে। নল দিয়ে জল ঝরিয়ে দিতে দিতে চলে যাচ্ছে বকুল। আমি আশ্চর্য হয়ে ফরহাদের মুখের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। কিছুতেই সে তার বাবার কথা বলতে চাইছে না।

—গুলির শব্দ যখন হল...

—আমি তখন বাড়ি থেকে একমাইল তফাতে, পৌঁছতে পারিনি আকাশলীনা। বাবা শয়তানগুলোকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, গরু খুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে, কোনও কৃষক সহ্য করতে পারে না। আমি বাবু বদ্যিকে বলেছিলাম, আমার গাঁ বিলাসপুরে হলে তুমি সুফি সুফি করলে লোকে ভাবত, তুমি বাউল। সেখানে সুফি কোনও সম্মানের জিনিস না।

—আমি তোমাকে সম্মান করি ফরহাদদা ! বলে আমি কেমন আর্তনাদ করে কেঁদে ফেলি। আমাকে ফেলে কয়েক ধাপ এগিয়ে চলে যাওয়া ফরহাদ এবার ঘুরে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে আমার কাছে ফিরে আসে। খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে আমার বুকের কাছে দাঁড়িয়ে দিগন্তে চোখ মেলে দিয়ে বলে— তুমি এখান থেকে চলে যাও লীনা। এ বড় পাপের জায়গা। আবদাল মানে জানো ? মুসলমান মেয়ে বউ, বুড়িদের মুখের গাল ওটা। ওটা যে জাত তুলে গাল, তা-ও তারা জানে না। আবদাল মানে অর্জল। ইতর। আমি ইতরশ্রেণীর মুসলমান। বাপ এই ভিটায় না এলে মরত না। হয়তো বেঁচে থাকত।

—গুলির আওয়াজ শুনে এক মাইল পথ তুমি দৌড়ে এসেছিলে...

—হ্যাঁ। পাগলের মতো। জীবনটা কী জানো আকাশলীনা, গান আছে একটা। আচ্ছা, আমি কি পাগলের মতো কথা বলছি ?

—না।

—জিন্দেগি এক ইত্তেফাক হ্যায়। কী হাহাকার, কী শূন্যতা। অসম্ভব কষ্ট। জীবন আকস্মিক। ইত্তেফাক। এইমাত্র আমার বাবা এখানে ছিল আকাশলীনা। এইমাত্র ছিল এখানে। খুব নরম করে আমার নাম ধরে ডাকত, ফরহাদ আহমেদ এসেছ ? কখনও তুই বলত না। এত কম কথা বলত, সে তুমি ভাবতেই পার না। কিন্তু ফরহাদ আহমেদ, পুরো নামটা ওর ডাকা চাই। জীবন মাত্র একবার এবং সেটা আকস্মিক।

—ফরহাদদা। এখন আর কথা বোলো না।

—একজন প্রায়-নিরক্ষর কৃষক একটি শিক্ষিত ছেলেকে সম্মান করত। মনেই হত না, আমি তার ছেলে। বাপ এবং সন্তানের এই দূরত্ব আর এক ধরনের ঘনিষ্ঠতা, কখনও সে চোখ রাঙিয়ে কথা বলেনি। কথা বলতে গিয়ে লজ্জা পেত। লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিত। কী ঠাণ্ডা মানুষ। মাঝে মাঝে মনে হত, আমি কি তার সন্তান নই ! আশ্চর্য অচেনা লাগত বাবাকে।

—তুমিও খুব আশ্চর্য ফরহাদদা ! তুমিও অচেনা মানুষ।

—সবাই। জীবন সম্পর্কে এই মানুষটার কোনও অভিযোগ ছিল না। কারও কোনও সার্থকতা, ব্যর্থতা সম্পর্কে আলাদা আগ্রহ ছিল না। মন্তব্য না করে শুনত কেবল। অনার্স পাশ করেছি শুনে বলল, শ্যাম সেনের দোকানে দর্জিকে মাপ দিও, তোমার একটা নতুন জামা দরকার। এটাই তার আনন্দের ভাষা। ব্যাস ! আর কিছু না। স্নেহ বলো তো, তাই। জামা, আমি যেন তখনও ছোটছেলে। ও জানতই না পাশটা কত বড় কিংবা কতটা কী, বা খবর শুনে কী বলতে হয় !

BanglaBook.org

পরম বিস্ময়কর কথাগুলি বলে চলেছিল ফরহাদ। ফরহাদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্বন্ধ কখনওই নিত্যদিনের নিবিড় সম্বন্ধ তো নয়। ও বরাবরই তার নিজের খেয়ালখুশি মতো যায় আসে। বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে কখনও ঘন ঘন, কখনও দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থেকে যায়। বাবার দলের সঙ্গে ওর কৈশোরে কোনও এক সময় কিছু সংযোগ ঘটে গিয়ে থাকবে। বোধ করি একটা কোনও আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল, দলের কোনও নেতার নির্দেশে ও আমাদের বাড়ি আসত। অনন্ত কাকাই একদিন ওর কাছে রুদ্রকে অঙ্ক শেখানোর প্রস্তাব করেন।

বাবা বৎসর কাল যাবৎ মুক্তি পাওয়ার পর ফরহাদকেই আশ্চর্যজনকভাবে অবলম্বন করলেন, মনে হয় কিছু আগে থেকেই বাবার সঙ্গে তার চেনাজানা হয়েছিল। বাবা অবশ্য খুব দ্রুত মানুষকে আপন করে নিতে পারেন। মনেই হয় না, ফরহাদের সঙ্গে বাবার সম্বন্ধ নতুন কোনও ঘটনা। বাবা যখন জেল থেকে বার হয়ে এলেন, হাতে ধরা লাঠি, সামনে দাঁড়িয়ে ফরহাদ। কাঁপতে কাঁপতে তিনি ফরহাদের কাঁধ চেপে ধরলেন। মা তা দেখে ফুঁপিয়ে উঠেছিলেন।

মাকে ওইভাবে কাঁদতে দেখে ফরহাদ বলেছিল— দুঃখ করবেন না মামি, আমরা তো আছি!

বাবা যে লাঠিটাকে অবলম্বন করেছেন, তা যেমন আর চোখে লাগে না, তা যত গুরুত্বপূর্ণ, ততই তুচ্ছ, তেমনই ফরহাদের অস্তিত্ব, ওর কাঁধ পেতে দাঁড়ানো ভারবাহী জীবের মতন স্বাভাবিক, তা কোনও বিশেষ কাজের মধ্যে পড়ে না।

দলের নির্দেশেই ফরহাদ আমাদের বাড়ি আসে। মা এই ঘটনাকে প্রাপ্য সুযোগ মনে করেছিলেন। বাবার আত্মত্যাগ সম্মানের বলেই তো ফরহাদ এ বাড়ির উপকার করেছে, অতএব যে-কোনও জনই তা করতে পারত। ফরহাদকে অবলম্বন করেছি আমরা, অথচ বুঝতে চাইনি। সে একটা প্রাণ, তা মনে করিনি, তাকে নিষ্প্রাণ ভেবেছি।

একথা আমারই মনে হয়েছে, আর কারও হয়েছে কি না জানা নেই। আর একথাও আজ মনে হয়, বাবার সান্নিধ্যই হল সেই প্রতিদান, তার বেশি প্রাপ্য কিছু ফরহাদের থাকতে পারে না। ফরহাদ কি জানে না, মা তাকে কোন্ চোখে দেখেন।

শুধু তুমি আমার হাতটুকু ধরেছিলে, তাইতেই মায়ের ওই রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কেন? আর কখনও হাত বাড়াওনি আমার দিকে। আমার বয়েস বেড়েছে, আমি অপেক্ষা করে থেকেছি, তুমি সাহস করে এগিয়ে আসবে, আমাকে স্পর্শ করাই কি স্বাভাবিক ছিল না? কেন করনি? আমি তোমার আকাশ-প্রতিম, এত দূরবর্তী আমি?

আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে মাটিতে বসে পড়ল ফরহাদ। মাথা ঘাড় নিচু করল। দু'হাতে মাটি আঁকড়ে ধরল। তারপর মুখ তুলে বলল— আমার মা নেই আকাশলীনা! বাবাও শেষ হয়ে গেল। এরা এই দেশের মাটিতে জন্মেছিল কেন, তাই ভাবি। আমার জন্মের সাধ ঘুচে গেছে আকাশ।

জীবনে এই প্রথম ফরহাদ আমাকে আকাশ বলে ডাকল। বাবা ছাড়া কেউ আমাকে আকাশ ডাকে না।

—আমার আর কোনও অঙ্ক জানা নেই, যা দিয়ে বাপের মৃত্যুর আমি হিসেব কষতে পারি। তুমি ভেবেছিলে হয়তো, বাবা মরল কেন, আমি সহজেই বলে দিতে পারব। পারব না। বাপু গুলিবিদ্ধ অবস্থায় একঘণ্টা বেঁচে ছিল আকাশলীনা! আমি চেষ্টা করেছি...

—কী চেষ্টা করেছ! বল আমাকে! বলে ওর মুখের কাছে ঝুঁকে নামি আমি। ওর কাঁধে গলায় অত্যন্ত মমতাবশে হাত রাখি। চারটি দিগন্ত আমাদের থেকে দূরে অবস্থিত।

BanglaBook.org

এই ভূদৃশ্য আসলে আকস্মিক। মৃত্যু আর প্রেম পরস্পর সংলগ্ন এখানে।

—পাগলের মতো করেছি আকাশ। পাগলের মতো...

—তুমি ওদের চিনতে পেরেছিলে ?

—হ্যাঁ। ওরা সব আমার চেনা। প্রতিদিনের মুখ দেখাদেখি... আমাকে মাস্টার বলে ডাকে। আমি বাড়ির উঠোনে এসে পৌঁছনো মাত্রই ওরা ছায়ার মতো সরে গেল। বাড়ির বাইরে গোয়ালের কাছে বাবা খুন হয়েছিল, দু'জন গুলিবিদ্ধ বাবার দু'টি হাত ধরে হিঁচড়ে টেনে বাড়ির উঠোনে নিয়ে আসছিল কেন জানি না। আমাকে দেখে বাবাকে ফেলে ছায়ার মতো সরে গেল। ঘরের বাতায় হ্যারিকেন ঝুলছিল, মাটির গোলার আড়ালে কাঠ হয়ে মেয়েকে বুকে আঁকড়ে বসে রয়েছে কমলা। ও চিৎকার পর্যন্ত করতে পারছে না।

—এবার তুমি ওঠো ফরহাদদা !

—ছায়া হলে কী হয়, অন্তত দু'জনকে আমি চিনতে পারি। নাম ধরে আর্তনাদ করি। এ তুমি কী করলে জিকির মুন্‌শি। পাতু খাঁ, এ তুমি কী করলে ভাই ! আমার বাবাকে মারলে ! এম. এল. এ-র ভাইপো জিকির। বললাম, এম. এল. এ-র ভাইপো হয়ে এই করলে ! জনদরদী তোমরা। মেহনতি মানুষের বন্ধু হয়ে মানুষ খুন করলে ! ওগো কে আছো, শেখর আনসারি শেষ হয়ে গেল, তোমরা শুনতে পাও ?

—আর বোলো না !

—আমার বাপের গরুগুলো বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে হেদিয়ে চলে গেল। মুঙ্গেরি মাস্কেট আমার বাপুকে খতম করল। আমার বাপু, তখন উঠোনে পড়ে রইল আকাশলীনা। অল্প অল্প কাতরাচ্ছে বাপ। আমি ছিটকে আসি বাইরে। এ বাড়ি, সে বাড়ি, প্রত্যেক দোরে গিয়ে ডাকি। সুলতান চাচা ! উঠুন। শরিফ ফুপা ! শেখর আনসারি খুন হয়ে গেল ! মাদানি সাহেব, ফুরফুরাশরিফ, ইমানদার, পরহেজগার ! পাক-জুবান, খোদার ভক্ত ইনসান। মোমিন মুসলমান, ইসলাম-এ-আলম। জাগো, জাগো। জাগো দফাদার চাচা ! কমরেড তহিদুর ইসলাম, আছো নাকি ! কেউ নাই। মোমিনা চাচী, খুদি বেওয়া, মিস রোজিনা বেগম। কই, শুনতে পাও ?

—তোমার কষ্ট হচ্ছে, আর বোলো না।

—একটা কেউ এগিয়ে এল না আকাশলীনা। একজনও কেউ জবাব দিল না। শুধু কোনও কোনও ঘরে জানলায় কুপির আলো দেখা গেল। কোনও ঘরে বিদ্যুতের আলো নিবিয়ে দেওয়া হল। মসজিদের খতিব কেবল বলল, খোদার নাম কর ফরহাদ, বাপের মুখে পানি দাও, বেশি চেঁচালে তুমিও বাঁচবে না।

সামান্য দম নিয়ে ফরহাদ বলল—আমি ভরসা পেয়ে খতিবকেই ডাকলাম। খতিব সাহেব ! আপনি একটুখানি আসুন, অন্তত দেখুন আমাদের কী হয়েছে ! সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির মসজিদ নিশ্চুপ হয়ে গেল। আর সাড়া এল না লীনা ! আমি এক পালাঙ্গা থেকে খালি একটা গরুগাড়ি টেনে আনি। গরু চেয়েছিলাম, গেরস্ত রে রে করে উঠল। বলল, লিবা না, খবর্দার ! কিসে থেকি কি হবে জানা নাই। যাও, যাও।...

—তারপর ?

—বকুল আর আমি বলদের মতো গরুগাড়ির জোয়াল বুকে ঠেলে বাপকে হাসপাতাল নিয়ে যেতে চাই। কোনও ইমানদার, জাগ্রত ইসলাম, কোনও পুণ্যবান মোমিন, কোনও জনদরদী ক্যাডার, কেউ সাড়া দেয়নি, কোনও জ্ঞাতিগুষ্ঠি বাপের মুখে পানি দিতে এগিয়ে আসেনি। এই গ্রামে আমরা কেন যেন ব্রাত্যই থেকে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া, ভীত মানুষ ধর্মের জোরেও মানুষের বিপদে এগিয়ে আসে না, ধর্মের হিংসা তারা অসহায় মানুষের

BanglaBook.org

উপর প্রয়োগ করার জন্য দলবেঁধে এগিয়ে যায়। এ আমার অভিজ্ঞতা, কোনও অবস্থাতেই এই ধারণার পরিবর্তন হবে না।

—গরুগাড়ি করে বাপুকে...

—বাপুর অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছে। এইভাবে বয়ে নিয়ে যেতে পারব না হয়তো, কিন্তু পারবই বা না কেন! কদমতলায় পৌঁছে হঠাৎ বাপুর গলা শুনে থমকে দাঁড়ালাম। খুব ঠাণ্ডা এবং স্থির গলায় বাবা বলল, আমি বাঁচব না ফরহাদ আহমেদ। নামাও মোকে, নামাও। মাটিতে রাখো। বিহানে কবর দিও। থানা পুলিশ কোরো না। ফল নাই। ... আর বাপু কথা বলেনি।

আমি এবার মাটিতে হাঁটু ভেঙে বসি। ফরহাদকে স্পর্শ করি।

—দশের গোরস্তানে বাপুর ঠাঁই হয়নি আকাশলীনা। সুন্নীরা বাপকে ঘৃণা করত। বেসরা বাউল বলে গাল দিত। নির্বোধ জোলা বলে ছোট করত। ধর্ম রাতে ছিল না, ভোরেই ধর্মের বিধান জারি হয়ে গেল। এ বড় পাপের জায়গা আকাশ। এখানে তুই কেন এসেছিস! চলে যা!

ধীরে ধীরে মাথার উপরে সূর্য উঠে আসে। বাড়ি থেকে দেড় মাইল দূরে ফসলের মাঠে শুয়ে রইল শেখর আনসারি। বুঝতে পারছিলাম, এই ঘটনা এখানেই নিশ্চুপ হয়ে যাবে, ফরহাদ পার্টি অথবা থানা কিংবা প্রশাসন কারও কাছে ঘটনার প্রতিবাদ করবে না, এমনকি নালিশ জানাবে না। পুলিশ পৌঁছনোর আগেই সে তার বাপের কবর দিয়ে ফেলেছে।

—কী করে খুন হল?

—জানি না।

—কাউকে চিনতে পেরেছেন?

—না।

—খুন হওয়ার সময় কোথায় ছিলেন?

—ছিলাম না।

—খুনের কেস, কবর দিয়ে ফেললেন কেন?

—আমার কোনও অভিযোগ নেই।

—থানার দায়িত্ব আছে। আমরা এসেছিলাম...

—চলে যান।

—কবর থেকে আমরা লাশ তুলতে পারি।

—ফল নাই বড়বাবু। বাপু বলে গিয়েছে।

—আপনি তো আশ্চর্য কথা বলছেন। একজন শিক্ষিত মানুষ হয়ে...

—আমি বলছি, কোনও জবাব নেই আমার কাছে। দয়া করে রেহাই দিন। পঞ্চায়েত প্রধানের হাত-পা ধরে অনুগ্রহ চেয়েছি, আমার খুন হওয়া বাপের লাশ যেন মাটিতে শুতে পায়, তাকে যেন আর কোথাও টানাহেঁচড়া না করা হয়। কবর থেকে লাশ তোলা হলে আমার বোন কমলা পাগল হয়ে যাবে স্যর।

ও. সি তাঁর দলবল নিয়ে ফিরে গেছেন। একথা বলে ফরহাদ আমার দিকে নীরবে চেয়ে রইল। বাড়িতে এসে বৈষ্ণবীকে দেখে ঠাণ্ডা প্রকৃতির ফরহাদ সহসা অদ্ভুত উত্তেজিত হয়ে উঠল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখাল তাকে। বৈষ্ণবীর কাছে প্রায় তেড়ে গিয়ে বলল— তুমি আর জাতিচ্যুত ক'রো না বিন্দুবাসিনী। এসো না এখানে। কেন এসেছ? তোমার জন্যই বাপুর গোর হল না দশের কবরখানায়। চলে যাও। দূর হয়ে যাও।

BanglaBook.org

৫. নবীর চেলা গৌরাঙ্গ এবং মাঝনদীতে সূর্যাস্ত

ফরহাদ বৈষ্ণবীকে ওইভাবে বিতাড়িত করে অসম্ভব কষ্ট পেয়েছিল। গলায় কণ্ঠি, কপাল থেকে নাক অবধি ছড়ানো তিলক, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য, চল্লিশ ছুঁইছুঁই বয়েস, মাঝারি উচ্চতা, মুখখানিতে মমতা মাখানো বিন্দুবাসিনীকে ওইভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হল কেন প্রশ্ন করতে পারিনি।

বিন্দু চলে গেল অপ্রতিভ ভঙ্গিতে, বিতাড়িত ভীত পশুর মতো। যেন বা ভয়ানক কোনও অপরাধ করেছে। ফরহাদ দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে ধীরে ধীরে কেমন ব্যথাতুর চোখে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। বকুল ওদের বাড়ি থেকে কলাপাতায় ঢেকে থালা করে ভাত তরকারি এনে কমলার সামনে রেখেছিল। মৌলি বারবার খাবারের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে আসছিল। তা দেখে ফরহাদ এক সময় বলল— মৌলিকে খেতে দে কমলা! ওর খিদে পেয়েছে।

কমলা কিছুক্ষণ ইতস্তত করে কলাপাতা সরিয়ে ভাতের সঙ্গে তরকারি মেখে কন্যার মুখে তুলে ধরল।

কমলা বারবার আমাকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। কখনও এর আগে দেখেনি। আমি নিকটবর্তী অন্য ঘরটির দাওয়ায় খুঁটি ধরে বসে পড়েছিলাম। বেলা বেড়েছে। দুপুর হয়ে এসেছে। খিদেয় পেট একটু একটু আঁচড়ে উঠছে। আমি তবু ভোরে কিছু খেয়েছি, এরা যে কিছুই খায়নি। এ বাড়িতে পড়শিরা কেউ আসছেও না তেমন। দু-একজন বউ বা কিশোরী কিংবা বৃদ্ধারা এসে দোর থেকে দেখে চলে যাচ্ছে। কেউ এসে খেতে বললে তবে তো শোকাহত মানুষ মুখে অন্ন তুলবে।

হঠাৎ দু-তিন বছরের বড় দিদির দিকে চেয়ে ফরহাদ বলল— আমি বোষ্টমিকে অপমান করতে চাইনি কমলা! চাইনি।

কমলা উত্তর দিল না। কলাপাতায় বেড়ে নেওয়া ভাত মৌলি সব খেতে পারল না। এক থালাতেই তিনজনের ভাত চেপে বসানো। মৌলির মুখ ধুইয়ে আঁচলে মুছে কমলা বুকের সঙ্গে মেয়েকে চেপে ধরল। তারপর চোখ বুজে স্থির হয়ে গেল। একটু বাদেই ওর বোজা চোখ দিয়ে দরদর করে জল ঝরে পড়ল।

ফরহাদ আমার দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে বলল— তুই চলে যা আকাশলীনা!

কমলা এবার চোখ খুলল। তারপর ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল আমার দিকে। কোনও বুদ্ধি যে তার কাজ করছে না বোঝা যাচ্ছিল। তবু এক সময় বলে উঠল— বৈষ্ণবী আমাকে কাঁদতে বলে গেল ফরহাদ, আর তো কেউ বলেনি। এই পুঁটলিতে খাবার দিয়ে গেছে।

—নিয়েছিস কেন?

—মায়া হল যে! কী করব! তুমি কিছু খাও। বোন, তুমিও আসো। ফরহাদকে খেতে কও, ও রাতেও খায়নি। আমার কথা ভাবিস না ফরহাদ, আমি ঠিক বেঁচে থাকব।

আমি আস্তে আস্তে ফরহাদের কাঁধের কাছে এসে দাঁড়াই। কাঁধে হাত রাখি। তারপর বলি— তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

—যা না! আর কে আছে তোর! কাঁধে গরুর জোয়াল নিয়েছে, ভাই আমার মানুষ নেই লীনা! যাও, ভাইকে টেনে নিয়ে যাও।

আরও নিবিড় করে ফরহাদকে আমি চেপে ধরি। একটু করে নিজের দিকে আকর্ষণ করে বলি— আমি তোমাকে না নিয়ে যাব না!

BanglaBook.org

—না।

—যাবে না ?

—তুই চলে যা। বাড়িতে চিন্তা করবে।

—তোমাকে না নিয়ে যাব না, বলছিই তো! ওঠো! ওর গায়ের জামাটা দিন কমলাদি। পরনের প্যান্টে তোমার অনেক ধূলা লেগেছে! শোন! এই ভাবে যাবে ?

—আমি যাব না আকাশলীনা!

—আমি বুঝি বৈষ্ণবীর চেয়েও তোমাদের পর! কেউ নই ? একথা হঠাৎ-ই মুখে এসে পড়ে আমার। কেন আসে বুঝতে পারি না। এবার ফরহাদ তীব্র দৃষ্টিতে আমাকে চেয়ে দেখতে থাকে। জানি না কীভাবে আমি ওকে আঘাত করেছি। ও উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমার একটি হাত চেপে ধরল শক্ত মুঠোয়, কী একটা কথা সে বলতে যাবে, এমন সময় দোরে এসে দাঁড়াল এক মসৃণ করে মুখ কামানো প্রৌঢ় ব্যক্তি। হাতের মুঠো শিথিল হয়ে গেল ফরহাদের। মুরুব্বি গোছের প্রৌঢ় অদ্ভুত কদর্যভাবে হেসে ফেলল। নিশ্চয়ই এ লোক পঞ্চ-প্রধান।

তারপর বলল—আ রে না না! ঠিক আছে, ঠিক আছে। মনে কর, আমি দেখতে পাইনি। বাপ শুয়েছে কবরে, তুমি ইদিকে এই করছ, তা কর! যেমন বাপ তার তেমন পোলা! বোষ্টমি কেন এসেছিল বলবা একটু। খুবই দৃষ্টিকটু হয় বাপজি! আমি চেষ্টা চরিত্তির করে জাতে তুলছিলাম শেখরকে। হল না।

আমি বললাম—আমার উনি মাস্টারমশাই। শোকের মুহূর্তেও আমি তাঁকে ছুঁতে পারব না ?

—কে আর ছুঁবে ওকে মা! তোমাকেই তো ছুঁতে হবে। বেশ করেছ! কিন্তু কথা হচ্ছে, বোষ্টমি যেন আর না আসে ফরহাদকে বলে যাচ্ছি। কমলার কী হবে ভেবেছ একবার! শেখরের সঙ্গে বিন্দু বৈষ্ণবীর সম্বন্ধ কী ছিল, এই প্রশ্ন পয়দা হচ্ছে মজলিসে, এইডা নির্ণয় হোক ফরহাদ, তোমার পার নাই! আর ইমামের মেয়ে তোমাকেও বলি, শোকের দিনে তুমি এই কাজডা ঠিক করলে না!

বলেই লোকটা সদরদোর থেকে হনহনিয়ে পথে নেমে চলে গেল।

কমলা জামা আর প্যান্ট ফরহাদের সামনে এগিয়ে ধরে বলল— নাও। পরে ফেলো। তুমি সব ঠিক করেছ লীনা! তুমি তোমার মাস্টারকে সাথে নিয়ে যাও! তোমার নাম আকাশ, আমার ছোটজাতের ভাইটাকে ছুঁয়েছ বলে গ্লানি রেখো না মনে, আকাশ তো অনেক বড়। আমি সামান্য লেখাপড়া জানি ভাই, দুখপিয়ারি মেয়ে আমি ; বাপ, স্বামী সবই অপঘাতে গেল। ঘরামির ঘরে বিয়ে দিয়েছিল বাপ, অশিক্ষিত বর, কাজী বংশ ছিল, ওই লোভ। যাও! মনে দুঃখ রেখো না।

আর কোনও কথাই আমি বলতে পারিনি। বিস্ময় আর ব্যথায় মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। সাইকেল গড়িয়ে চলেছি আমি। পাশে পাশে নির্বিকল্প নিস্তব্ধতায় মূর্তির মতো হেঁটে চলেছে ফরহাদ। মনে হচ্ছিল, বাবার কাছে পৌঁছালে ও হয়তো কিছুটা আরাম পাবে।

পথে বেরিয়ে পাঁচ মিনিট সাইকেল গড়িয়ে এসে নিজেই খুব অবাক হয়েছি। এ তো উল্টো দিকে চলেছি আমরা। নদীপথ এদিকে বৃত্ত পরিধির মতো নিজেকে বাঁকিয়ে তুলেছে, নদীর চর সবুজ, ফসলের ভিতর দিয়ে ফালিপথ এঁকেবেঁকে শেষ অবধি নদীতে নেমেছে পারঘাটে। কখনও দেখিনি এমন বিস্ময়কর চরভূমি, দিগন্ত অতিক্রান্ত নদী জ্বলজ্বল করছে, ঝিলমিল করছে, এক স্পন্দমান জলের কুলুধ্বনি কোথায় যে চলে গেছে,

BanglaBook.org

নদীর কিনারে কত বনাঞ্চল, গ্রাম, কত গরুদল, কত বিচিত্র পাখি, কত আশ্চর্য জীবন ছড়ানো, কখনও সেসব দেখব না এ জীবনে, কত যে অস্পষ্ট গুঞ্জন এই নদী সুদূরে পরিব্যাপ্ত করে চলেছে, সেই সুর শুনব না কখনও—মনটা কেমন যে করে ওঠে, কাউকে বোঝানো যাবে না। এই নদী আর চরভূমির মধ্যে ফরহাদ চলেছে শোকস্তব্ধ পিতৃমাতৃহীন এক যুবক, এক কদর্য হিংসা উৎপন্ন করেছে গ্রাম আর রাজনীতি এবং ধর্ম। এই দেশের জাতিপথ কী বক্র, কৌম-মিনার কী কুটিল, এ বড় পাপের জায়গা। নদী কিছুই জানে না, মাথার আকাশও নির্দোষ যেন— ফরহাদের জন্য কারও কোনও পরিতাপ নেই।

সাইকেলটা হঠাৎ আমার কাছে থেকে কেড়ে নিয়ে ফরহাদ নিজে গড়াতে গড়াতে বলল— তুই আর পারবি না এখন। পথ খারাপ। সামনে নহর আছে, মাথায় তুলে নিয়ে পার হতে হবে। কখনও এসেছিস এদিকে ?

—না।

—এই নদীটাকে আমি ভালবাসি লীনা। গঙ্গার পবিত্র জল বইছে এই নদীতে। রোজ চান করি আর ভাবি এত করেও কখনও শুদ্ধ তো হব না। অর্জল মানুষের দেহ অপবিত্র আকাশলীনা— কোনও জলেই তা...

এ কথা শুনে আমি সিঁথিপথে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। সামনে দিয়ে ফসলের সবুজের ভিতর দিয়ে একটি সুদীর্ঘ সাপ তীব্রবেগে নদীর জলের দিকে ছুটে গেল। কতকগুলো জলভাসা মৌরলা দলবেঁধে ভাসছিল, জলে নেমে সাপটা মাছগুলোকে তাড়া করে গেল। জলে সন্ত্রাস শুরু হল।

—ওই দ্যাখো ! আমার খুব ভয় করছে ফরহাদদা ! বলে দু' হাতে মুখে ঢেকে ফেলি। মাটিতে ফসলের উপর পড়ে যায় সাইকেল, ফরহাদের হাত থেকে খসে।

ফরহাদ আমার খুব কাছে ছুটে আসে। আমার কাঁধ আলতোভাবে স্পর্শ করে বলে— এমন কখনও দেখোনি বুঝি ! সাপটা ওই রকম কতক্ষণ যে তাড়া করে ফিরবে !

—কেন ?

—তা তো জানি না আকাশলীনা ! সাপেও মাছ খায় জানো ?

—ও।

—হ্যাঁ রে ! জীবচক্রের ইতিহাস খুব খারাপ। বলে উঠতেই ফরহাদের চোখমুখ ব্যথায় ভরে গেল। অনেকক্ষণ সেই কষ্ট মুখের উপর থেকে সরতে চাইল না। দু' হাত নিজের চোখের উপর থেকে সরিয়ে আমি সভয়ে ফরহাদকে দেখতে থাকি। বাপের মৃত্যু এবং জীবচক্রের সহিংস অস্তিত্ব কি তার ভাবনায় একাকার হয়ে গেছে ! নিরীহ কৃষককে যারা হত্যা করেছে, তারা কি ওই হিংসা ছাড়া বাঁচে না ? অথচ তারাও তো এই কৃষক ঘরেরই ছেলে। এরা এমন কেন হল ? আমি জানি, বাবার কাছে এই ঘটনার ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু এই হিংসাকে প্রতিরুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। অথচ সেই বাবারই কাছে আমি ফরহাদকে টেনে নিয়ে চলেছি।

—তুমি কি ভাবছ ফরহাদদা ?

—না। কিছু না।

—তা হলে ?

—জাতিদাঙ্গা করে কেন মানুষ ! এক সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে অন্য সম্প্রদায় টিকে থাকবে, তাই ? এককে মুছে না ফেললে অন্যের সমৃদ্ধি হয় না, তাই ? মানুষের বুকের মধ্যে এত ঘৃণা ! কালো বলে ঘৃণা ! ব্রাত্য বলে ঘৃণা ! চাষী বলে ঘৃণা। দরিদ্র বলে ঘৃণা। আচ্ছা আকাশ, সত্যি করে বল্। তুই আমায় ঘৃণা করিস না তো ? এই সব কী ভাবছি

আমি।

—তুমি আমায় এত ছোট করছ কেন ফরহাদদা। আমি তো কখনও তোমায় দুঃখ দিইনি।

সাইকেল তুলে নিয়ে একমনে হাঁটতে শুরু করল ফরহাদ। কিছুদূর আসার পর একটি হাঁটুজল নহর পার হতে হল। আগে সাইকেল পার করে রেখে এসে আমার হাত ধরল ফরহাদ। স্রোতের বড় টান আছে নহরে। জলের তলে মাটিতে পা দাঁড়াতে চাইছে না। আমি সামলাতে না পেরে ওর বুকের উপর পড়ে গেলাম। আর তখন কী হল আমার, ওকে আমি দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম।

—আমার ভয় করছে!

—এই মেয়ে! তুমি কি জানতে আমি কে? আমি শেখর আনসারির ছেলে। জোলা।

—আমি কিচ্ছু জানতে চাই না।

—তবে কী জানতে চাইবে?

—ওই যে তোমার মাথাটা, ওটা তুমি আমাকে দেবে বলেছিলে।

একথা শুনে জলের উপর কিছুক্ষণ স্থির রইল ফরহাদ। আমাকে জলের স্রোত ঠেলে কিনারে এনে তুলল। খিদেয় শরীর ঝাঁ ঝাঁ করছে, ফরহাদের ক্ষুধা আরও তীব্র। তবু আমার মনে হল, আমি তাকে ভালবাসি, হৃদয় সেকথা টের পাচ্ছে। তার শোককে আমি আমার ভালবাসা দিয়ে জড়িয়ে ধরি।

একজন গাঁওয়ালি করা যুবক, কাঁধের বাহকে করে মুদির সওদা বেচে ফিরছে এই দুপুরে। ওর কাছে মুড়ি চানাচুর আর লালবাতাসা, পাঁউরুটি এবং বিস্কুট পাওয়া গেল।

এই ছেলেটাকে আমি চিনি। ওকে বললাম— এখন দাম দেব না। চাঁদপুর যেদিন যাবে নিও।

ছেলেটা বলল— আপনাকে আমি চিনি। জৈবুন খালার নাতনি। যেমন যা লিবেন।

ওর কাছে পুরনো খবরের কাগজ ছিল। মুড়ি মেখে ঢেলে নিই তাতে। মুখে গ্রাস তুলতে তুলতে, পাঁউরুটি ছিঁড়ে খেতে খেতে অদ্ভুত মমতাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে দেখল ফরহাদ।

হঠাৎ খুব তীব্রস্বরে আচমকা আর্তনাদ করল ফরহাদ—আকাশলীনা! কেন এসেছিস! বাপু নেই, মা নেই। এই হিংসার পৃথিবীতে তুই এত কষ্টের মধ্যে ছুটে এসেছিস! বাপুকে আমি কী করে ভুলব আকাশ। বলে দে, তুই বলে দে। বলতে বলতে ফরহাদ কেঁদে ফেলল। ওর চোখ চিকচিক করে উঠল।

কেবলই আমার মন বলছিল, আমি ছাড়া ওর আর কে আছে! ওকে স্পর্শ করার কে আছে, ভালবাসার কে আছে! আমি যে আর কিছুতেই ওকে ছাড়তে পারব না।

যেন একটা শিশুরই মতন ও যে অমন আর্তনাদ করবে ভাবিনি। ওর চোখে নিরাশার কালো জল, তবু এক উদ্ভিন্ন কামনা। এই আকুল কামনাকে আমি কী করে অস্বীকার করব! আমি যে তোমারই স্পর্শে নিজেকে পবিত্র বোধ করি ফরহাদ, সেকথা আমি ছাড়া কেউ তো জানে না। তবু এক শোকই তো স্পর্শ করেছে আমাকে।

তোমাকে কবে আমি ভালবেসে ফেলেছি, তুমি একফোঁটা বুঝতেও পারনি। আমিও কি জানি চৌদ্দ বছর বয়সে যখন প্রথম তুমি আমাকে স্পর্শ করলে, মনে হল, এই হাত কখনও কারও ক্ষতি করে না, যে-হাতে তুমি জটিল জটিল অঙ্ক কর, সে হাত এত নরম, এত নিরাবৃত, এত সহজ!

BanglaBook.org

মুড়ি খেতে খেতে আমার চোখ বারবার ওর চোখে গিয়ে পড়ছিল। কী গভীর নির্জনতায় আদিগন্ত স্তব্ধ ছবির মতন দেখায়। কেউ আমাদের দেখছে না, কিছু পাখি আর কালো ইঁদুর চারপাশে চিকচিক করছে, বাবলার গায়ে কাঠবিড়ালি ঘুরছে। নদীতে পালতোলা নৌকা দূর দিগন্তে ভাসছে। কিছু কিছু ধানের ক্ষেত হলুদ হয়ে উঠেছে। চারিদিকে অঘ্রাণের গন্ধ।

—প্রধান বলে গেল, বিন্দু বৈষ্ণবীর সঙ্গে শেখর আনসারির সম্বন্ধ নির্ণয় হোক। সত্যি বলতে কি, কী সম্বন্ধ আমরা জানি না। বিন্দুর একটা আখড়া আছে তরতিপুরে। ওখানে বাবা যেত মাঝে মাঝে। বাউল গানের ওপর বাবার খুব ঝোঁক ছিল আকাশলীনা। বাড়িতে একটা দোতারা আর গলায় ঝোলানো ছোট বাঁয়া আছে। বাবা অদ্ভুত চিৎকার করে প্রায় দুর্বোধ্য তত্ত্বগান করত, তা-ও কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা যেত না। কান পেতে শুনলে ক্রমশ ঠাহর হত কী গাইছে লোকটা। 'শিব দুর্গা কালী তারে আলি ফতেমা বলি'— এই একটা গান। ওই গানের মধ্যেই আছে, 'বল মন রাম কি রহিম/ করীম কালুল্লা কালা। তার ভিন্ন ভেদ নাই...সাক্ষী নিতাই নবীর চেলা।' সব ঠিক মতন মনে আসে না। গৌরাঙ্গ যে নবী মুহম্মদের চেলা তা-ও কি সহ্য করবে সংসার? শিব দুর্গা কালী এবং আলি ফতেমা একই মানুষ, শরিয়তপন্থীরা ভাবতেই পারে না। বাপের জরিমানা হল! কাফ্‌ফারা! পাঁচ সিকি।

—জরিমানা! অবাক হয়ে প্রশ্ন করি আমি।

—হ্যাঁ, লীনা! জরিমানা। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, পাঁচসিকে। পাঁচসিকের ধূপ আর মোমবাতি কিনে মসজিদে দিতে হল বাবাকে। প্রত্যেক সপ্তাহে শুক্রবার জুম্মায় বাবা সেই ধূপ আর মোম হাতে করে নামাজ পড়তে যেত। কিন্তু মানুষটা জানত সব বাহ্য, গলায় লাল রুমাল বেঁধে জমিদখল একটা প্রদর্শনী, তেমনি টুপি, দাড়ি, সিজদা, ওজু সব প্রদর্শনী। খোদার নুরে নবী পয়দা, নবীর নুরে জগৎ পয়দা— ব্যাস! যখন রোখ হত, বাবা ফের গলা ছেড়ে গান ধরত....গলায় খুব যে একটা সুর ছিল, তা কিন্তু নয়।

আমি পরম বিস্ময়ে ফরহাদের মুখের দিকে চেয়েছিলাম, ও পানসে করে হেসে বলল— 'শূদ্র ভদ্র আর কায়েস্থ/ ঢুলি মালি জাতিভ্রষ্ট/ শাস্ত্রেতে ভাই আছে স্পষ্ট, বিভাগ কেন কর।' তারপর গাইত, 'ডোম চামার ঋষি মুচি এক অন্ন খাদ্য কর।' এবং একথাও উচ্চারণ করত, 'শেখ সৈয়দ মোঘল পাঠান/ নামে মাত্র এক মুসলমান/ তবে কেন এত বিধান/ রাস্তায় এসে কর। / বিয়ে শাদী হলে পরে জাতির তল্লাস কর,/ আবার মসজিদ ঘরে যেয়ে দেখি/ সব এক জামাতে নামাজ পড়॥ এই সব অসহ্য কথা শুনে বাবাকে সিধা করার চেষ্টা অনেক হয়েছে আকাশ। জানি না, বাবাকে যারা মেরেছে, তাদের পিছনে কারা আছে, পার্টি না মসজিদ!

আমি এতক্ষণে চমকে উঠলাম। পার্টি না মসজিদ! কেন এমন হবে! মন্দির এবং পার্টি তাই বা কেন হবে?

—ওহ্! ওই সেই গানটা বড়ই মধুর আকাশলীনা! আমার এই ব্রাত্যজীবনে মিলনের যে ব্যাকুলতা, তা আর কোথাও নেই। রবীন্দ্রনাথের মিলন-সাধনা শিক্ষিতের তপস্যা। আর লালনের পথ ব্রাত্যপথ লীনা!

মদিনাতে এল মহাম্মদ গোকুলেতে এল শ্যাম
ইমান খেলা খেলে রসুল লীলা খেলে ঘনশ্যাম।
হজরত আলি পাগল হল নারীর প্রেমে মদিনায়
বাঁশীর সুরে পাগল হয়ে রাধা চলে যমুনায়।

BanglaBook.org

এ তুই জানিস লীনা ! শুনিসনি কখনও ?

—না ।

—ওহ, তুই কি মেয়ে রে ! এই গানটাও শোনা নেই তোর ! বাবা গাইত । হঠাৎ গলার স্বর নেমে গেল ফরহাদের, বলল— আমি এত কথা বলছি কেন, এত কথা বলছি ! আমি কি পাগল হয়ে গেছি !

একটা বিমর্ষভাব খেলে উঠল ফরহাদের চোখে । মুঠোয় ধরা মুড়ি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল— নে । খা ।

—তুমি তো খাচ্ছ না !

—আমার পেট ভরে গেছে । চল্ এবার নৌকা ধরতে হবে । ইমান খেলা খেলে রসুল লীলা খেলে ঘনশ্যাম । হজরত আলি পাগল হল...হজরত আলি ওয়াজ এ পোয়েট । তিনি লিখেছিলেন, ভারতবর্ষে স্বর্গের মদির পুষ্প বিকশিত হয় । তবু এই আজ, দেশটা এমন হল কেন ? বলে আমার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এল ফরহাদ । আমার মাথার চুলে ঘ্রাণ নিয়ে বলল— তোর গায়ে এত মিষ্টি গন্ধ আকাশ ! কী মেখেছিস ! একটা স্বর্গ স্বর্গ ভাব ।

—আমি জানি না । কিছু মাখিনি তো ! ও, একটা সাবান হবে বুঝি !

—সব গন্ধেরই কি বস্তুজ্ঞান দরকার আছে ! বোধহয় নেই ! চ ।

—তুমি যে কী, ভেবেই পাই না ।

—পাগল ।

—বাবা তাই বলেন । তুমি বাবাকে ছেড়ে যাবে না তো ফরহাদদা !

—হঠাৎ একথা ? সাইকেল খাড়া করে গড়াতে গড়াতে থেমে পড়ল ফরহাদ ।

—কী জানি !

আর কোনও কথা বলল না সে । অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গেল । নৌকায় মাঝি নেই । দুই পারে দুই খুঁটায় দড়ি বাঁধা । দড়ি টেনে নৌকা পারে যায় । ও যখন দড়ি টেনে জলে ছেড়ে নৌকা চালিয়ে নিয়ে চলেছে ; নদীতে, তীরে, আকাশে, দিগন্তে, পথে, শস্যভূমিতে সহস্র পতঙ্গ এবং প্রজাপতি সাদা সাদা লাফিয়ে কেঁপে উড়ে যায় এবং তখন ওকে আমি নির্ভয়ে মাঝনদীতে নৌকার 'পরে পিছন থেকে আলিঙ্গন করি । ওর পিঠে গাল রেখে বলি— বাবা তোমার কথা ভাবছেন, কী কষ্ট যে হচ্ছে ওঁর ! রুদ্র নিশ্চয় সবই বলেছে !

হাতের দড়ি সহসা জলে খসে পড়ে গেল । চমকে উঠে সহসাই ফরহাদ পিছনে ঘুরে বসল । তারপর আমাকে দু'হাতে সজোরে বুকের দিকে আকর্ষণ করে আমার ঠোঁটের উপর তার মুখ নামিয়ে এনে আর্ত চাপা বিহ্বলস্বরে বলল— কী বলেছে ! বল্, কী বলেছে !

এত কঠিন করে ঊর্ধ্ববাহুর গোড়া এবং আমাকে চেপে ধরেছিল যে, আমি যেন ছিঁড়ে পড়ব মনে হল, সূর্য ঢলেছে পশ্চিমে, শীতের সূর্যে শীতলতা, একটা নিবন্ত ভাব, হাওয়া আসছে স্রোত ছুঁয়ে মৃদু মৃদু, ও আমার ঠোঁট দুটি ওর ঠোঁটে চেপে ধরল, আধ মিনিট স্থির না থেকে ছেড়ে দিল, সেই স্পর্শে আমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠল । ওর সেই অব্যক্ত ক্রোধ, বিপন্নতা, পাগলের মতো করে ওঠা, কী সেই অনুভূতি, কেন অমন করল রুদ্রের কথায়— বুঝতে পারি না ।

আমি ওর চোখের সামনে ভয়ে, ভালবাসায়— স্নেহে এবং মমতায়, তীব্র আকর্ষণে এবং ঠেলে দেওয়ায়, কেঁদে ফেলি ।

—তোকে বিশ্বাস করতে পারি ? আকাশ ! এত শোক, তবু তুই বল !

—তুমি ছাড়া কাউকে তো জানি না ফরহাদদা ! আমাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন ?

ফরহাদ নৌকোর দড়ি নৌকোর নাক থেকে টেনে নেয়। গোড়া থেকে টানতে শুরু করে। দড়ি পাকিয়ে যায়, গিঁট লাগে, নৌকো চলে না। মাঝনদীতে সূর্যাস্ত হয়। এই ঘাটে মানুষ কম। আশ্চর্য ! সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ আসে না। এটা একটি কানা-ঘাট বুঝি !

৬. ওঁং গঙ্গায় নমঃ—একটি স্থিরচিত্র

প্রতি বছরই এই জেলায় কোথাও না কোথাও বাউল-নিগ্রহ হয়। পুরনো কাল থেকেই ফকির ধ্বংস ফতোয়া জারি আছে। বাবাকে ফরহাদ একটি কথাই বেশ ক'বার বলতে চেয়েছে, মাস্কেটঅলারা শেখর আনসারির কাছে মাস্কেট কেনার জন্য অর্থ দাবি করে, অত টাকা সত্যিই ছোট চাষীর কাছে থাকে না।

শেখর আনসারি বলেছিল, ছেলে ফিরে আসুক, পাবা। ওরা শেখরের কথায় একফোঁটা গুরুত্ব না দিয়ে গোয়ালের গরু খুলে নিতে থাকে। চাষীর দোষ হচ্ছে, সে কিছুতেই গরুর অনিষ্ট সহ্য করতে পারে না। এক্ষেত্রে সব গরু চোখের সামনে দিয়ে খুলে নিয়ে চলে যাবে, ইজ্জৎ ভাবতে পারে না। তার হাল বন্ধ হয়ে যাবে, এ তার কল্পনার বাইরে। জোত-জোয়াল হারিয়ে ইজ্জৎ বাঁচতেই পারবে না। অস্তিত্বের এই ভয় থেকেই দু'হাত প্রসারিত করে শেখর আনসারি গুণ্ডাদের বাধা দিতে থাকে। শেখর গরুর গলতানি ধরে কেঁদে পড়ে বলে—এদের নিও না বাবা, নবীর কসম, আমার অথ নাই, সামথ নাই, ফরহাদ এলে দিব। যা পারি দিব। গরু গেলে আমি বাঁচব না, আমাকে মারো, গরু নিও না। মুই দিব না গরু।

ওরা যখন বাপুকে নিধন করল, চড়া গলায় হেঁকে বলেছিল, বাউলডাকে তাহলে খতম করে দে মিঞার পো। দ্যাখ, বাউল মারলে সওয়াব আছে, কেতাবে লিখা হয়েছে খাঁ সাহেব। গুখোর মুতখোর জীব, চালা মাস্কিট। কথা শেষ করে খাবার মুখে তুলতে গিয়ে থেমে গেল এবং মুখের গ্রাস হাতের মুঠোয় ধরা রইল ফরহাদের। বলল—আর খেতে পারব না নানি। মানুষ মারলে সওয়াব হয়। পুণ্যি হয়। আমার বাপ মরেছে, কারও মনে পাপবোধ নেই মামিমা। এই অপমান কী করে সহ্য করব ! ধর্মের বড় বড় ফিলজফি আমি তো শুনব না মামা !

অত্যন্ত অপ্রসন্ন এবং গম্ভীর ভঙ্গিতে দাদিমা ফরহাদের অর্ধভুক্ত ভাতের থালা মেঝের উপর থেকে সরিয়ে নিলেন। এঁটো মুখহাত ধুয়ে এসে কোমর সটান করে দোরের কাছে দাঁড়াল ফরহাদ। দাদিমা ওর হাতে জলের গেলাস তুলে দিয়ে বললেন—বাড়ি যাও ফরহাদ। বাবরি ধ্বংস হয়েছে, খুব বিপন্ন আমরা। এরই মধ্যে তুমি আর আমাদের কষ্ট দিও না। খোদার সওয়াব অত শস্তা চিজ নয় বাবা ইমাম। এই রাতেই আমি এৎকাফ নিব। আমার অসম্ভব ভয় করছে আসমানতারা। তুমি মা, আর এভাবে বাইরে যেও না। তুমি বউমা, মেয়েকে উপরে নিয়ে যাও !

আমাকে যেন ফরহাদের কাছে থেকে সরিয়ে দিতে চাইলেন দাদিমা, এখন রাত দশটা। তখন সন্ধ্যায় মাঝ নদীতে দড়ি জড়িয়ে গিয়ে নৌকো আটকে যায়। একজন পাঠান ব্যাপারি এসে কাঁচি দিয়ে খুঁটার দড়ি কেটে দিলে তবেই আমরা ফিরতে পারি। ছাগল দাগানো কাঁচি। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়েছিল, বাড়িতে উদ্বেগের সীমা ছিল না।

কিন্তু সবচেয়ে অবাক হতে হল যখন দাদিমা আমাদের পারিবারিক বিপন্নতার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে চাইলেন না, স্পষ্টত ফরহাদের বাপের মৃত্যু তাঁর কাছে দুঃসংবাদ ছাড়া

BanglaBook.org

আর কোনও গুরুত্ব পেল না। ফের এমন করে কথাটি তিনি পেশ করলেন যে মনে হল, শেখর আনসারির মৃত্যুতে তিনি কষ্ট পেয়েছেন কিন্তু তাঁর অন্তর জুড়ে ভয় ছেয়ে আছে বলে সেই মৃত্যুও আর এক নির্যাতন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি জানি, দাদিমার অসম্ভব গাম্ভীর্যই বলে দিচ্ছিল, ফরহাদের আনসারি পরিচয় মুহূর্তে দাদিমাকে বদলে দিয়েছে, ফরহাদের উপর তাঁর এতকালের স্নেহ বাবরির উত্তেজনার তাপে যেন উপে গেছে, বস্তুত বাউল-হত্যার পুণ্য কথাটি তাঁর ভাল লাগেনি।

ফরহাদের মুখ কালো হয়ে গেছে। হাতের গেলাস তার মুঠোয় ধরা রইল, সে হঠাৎ বাবার দিকে চেয়ে দেখে বলে উঠল—আমি যাচ্ছি মামা। আমি আর আপনাদের কষ্ট দেব না। চলি। গেলাস নামিয়ে রেখে দিল সে।

—শোন ফরহাদ। আমার কথা আছে। তোমার কোনও কথাই এখনও শোনা হল না ঠিক মতন। জানা হল না সব। তুমি রাগ করে চলে যাচ্ছ কেন? আমিই আকাশকে তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম।

—আমাকে দাদিমা বাড়ি যেতে বলেছেন। আমার আর সময় নেই মামা!

—একটা কথা অন্তত শুনে যাও।

—পরে আসব। কলকাতায় দাঙ্গা হচ্ছে আর এই জেলাতেও হতে পারে। রেডিওর খবর শুনে বুঝলাম, সবকৎ মুদির দোকানে, আমি আর লীনা আসছি, রেডিও বাজছিল তখন, আজ বাংলা বন্ধ গেল, কাল ভারতবন্ধ, হয়তো এই রকমই চলবে পরপর। মনে হচ্ছে... না, সবই ঠিক আছে। আমি চলি।

ফরহাদ আর দাঁড়াল না। কথাও শেষ করল না। রুদ্র ওর পিছু পিছু টর্চের আলো দেখাতে দেখাতে পথে নেমে গেল। ফরহাদ ওকে ফিরিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল দূরে।

মা আমাকে হাত ধরে দোতলার উপরে টেনে আনলেন। গম্ভীর সুরে বললেন—শুয়ে পড়। কখন কী বলতে হয় তোমার দাদিমা এই বুড়ো বয়েসেও শিখলেন না। বেচারিকে ওইভাবে চলে যেতে না বললেই কি চলছিল না! বাউল শুনেই দাদিমার মাথা গরম হয়েছে।

—তুমি কী মনে কর মা?

—কী?

—ফরহাদদার সারারাত কিভাবে কাটবে! এত অপমান করতে পারলে তোমরা?

—আমাকে কেন বলছ, দাদিকে গিয়ে বল! তুমিও কম দোষ করনি, এত রাত হল কেন? তুমি কি জানো না, মানুষ কীভাবে মরছে, মেয়েদের নিরাপত্তা বলে কিছু আছে? গ্রাম দেখা কি শখের জিনিস নাকি! তুমি কি জানো না গ্রাম কী?

—না।

—তুমি বুঝলে না? এত যে দেখলে...

—হ্যাঁ।

—একবার না, একবার হ্যাঁ, কী বলতে চাইছ তুমি লীনা?

—ধর্ম কী মা?

মা এবার আশ্চর্য হয়ে হ্যারিকেনের ডাঁটি ধরে আমার মুখের কাছে আলো তুলে ধরেন। আমি বালিশে মাথা রেখে শুয়েছি। চরম বিস্ময় প্রকাশ করে মা বললেন—তোমার কী হয়েছে!

আমি কোনও কথা না বলে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। তারপর অদম্য কান্না এল আমার। প্রথমে বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা এসে গলা রোধ করে ধরল। কান্নার

BanglaBook.org

রেণু সমস্ত দেহে চারিয়ে গেল, শরীর কেঁপে উঠল। কিছুতেই দমাতে পারি না। শোক, ক্ষুধা আর প্রণয় মিলে একটি অপূর্ব মূর্তি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। আমার ঠোঁটে লেগে আছে ভালবাসার তীব্র স্বাদ, আমার প্রস্ফুটিত বুকে লেগে আছে ফরহাদের শোক এবং কামনা।

তোকে আমি বিশ্বাস করতে পারি! আকাশ?

একথা মনে হওয়া মাত্র বুকটা একটি ভারী ঘর্ষণে যেন মুচড়ে ভেঙে পড়তে চাইল। গলায় কান্না শব্দ করে উঠল, ফিনিক দিয়ে শরীরে শোণিত-শিরা জ্যোৎস্নায় ভরে গেল আর অঘ্রানের শস্যঘ্রাণ মাতাল হয়ে বইতে থাকল। তখন একটি শীতের কোকিল ডেকে উঠল কোথাও।

মানুষের ধর্ম এবং জাত যৌনতা-সন্নিহিত। মানুষকে উলঙ্গ করে দেখা হয় মানুষের জাত কী? রুদ্র সেকথা ভোলেনি। মা সেই অপমানে কেঁদেছেন। দাঙ্গায় শুনেছি, মানুষের যৌনাঙ্গ দেখে ধর্ম নির্ণয় করা, সম্প্রদায় শনাক্ত করা এবং অতঃপর ছুরি বসানো—এইভাবে চলে হিংসার ঐতিহাসিক উৎপাদন। একটা মানুষকে মস্তানি হত্যালীলায় মাস্কেট বিদ্ধ করে বোঝানো হয়, অন্ত্যজ হত্যায় পাপ নেই।

আমি জানি, আবার গুলির আওয়াজ ভেসে উঠবে। মুস্তাফা কিছু আগে বলেছে, চক-সরষেতলায় রাত্রে আজ বাজি পুড়বে, বাবরি ধ্বংসের আনন্দে মহোৎসব হবে। কলকাতায় দাঙ্গা বেধে যাবে, এই জেলা দাঙ্গায় ধসে যাবে। বাতাসে হু হু করে গুজবের বৃশ্চিক ছুটে মরছে।

বাবা নীচের থেকে উপরে উঠে আসেননি। খাননি। রুদ্রর ডাকে সাড়া দেননি। মা ডাকলে বিরক্ত হয়েছেন। দাদিমা এৎকাফ নিয়েছেন। দাদিমা তাঁর খোদাকে ডেকে ডেকে বলছেন, খোদা তুমি রক্ষা কর। বাবা একেবারে মূক হয়ে গেছেন।

ধর্ম কী মা, প্রশ্ন এবং তারপর আমার কান্না—অতএব সহজ হয়ে যায়। মা বুঝতে পারেন, আমি কেন কাঁদছি। গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলেন—কেঁদো না। তুমি একদম কাঁদবে না। চুপ করে থাকো।

—ও আমাদের আর কষ্ট দেবে না মা! ফরহাদদা... দেবে না কখনও।

—তাহলে কষ্ট পাচ্ছ কেন? চুপ করতে পার না? জাতের অপমান সইবার অভ্যাস ভারতবর্ষের মানুষের আছে। নাও, চুপ কর। ঘুমোও। তোমাকে যাতে দুঃখ সইতে না হয়, সেই ব্যবস্থা আমিই করব কারণ তুমি আমার মেয়ে। শুধু মাত্র আমার। তুমি কারও নও। তুমি আমার কলঙ্ক। আমি তা মোচন করব। আমিই করব, হ্যাঁ, আমিই করব।

মায়ের হঠাৎ এই উত্তেজনা দেখে আমার কান্না স্তব্ধ হয়ে যায়। আমি তাঁর কলঙ্ক একথা এই প্রথম মায়ের মুখে উচ্চারিত হতে শুনি। মা শেষে মুখে আঁচল চেপে কেঁদে ফেলেন। আমি তখন নেমে পড়ি বিছানা থেকে। প্রশ্ন করি—তুমি কী করবে মা! আমায় মেরে ফেলবে?

—তুই আজ একথা বলতে পারলি আকাশলীনা! আমি কি তাই বলেছি? হায় ভগবান!

—মা! তুমি কি দাদিমাকে ঘৃণা কর মা?

—ও। তুমি তাই বুঝেছ বুঝি! তুমি আমারই নাড়ি ছিঁড়ে আমার কোলে এসেছ! কখনও বুঝবে না মায়ের কষ্ট। তোমার জন্য কলঙ্কিত হয়েছি আমি, তা-ও তুমি বুঝবে না!

—আমার কাছে কী চাইছ তুমি? কী চাও তোমরা? ঘৃণা তো সহজ মা, ভালবাসাই

BanglaBook.org

কঠিন।

—আমি ঘৃণা করি না আকাশলীনা। ইমামকে ভালই বেসেছি শুধু। আমি বিপ্লব বুঝে তোমার বাবার জীবনে আসিনি। ভালবেসে শেষ হয়েছি।

—তা হবে। অনেক সহ্য করেছ মা! এবার কলঙ্ক মোচন কর। বাবাকে আর কী দরকার! এখন তো ওঁকে বইতে হচ্ছে তোমায়। খেতে পরতে দাও, তুমিই দাও।

—একথা কখনও আমি বলেছি? তুমি তো ভারী সেয়ানা হয়েছ। এসব কথার মানে কী?

—বাবা কষ্ট পাচ্ছে মা! আমি নীচে যাচ্ছি! বলে আমি নীচে বাবার কাছে নেমে আসি। বাবা চুপচাপ চেয়ারে বসে আছেন। মেঝেয় একটু দূরে হ্যারিকেনের মৃদু আলো তাঁকে মূর্তির মতো অবয়ব দিয়েছে। আলোয়-আঁধারে। কাঁধ স্পর্শ করামাত্র তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে সচকিত হলেন।

অত্যন্ত নরম আর নিরাশ্রয় গলায় উচ্চারণ করলেন—মা!

শুধালাম—তুমি খাবে না বাবা?

বাবা বললেন—ফরহাদ কি খেতে পারল! একটা রাত না খেলে কী হয়? ভালই হয়, বয়েস হচ্ছে।

—উপরে যাবে না?

—ঘুম যে আসছে না আকাশ! তুমি ঘুমোওনি কেন? অবশ্য তোমারও ঘুম আসার কথা নয়। মায়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল?

—হ্যাঁ।

—কী কথা?

—আচ্ছা বাবা, একটা জাত আর একটা জাতকে ঘৃণা করে কেন? এত জাতে ভরা এই দেশটা, এত সম্প্রদায়, এত ধর্ম! ঈশ্বরের ধর্মে মানুষ এত উঁচু নিচু, ছোট, বড়—কেন? আর তুমিই বা কোনও ধর্ম পালন কর না কেন?

—তোমার কথার মধ্যেই তোমার প্রশ্নের উত্তর আছে কিছুটা। পৃথিবীতে এমন কোনও ধর্ম নেই যাতে নারী আর পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলেছে। পুরুষের বাঁ পাশের বাঁকা হাড় দিয়ে নারী গঠিত—এই কথাটি কোরানেও পাবে তুমি। এই রকম একটা অতি অবৈজ্ঞানিক ধারণা, একটা অলৌকিক কেচ্ছা, সত্যি বলতে কি আধুনিক মানুষ মেনে নিতেই পারে না। ধর্মও মানুষের একটি স্পিরিচ্যুয়াল প্রোডাকশন—মানুষের মাথা থেকেই যুগে যুগে নানান ধর্মের উৎপত্তি। ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করলেন, নাম আদম। এমনকি 'কুন' উচ্চারণ করলেন খোদা, অর্থাৎ বললেন হোক, তাই হল। কী হল? সাত দিনে জগৎ সৃষ্টি হয়ে গেল। লেট দেয়ার বি লাইট, দেয়ার ওয়াজ লাইট। আলো হোক, তাই আলো হল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের বাসনা দ্বারা উদ্ভূত। কী বিস্ময়কর ঘটনা!

—এ আমি জানি বাবা!

—তাহলে আমারই বাঁ পাশের হাড় দিয়ে তোমার মাকে ঈশ্বর গড়েছেন—কী বল? আমি বলি কি, ঈশ্বরের অভিপ্রায় না থাকলে, প্রজাপতির অভিলাষ না থাকলে, স্বর্ণদীপার সঙ্গে আহসান ইমামের শাদি অসম্ভব। সম্প্রদায়কে, পুরুত মোল্লা প্রভৃতিকে বোঝানো যায় না কেন? পৃথিবীর সবচেয়ে অযুক্তির নাম ধর্ম। পদে পদে ধর্ম আমাদের সে কথা বুঝিয়ে চলেছে। অযোধ্যায় গতকাল যে ঘটনা ঘটে গেল তার যুক্তিটা হল বাবরি মসজিদের মধ্যে ঈশ্বর রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কারণ ওটা গোড়ায় ছিল রামমন্দির, কারণ জায়গাটা অযোধ্যা।

BanglaBook.org

—বাস্তবিক, এ তো ইতিহাসের ব্যাপার।

—কোনটা ইতিহাসের ব্যাপার ? বাবরি মসজিদ গোড়ায় কী ছিল, মন্দির ছিল কি না, ওখানে রামের জন্ম কি না—হ্যাঁ এসবই ঐতিহাসিকের কৌতূহলের বিষয় হতে পারে। কিন্তু সেকথা শুনছে কে ? কলকাতায় গত মাসে এক কলেজ-অধ্যাপক, প্রৌঢ়, হঠাৎ আমাকে বললেন, আপনারা হিন্দুদের ওই মসজিদটা ছেড়ে দিলেই তো গোল চুকে যায়। কী সরলমতি লোক। এই লোক ছাত্র মানুষ করেন। অবশ্য হাসতে হাসতে কথা বলছিলেন বেচারি। ভাবখানা এমন যে, তিনি আমার সঙ্গে চমৎকার রসিকতা করতে পেরেছেন।

—তুমি কী বললে ?

—বললাম, ধরে কে রেখেছে বলুন তো ! প্রৌঢ় বললেন, কেন পাকিস্তান তো বলছে...তাছাড়া আপনারা পাকিস্তান ক্রিকেটে জিতলে কেমন করেন ? বাজি পোড়ান না ? কথা কি, মুসলমানদের যথেষ্ট তোল্লাই দেওয়া হয়েছে, অযোধ্যার ঘটনা হল তারই রিঅ্যাকশন। প্রৌঢ় বললেন, এসব কিন্তু আমার কথা নয় মশাই। ট্রেনে আসতে আসতে শুনছিলাম, পাবলিক ডায়ালগ। তা, আমি চুপ করে আছি দেখে, প্রফেসর বললেন, চুপ করে রইলেন যে ! তখন বললাম, আমার ভারী কপালের দোষ মশাই, জেল খেটে খোঁড়া হয়েছি, আমার ফের মন্দির-মসজিদ কিছুই নেই। হকচকিয়ে গেলেন কলেজের মাস্টারমশাই। উৎকট হেসে ফেলে বললেন, আপনার একটাই বিবি তাহলে ? ছেলেমেয়ে কয়টি ? আচ্ছা, মুসলমানরা...আপনার কথা বলছি না, তারা চারটি বিবি করেন কেন ? গণ্ডা গণ্ডা ছেলেপুলে...বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশ...এই সব অস্বীকার করতে পারেন ? ম্যালথাস বলেছেন, নিবারক বাধা...হয় যুদ্ধ নয় মহামারী, মুসলমানদের জন্য আমরা ভুগব কেন ?...শুধালাম, কথাটা আপনার না পাবলিকের ? উনি সেকথায় কান না দিয়ে বললেন, আচ্ছা সলমন রুশদির স্যাটানিক ভার্সেস বইটা কেমন ? ভাল ? খুব নিরীহ গলায় জিজ্ঞাসা।

—তুমি কী বললে ?

—বললাম, জানি না। আমার বাবা রেলে চাকুরি করতেন। কবি নজরুলের ভক্ত ছিলেন। ছুটিছাটায় গ্রাম চাঁদপুরে ফিরতেন। সেই সময় বিহারের কাটিহারে থাকেন। গাঁয়ে এসে নামাজ পড়তেন। জুম্মার নামাজ থেকে ফিরছেন, মাথায় টুপি, কপালে সিজদার দাগ। পুরনো আমলের গ্র্যাজুয়েট। গ্রামের মানুষ বেজায় সম্মান করত। তা সেই বাবা যখন জুম্মা সেরে মসজিদ থেকে বার হয়ে পথে নামতেন, তখন আশ্চর্য ঘটনা ঘটাতেন ; পথের পাশের ঝুলন্ত জবা ছিঁড়ে নিয়ে কানে গুঁজতেন। আর গুনগুন করে নজরুল গীত ধরতেন। কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন। লোকে সম্মানবশে চুপ করে থাকত। ঘটনার শেষাংশ আরও অদ্ভুত। উনি কানে গোঁজা জবা বিসর্জন দিতেন ওই পাম্পসেটটার মাথায়, ফুল চড়াতেন, কেন জানো ?

বাবা এবার এক মিনিট নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। আমি এমন ঘটনা কখনও শুনিনি। আশ্চর্য হয়ে বললাম—ওই পাম্পসেট বাবা ? ওটা তো অচল এখন। ওই মডেল ইদানীং কিনতে পাওয়া যায় না। কোম্পানি উঠে গেছে বোধহয়।

—হতে পারে। মেশিনটার নাম গঙ্গা। এই নামটার জন্যই বাবা ফুল চড়াতেন ওটার ওপর। মেশিনটা জল তুলত হড়হড় করে, এখন অচল, কিন্তু বাবার কালে ফোয়ারার মতন ঢালত। হেদিয়ে জল দিত। সেই গঙ্গায় বাবা জবা চড়িয়ে বাড়িতে ঢুকে যেতেন, টানা বারান্দায় প্রকাণ্ড কাছিমের মতন পড়ে থাকত যন্ত্রটা।

—তুমি কখনও বলনি।

—বইয়ের দোকানে বসে কথা হচ্ছিল প্রফেসরের সঙ্গে। বললাম, আপনি খোঁজ নিতে পারেন, গঙ্গা নামের পাম্পসেট ছিল কি না! গাঁয়ে গিয়ে দেখে আসতে পারেন, পথের পাশে জবা ঝুলে এসে সরণি আলো করে থাকে কি না, এমনকি চাঁদপুরের মসজিদের গায়ে জবাগাছ এখনও আছে। ফুল দেয়। খালি আমার বাবা আজ নেই। শুনুন স্যার! বাবার আমিই একমাত্র সন্তান, মা আমার একটি। বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করেননি। তবু...

—বল!

—ফরহাদটা না খেয়ে চলে গেল। আমি সেই তখন থেকে দরজার ওপারে মেশিনটা দেখছি চেয়ে চেয়ে। ভয় হচ্ছে পাকিস্তানে যদি মন্দির ভাঙা শুরু হয়! যদি বাংলাদেশে মন্দির পোড়ে, এখানকার সংখ্যালঘুর কী হবে! আমি তো কাউকে বোঝাতে পারব না—আমি হিন্দু নই, আমি মুসলমান নই, ধর্ম-নিরপেক্ষ। আকাশলীনা, আমরা সংখ্যালঘুর ভিতরের আরও এক সংখ্যালঘু।...চিন্তার জগতেও প্রায় একা। রাশিয়া এবং চীনের সমাজতন্ত্র পড়ে যাওয়ার পর আমার নিঃসঙ্গতা আরও বেড়েছে। শুধু কতক থিওরি ছাড়া আমার সামনে আজ আর কিছুই নেই।

—আমি আছি বাবা!

—হ্যাঁ, আছ বইকি মা। তুমি আমাকে অধিকার দিও, যাতে আমি আমার কথাগুলি অন্তত তোমাকে বলতে পারি। দ্যাখো ফরহাদ একা হয়ে গেছে। ও চিন্তার জগতে আমার চেয়েও সঙ্গীহীন। ওর অস্তিত্ব আরও বিপন্ন। আমার কাছে ও আসে শুধু কথা শুনতে। একটি বিশ্বাস ওকে আমি দিয়েছি, বলেছি, তোমার উন্নত মস্তিষ্ক সব জয় করতে পারে। এটাও তত্ত্বকথা, তবে তার বাস্তব দৃষ্টান্ত আছে।

—তুমি?

—না, আমি ঠিক বড় কোনও দৃষ্টান্ত নই। তবে হ্যাঁ, তোমার মা আমার বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। উন্নত চিন্তা কোনও কোনও মেয়েকে আকর্ষণ করে বইকি। উৎকৃষ্ট চিন্তা ধন-দৌলত রূপ এবং আধিপত্যের চেয়েও আকর্ষণীয় হয়, যদি সংসারে মানুষ থাকে। উৎকৃষ্ট চিন্তা দাতব্য জিনিস, ওটা মাগনা দিতে হয়। যে গ্রহণ করে, বদান্যতা তারই, ওই যে রবীন্দ্রনাথের চমৎকার কথাটি। তুমি জানো আকাশ।

—কী?

—'গ্রহণ করেছ, যত ঋণী তত করেছ আমায়।' আমার চিন্তা একদিন গ্রহণযোগ্য হয়েছিল; আমার নেতৃত্ব। তোমার বয়েসী ছেলেমেয়ে সেই চিন্তার সাহচর্যে এসে প্রাণ পর্যন্ত দিয়েছে। এই তো সেদিনের কথা। আমার কোনও অহঙ্কার নেই মা।

—জানি।

—তুমি কি মনে কর না, ফরহাদের মস্তিষ্কটা অনেক মূল্যবান! কর নিশ্চয়। আমি উন্নত মস্তিষ্ক এবং নিরহঙ্কার হৃদয়ের পূজা করি আকাশলীনা। জ্ঞান দিচ্ছি না তোমাকে, কিন্তু তুমিও তা-ই-ই করবে। আর চরিত্র হচ্ছে জ্ঞানের পিলসুজ। ওটা ছাড়া জ্ঞান দাঁড়ায় না। ফরহাদের হল চাষীর হৃদয়। অকপট সরল। আর মাথাটা প্রখর জ্ঞানীমানুষের। জাত ওকে আড়াল করতে পারে না। কখনওই পারে না।

বাবার কথা শুনতে শুনতে আমার হৃদয় এক তীব্র আলোয় ভরে উঠছিল। প্রতিটি শব্দ আমাকে সোনার ধাতু-ফলকে কর্ষণ করছিল। প্রতিটি শব্দেরই ছিল স্পর্শময়তা, যেন আমার নবীন যৌবনকে সোহাগ দিচ্ছিল, নদীর স্রোতের উচ্ছলতা যেভাবে তটে এসে ভাঙে, সেইভাবে আমি ভাঙছিলাম।

BanglaBook.org

নিবি, নে। কেটে নে। মাথাটা যেন এই স্বল্পালোকিত ঘরে এগিয়ে এল আমার বুকের কাছে। ফরহাদ বলেছিল, কী করবি এই মাথাটা নিয়ে ? বলেছিল, নিবি তো নে। আমি তোকে দিচ্ছি। সে কথা কখনও ভুলিনি আমি। ও জানেও না, আমার বুকের মধ্যে সেই মাথাটি যখন এসে আশ্রয় চাইবে, তখন আমার ভালবাসার হৃদয়ে একটি মেধাবী যুবকের মস্তিষ্ক ডুবে যাবে। সে বোঝেও না, একটি নারী আসলে জ্ঞানকে তার ভালবাসা দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চায়, এই-ই তার শ্রেষ্ঠ আলিঙ্গন।

ও সে কথা জানবে না কখনও, ওর সেই উন্নত মস্তিষ্ক আমি কেন তার কাছে চেয়েছিলাম। ও যে কী বোকা ! একদম বোঝে না। হঠাৎ আমি বাবার চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে আমার গাল আলতো করে রেখে গলা জড়িয়ে ধরি, তখন অজান্তে দুই চোখ ভরে যায়।

বারবার সেই একটা কাল্পনিক দৃশ্য আমার হাত-আয়নায় প্রতিফলিত হয়। উপচে উপচে যায় সেই দৃশ্যটা। ফরহাদকে আমি দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আমার বুকে ওর মাথাটা টেনে আনি। আমার কোমল স্নিগ্ধ বুকের মধ্যে ও মুখ গুঁজে যে আশ্রয় এবং সুগন্ধ পায়, যেভাবে স্ফীত হয় ওর বুকের নিঃশ্বাস, তার হৃদয় যেভাবে পূর্ণ হয়—এই আয়না ছাড়া কোথাও তা রচিত হয়নি। ও একদিন আয়নার দৃশ্যের মতো আমাতে ডুবে যাবে, ও নিজেকে সম্পূর্ণ করবে আমাতে, একটি প্রজ্ঞাস্থির ভালবাসা পাব আমি। আর তো কিছু চাই না, আর কী চাইব জীবনের কাছে, আমি শুধু ভালবেসে শেষ হতে চাই মা ! তোমার মেয়ে আমি, আমি কলঙ্ক তোমার।

তোমার অবিকল আদল, চোখদুটি, থুতনি, গ্রীবা এমনকি বুকের গঠন তোমারই। ভুরু-ভঙ্গিমায় তোমারই অহঙ্কার মা ! উন্নত নাসিকায় তোমার সৌষ্ঠব, গ্রীবায় তোমার প্রসন্ন ঔদ্ধত্য, স্তনসন্ধির মাঝে সুর্মা-জড়ুল তোমারই দান। তুমি যদি পার মা, শুধু ভালবাসায় শেষ হয়ে যেতে, আমি কেন পারি না ?

একদিন দুপুরে ছুটির দিনে, স্নানের পর মা আমার মাথার চুল আঁচড়ে দিতে দিতে সহসা গায়ের কাপড় সরিয়ে দিলেন। কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলেন শাড়ির আঁচল। ওঁর হাতের আঙুল কী চাইছে, বুঝতে পারছিলাম না। আমার গায়ে জামা ছিল না। ছিল শুধু সুতির ছাপা শাড়ি।

—মা ! তুমি কী করছ ?

—শোন ! তোমাকে আমি দেখব ! এমনই মিষ্টি স্নেহে বলে উঠলেন তিনি।

আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে গেছি। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় মা ও মেয়ের প্রতিচ্ছায়া পড়েছে। আমার ঊর্ধাঙ্গ নগ্ন হয়ে উঠেছে। আমার বুকের উপর রাজ্যের লজ্জা নেমে এলেও মায়ের চোখে জিজ্ঞাসা আর্ত হয়ে ফুটেছে, স্নেহের আশ্চর্য ক্ষুধা জ্বলজ্বল করছে। মা বলেন—'এ দেহ আমারই লীনা। আমারই।'

আরও বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে, যখন মা তাঁর নিজের শরীর থেকে কাপড় ফেলে দিয়ে নিজেকে নগ্ন করে ফেলেন। তারপর বলেন—দেখো, তোমাতে আমাতে কোনও পার্থক্য নেই।

মায়ের আঙুল আমার বুকে জড়ুলের কাছে এসে থামে। মা বলেন—এই দ্যাখ্ লীনা। এই জড়ুলটাও একই। সিমিলার। আমার এখানে, হুবহু একই জায়গায়। ছেলেবেলায় তোকে স্নান করানোর সময় মাথায় জল ঢেলে দিতে দিতে ভাবতাম, তুই কে ?

বলেই মা আচম্বিত প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন—মা ! তুই কোন্ ভাগ্য করেছিস আকাশলীনা ! কেন এমন হবে ! বলতে বলতে আমাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন।

BanglaBook.org

চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল ঝরে পড়ল।

নগ্ন সেই দ্বিপ্রহর, নগ্ননির্জন দুটি নারীদেহের আলিঙ্গন ভারী আশ্চর্যের, মায়ের ওই কান্না কিছুতেই ভুলতে পারি না। দুটি দেহের এত মিল, এত সাদৃশ্য, এতই অনুরূপতা কেন ? দু'জনের স্বাস্থ্য-সাম্য এক নয় বটে, কিন্তু জড়ুলের মাত্রা, স্তনের উপর ছড়িয়ে এসে অধিকার-আকাঙ্ক্ষা সম-মাত্রিক, সন্ধিস্থল থেকে বাঁ-স্তনের দিকে চারানো। বুকের উপত্যকার ডৌল এবং কাঁধের বিস্তার একই রেখায় শিল্পিত। কিন্তু কেন ?

—তুমি আমাকে অস্বীকার করতে পার না লীনা !

—কখনও তো করিনি মা !

—আমি যা চাইব, তাই হবে !

—কী হবে ?

—রানী কৌশল্যা রাজা দশরথের কাছে বর চেয়েছিলেন, মনে আছে ?

—তুমি কী চাও ?

—তুমি দিলে তবে চাইব। বর নয়। সে কেন দেবে তুমি ? আমি চাইব, আমার একটি বাসনা আছে। আমার চোখের জলের তোমার কাছে কোনও দাম নেই পোড়ারমুখি ! আমি তোর মঙ্গল চাই না ?

—কী বলতে চাও বল না ! বলে গায়ের কাপড় গুছিয়ে নিতে গিয়ে থমকে চেয়ে থাকি আয়নার দিকে। তখনও মায়ের দুই চোখ ভরা। সেই নগ্ন বিষণ্ণ মূর্তিটি দেখে আমার অন্তর অভিভূত হয়ে পড়ে। মাকে কেমন অসহায় দেখায়, দুঃখী দেখায়, কাঙালের মতো লাগে। মায়ের নগ্ন শরীরের কান্না আমি সহ্য করতে পারি না। তিনি কেন এভাবে নিজেকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে চান, কেন এভাবে নগ্ন করেন আমাকে ?

—আমি প্রার্থনা করব তোমার কাছে।

—মানে ?

—আমার ইচ্ছে আছে, তুমি পূর্ণ করবে !

—কী ?

—বলব একদিন।

—আজই বল।

—না। নীচে বোধহয় ফরহাদ এল। যাও।

—কোথায় ?

—ওর সঙ্গে দেখা করবে না ?

—অ। আচ্ছা, ঠিক আছে ! বলে আমি গায়ের কাপড় আরও যত্নে গুছিয়ে তুলি।

আমার গোল আয়নায় মায়ের নগ্ন হৃদয়ের সজল ছায়া ভেসে ওঠে। এ ভারী কাব্যময় ছবি, কিন্তু বিদীর্ণ। কীভাবে লিখব ওহে শান্ত মুকুর, কী হবে আমার !

—বাবা ! তুমি শোবে না ? চল উপরে।

—এখানেই থাকি। তোমার দাদিমা একা রয়েছেন এৎকাফে। তুমি যাও ! শোন, ফরহাদ কি তাহলে আসবে না আর !

আমি কথা না বলে ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উপরে চলে আসি। এসে খাটে চেয়ে দেখি মা বালিশ আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। অবাক লাগে বটে, কিন্তু বুঝতে পারি, আমারই আঘাতে মা কেঁদে চলেছেন।

মায়ের পাশে চুপচাপ শুয়ে পড়ি। মাকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে হয়। ওঁর কান্না এক সময় আপনা থেকে থামে। হঠাৎ হ্যারিকেন হাতে রুদ্র এ ঘরে এসে দাঁড়ায়। আলোর জোর

নেই। ওর মুখ রহস্য-ব্যাপৃত। ও একটা ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

—স্বরূপগঞ্জের বাস-স্ট্যাণ্ডে ভারতী আচার্যের সঙ্গে দেখা হল মা।

—কে! বলে চমকে নড়ে বিছানায় উঠে বসলেন স্বর্ণদীপা।

রুদ্র বলল—ভারতী আচার্যি। সেই যে তোমার কাছে আসে। দেখলাম একটা সরকারি জিপে করে যাচ্ছে, গাড়িঘোড়া বন্ধ, ওটা পি. ডব্লু. ডি-র জিপ বোধহয়।

—হ্যাঁ। কী বলল?

—আসবে বলল। গাড়ি ঘোড়া চললে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে, রোববার-টোববার দেখে আসবে। মিউচুয়াল সেটলমেন্ট হতে পারে। অনেক দূর এগিয়েছে কাজ। ওর কমিটি, মানে স্কুলি-কমিটি রাজি হয়েছে, এখন তোমার ম্যানেজিং কমিটির তৎপরতা দরকার, তাছাড়া তো হবে না। তুমি রাজি করাতে পারবে? তা হলে হয়ে যায়।

—হবে বলছিস?

—কেন হবে না? মিউচুয়াল ট্রান্সফার হয় শুনেছি। দু-একটা কেস আছে নাকি! তবে অনেক কমপ্লিক্যাসিও আছে। তা হোক। তুমি চেষ্টা কর। বলে রুদ্র আর দাঁড়িয়ে না থেকে পাশের ঘরে শুতে চলে গেল। মা অনেকক্ষণ শিথিলভাবে বিছানায় বসে রইলেন চুপচাপ। তারপর হঠাৎ বললেন—আলোটা নিবিয়ে দে লীনা। বলেই তিনি কীসব ভাবতে ভাবতে বিছানায় পড়ে গেলেন। খানিকটা কুঁকড়ে শুয়ে রইলেন চোখ বন্ধ অবস্থায়। ঘুম এল মায়ের।

৭. পেয়াদার সাইকেল চড়া এবং 'আদিগন্ত নগ্নপদধ্বনি'

তিনদিন পর। রাত্রে একবারে শেষের দিকে আমার চোখ দু'টি জুড়ে এসেছিল। মা ভোরে আমাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিলেন। এবং বললেন— চান করে নাও। তোমাকে সঙ্গে করে একটা জায়গায় নিয়ে যাব। তুমি যাবে।

— কোথায় মা?

— সে তুমি চলো আগে।

— আগে বলবে না?

— না।

— ঠিক আছে। কিন্তু ট্রান্সফার কিসের মা? ভারতী আচায্যি কে?

— তুমি তাকে দেখেছ।

— কবে?

— এই বাড়িতে দু'একদিন এসেছে। ছোট্টখাট্টো মানুষ। গোল ছাঁদের মুখ। ফর্সা।

— ও।

—তুমি তাকে দেখেছ, একটু রোগা। সব সময় মুখে একটা ব্রণ পেকে ওঠে। লাল হয়ে থাকে, গোড়াটা। আর দাঁতের উপরে একটা দাঁত.... কী বলে, উপরের পাটিতে, মানায় বেশ। মনে পড়ছে?

— কুকুর দাঁত....

— কী বললে, মানুষের মুখে কুকুর দাঁত কোথা থেকে আসবে?

— ওটাকে কুকুর-দাঁতই বলে মা। গ্রামের কথা কিনা! একটার পাশ ঠেলে আর একটা...

— ও। কুকুরই হোক আর ছাগলই হোক, মানায় কিনা দেখতে হবে।

— আমি দেখিনি।

— দাঁত অনেকের বিউটি-স্পট হতে পারে, কখনও ভাঙা, কখনও বাঁকা, জড়ানো— সবই হয়। যেমন তিল।

— তা, ওর সঙ্গে তোমার কী ?

— আছে। আমরা মিউচুয়াল ট্রান্সফার চাই। ও আসবে নিমতলা, এখানে। আমি যাব বাঘাযতীন, কলকাতা। ব্যাস ! আমার জীবনের একটা সাধ পূর্ণ হবে আকাশলীনা ! তুই আমাকে সাহায্য করবি না ?

— আমি সাহায্য করব !

— হ্যাঁ। করবে বইকি !

আমি চরম বিস্ময়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকি। অদ্ভুত চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে মায়ের মধ্যে। চাপা প্রসন্নতা চোখেমুখে রৌদ্র-প্রান্তরের ছায়ার মতো ভেসে যাচ্ছে।

স্নান করার পর মা নিজে হাতে আমাকে সাজালেন। অতিরিক্ত এই যত্ন মায়ের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু আজ যেন বিশেষ যত্নের একটা বাড়াবাড়ি ছিল।

— কনের মতো করে সাজাচ্ছো বুঝি ! এত সময় ধরে সাজতে আমার ভাল লাগে না।

— মেয়েদের সাজটাই তো আসল।

— তুমি বলছ ? মা, তুমি কি পাগল হলে ?

— না, লীনা। একটা জায়গায় যাচ্ছি কিনা ! কোথাও একটু ইম্প্রেসন খারাপ হলে চলবে না।

—বেশি সাজালে ইম্প্রেসন খারাপই হবে। তুমি কী ? আমি সব মুছে ফেলে দেব। নাও, সরো তো ! আমাকে নিতে দাও। আমিই করছি যা করবার। ইস্ ! এভাবে পথে নামা যায় নাকি ! শোন মা, এ রকম সেজে বার হচ্ছি, যদি কারও সঙ্গে দেখা হয়...

— ওহ্ ! লীনা !

— কেন ?

— চুপ কর। কারও সঙ্গে দেখা যদি হয়ই হবে। তা বলে আমরা সাজব না ? ওহ্, ফরহাদ ! তার কথা বলছ ?

— তুমি কি তার কথা একটুও ভাবনি ? বল ? কষ্ট পাওনি ? ও কেমন হয়ে গেছে মা ! এলই না।

মা কোনও কথা না বলে সরে চলে গেলেন। মনে মনে বললাম, ভগবান, ওর সঙ্গে আমার যেন পথে দেখা না হয়। মা আমাকে নিয়তির মতো কোথায় টেনে নিয়ে চলেছেন, কিছুই জানি না।

হঠাৎ-ই মা নিজেকে নিখুঁত যত্নে সাজিয়ে তুলে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি আমার সজ্জা এবং অলঙ্করণকে স্বাভাবিক এবং স্বল্পবর্ণ করে নিয়েছিলাম। মা তির্যক চোখে আমাকে জরিপ করে বললেন— ভাল করলে না !

— যথেষ্ট মা। আর অত্যাচার কোরো না।

— অত্যাচার ! তাহলে শুনে রাখো। আমি সারারাত আমার নিজের কথা ভেবেছি। কারও কথা মনেও আসেনি। তোমার কথা নয়, রুদ্র নয়, ইমাম নয়। ফরহাদের কথা আমি কেন ভাবব ? আমি আজ আমার কথাই ভাবি। হ্যাঁ, ভাবি। আমি কলকাতা ফিরতে চাই আকাশলীনা। এই গ্রামে কেন পড়ে থাকব ?

— থাকবে না ?

BanglaBook.org

— না। কক্‌খোনো না। আমি ফিরতে চাই।

— কোথায় ? কলকাতায় ?

— হ্যাঁ। নিশ্চয়।

— কেন ?

— কেন মানে কী ? ফিরব না ? ফিরতে পারি না বলছ ?

— ফিরে কী করবে সেখানে ?

— বাঁচব।

— এখানে কি তুমি মরে আছো ?

— সেকথা তুমি বোঝো না ? আমি হাঁপিয়ে উঠেছি। আমার আর ভাল লাগে না। কিছুতেই ভাল লাগে না। কারও জন্য কষ্ট পাওয়ার মনটাই শেষ হয়ে গেছে। কষ্ট যে পাব, শক্তি কোথায় ? অভিশপ্ত চম্বল। গ্রাম, চম্বল এখন। এখানে কেন থাকব, কেন ?

চোখ দুটি মায়ের ভারী হয়ে আসে। আমি আর দেরি না করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাই। মা আমার পিছুপিছু নেমে আসেন। তিন চারটি রাত্রি বাবা ভাল করে ঘুমাননি। খাননি। ফরহাদ আসেনি আর। বাবা মূর্তিরই মতন ওই ইজি চেয়ারে পড়ে রয়েছেন। রাত্রি জাগরণে বাবার চেহারায় ছাপ পড়েছে। আমাদের এভাবে বার হতে দেখে ঈষৎ বিস্ময় আর উদ্বেগের সঙ্গে শুধালেন— কোথায় যাচ্ছ, তোমরা !

মা গম্ভীরসুরে বললেন— আমাদের কাজ আছে।

তারপর মা দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন— সকালেও কি কিছু মুখে দেবে না ঠিক করেছ ! উপরে খাবার ঢেকে রেখে গেলাম। রুদ্র রইল। বলে মা দাদিমায়ের রুদ্ধদ্বার ইস্তেকাফ-গৃহের দিকে শক্ত চোখে চেয়ে দেখলেন।

আমাকে মা মুখে জোর করে গুঁজে গুঁজে খাইয়েছেন। আমি খেতে না চাইলে অত্যন্ত অপ্রসন্ন আর চাপাসুরে বলেছেন— জেদ কোরো না। খেতে হবে তোমাকে। বাপ আর মেয়ে মিলে আমাকে জব্দ করবার চেষ্টা করছ, না ?

স্বরূপগঞ্জে এসে দোকানপাটগুলোর দিকে তৃষ্ণার্ত চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম, এত সকালে ফরহাদ এখানে আসবে কেন ? অথচ মা-ই বা কেন তখন বললেন, ফরহাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে, হলেও হতে পারে ! আমার এই অদ্ভুত আচ্ছন্নতা মায়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে, কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছিল, কোথাও মনের অতলে মা ফরহাদের জন্য নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছেন।

বাসে লেডিজ সিটে পাশাপাশি বসে নীরব রইলাম আমরা। মাকে আমি সাহায্য করব কিভাবে, মিউচুয়াল সেট্‌ল্‌মেন্ট পদার্থটা আমার জানা নেই। ভারতী আচার্য কলকাতার মেয়ে। কলকাতার বাঘাযতীনে চাকরি। বহরমপুরে বিয়ে হয়েছে। ওর বর একটি ছোট লেটার প্রেসের মালিক। এম.এ. পাশ করে বেকার ছিল, এখন প্রেস খুলেছে। কলকাতার মেয়ের সঙ্গে কিভাবে সম্বন্ধ হল, খুব সম্ভব প্রেম-বিবাহ হয়ে থাকবে, এ সবই আমার জ্ঞাতার্থে নেই, কল্পনা করেছি। তবে ভারতী যখনই এসেছে, এতই বিষণ্ণ আর অসহায় দেখেছি যে, মায়া হয়েছে। সংসারে কিছু মানুষ থাকে, যাদের দেখে মনটা করুণায় ভিজে ওঠে। অকারণ। তাদের চোখেমুখে একটা সদা পরিব্যাপ্ত নিঃসহায় ভাব আকর্ষণ করতে থাকে। ভারতীরই মুখে হঠাৎ শুনেছিলাম, ওর বর প্রেস-মালিক, ছোট ব্যবসা। এমনকি একথাও কানে এসেছিল, ভারতীর মায়ের পরিবারে প্রতি মাসে তাদের অর্থ সাহায্য করতে হয়— না করে উপায় নেই।

আমরা বহরমপুরে জলঙ্গি বাস স্ট্যান্ডে নেমে রিকশা করে প্রথমে মায়ের সেই আত্মীয়া

ওরফে বান্ধবীর বাসায় উপস্থিত হই। আত্মীয়ার নাম চিত্রিতা গোস্বামী। এখানকার ডি.আই অফিসের এ.আই.।

ঘরের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়ে আমাদের তিনি হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন। আমরা ভেতরে ঢুকেই ভারতী আচায্যিকে দেখতে পেলাম, একটি সোফায় বসে রয়েছে। পাশেই ভারতীর স্বামী, দেখেই মনে হল এই মানুষটা স্বামীবৎ এবং স্বামীসদৃশ। ছ ফুট লম্বা, মেরে কেটেও তার কম হবে না। চোয়াড়ে, মুখে পৌরুষ আছে। গলার স্বর ভারী।

লোকটা বলে উঠল— ও তো আপনার কাছেই যেত। বন্ধের জন্য যেতে পারেনি। আপনি এসেছেন, ভালই হল। আমরা চিত্রাদিকে ধরে পড়ে আছি। উনি বলছেন, এটা একটা সলিটারি কেস....

— তুমি থামো। আগে বসুন ওঁরা, তারপর তো বলবে। এদিকে শুনলাম, বাস নাকি আবার বন্ধ হয়ে যাবে। কলকাতায় দাঙ্গা হচ্ছে, কাগজে কী সব খবর বেরিয়েছে। ট্রেনও হয়তো চলবে না। কী করে যাব আমি ? স্কুলের ঠিকানায় একটা পোস্টকার্ড ড্রপ করেছি, তা-ও হয়তো পৌঁছবে না। কলকাতায় দাঙ্গা হবে, এ ঠিক ভাবতে পারি না। বলতে বলতে থেমে গেল ভারতী।

চিত্রিতা গোস্বামী আমাকে সাদরে ধরে খাটের উপর পাশে বসিয়ে গায়ে মৃদু মৃদু হাত বোলাতে বোলাতে বললেন— এত সুন্দরী হয়েছ তুমি ! এত খাসা দেখাচ্ছে তোমার মেয়েকে স্বর্ণদীপা ! তোমার চেয়ে গায়ের রঙ একরত্তি চাপা হয়েছে বলে আরও খুলেছে। এই রঙটার একটা ম্যাজিক আছে। কখনও কাঁচা সোনার মতন হয়, কখনও অন্য রকম। তুমি তো আমার কাছে আর আসো না আকাশ। কেন ? আমাকে তোমার কখনও পছন্দই হল না। বিয়ে করিনি বলেই হয়তো বলতে পারলাম না, আমি তোমার মা হতে পারতাম। কী গো ! রাগ করেছ বুঝি ! বলেই আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং মায়ের চোখের দিকে একদণ্ড নির্নিমেষ চেয়ে থেকে বললেন— পাশের ঘরে এসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

চিত্রিতা খাট ছেড়ে নেমে মাকে চোখের ইশারা করে পাশের ঘরে চলে গেলেন। মা তাঁর পিছু পিছু চলে গেলেন পর্দা ঠেলে ওই ঘরটার ভিতর। চিত্রিতা হামেশা অমন বলেন, আমি রাগ করেছি কিনা, না এলেই অভিমান করেন। তিনি অবিবাহিতা, কিন্তু চোখেমুখে বড় মাতৃভাব উৎসারিত হয়, আমাকে পেলে ওঁর যেন চাপা আনন্দ হয়— সেটা বুঝি। কিন্তু তাই বলে এখানে থেকে যাব, তাই কি হতে পারে !

চিত্রিতা গোস্বামীর সঙ্গে মায়ের কী কথা হল আমার জানা নেই, ওঁরা দশ মিনিট ধরে কথা বললেন। চিত্রিতার চোখেমুখে আভিজাত্যের ছাপ আছে, মেয়েদের গড় উচ্চতার চেয়ে তাঁর উচ্চতা একটু বেশি এবং মাঝারি স্বাস্থ্য, মুখমণ্ডলে বুদ্ধির আভা ছড়ানো। চোখে পাওয়ারের চশমা, বাই-ফোকাল নয়। মাইনাস হবে। তাঁর খুতনির তিলটা ভারী মিষ্টি। কপাল চওড়া, সিঁথি স্পষ্ট। মুখের লাবণ্যে বুদ্ধির সঙ্গে স্নেহভাব উছল। ওঁকে আমার সত্যিই ভাল লাগে।

দশ মিনিট ওঁরা স্বামী-স্ত্রী চুপচাপ বসে রইলেন। আমি জানলার কাছে সরে গিয়ে একজন মাথা নেড়া লোকের সাইকেল চড়া প্রত্যক্ষ করতে থাকি। খাঁকি হাফ-প্যান্ট পরা, স্যান্ডো গেঞ্জির এই লোকটা ওই প্রকাণ্ড মাঠে ব্যায়াম করে রোজ ভোরে, ডন-বৈঠক করতে দেখেছি, গোস্বামী মাসির এখানে যখন রাতে থেকেছি। মাসি বলেছিলেন, লোকটি পুলিশে পেয়াদার চাকরি করে আর হিন্দু ঐতিহ্যবাদী উগ্র সংগঠন, কোনও একটা সঙ্ঘের মেম্বার বলে শুনেছি। ওই মাঠে ওদের নানা রকম মহড়া হয়। প্যারেড হয়। অস্ত্রশস্ত্র,

BanglaBook.org

খড়্গ, লাঠি ইত্যাদি থাকে, একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। ভয় লাগে।

লোকটি সাইকেল চড়ে ময়দান প্রদক্ষিণ করছে ক্রমাগত। লোকটাকে দেখে আমার ভেতরে একটা ভয়মেশানো ঘৃণিত পিচ্ছিল অনুভূতি হচ্ছিল। আমি জানি, লোকটি আমাকে তেড়ে এসে আক্রমণ করবে না, কিন্তু ভয় এবং ঘৃণা কেন হচ্ছে ? মাথার মধ্যে একটা বিপন্ন বোধ পাকিয়ে উঠে কোথায় যেন পড়ে যাচ্ছি আমি। মাথাটা ঝিমঝিম করছে, অজস্র ঝিঁঝির চিৎকার হঠাৎ থেমে যাওয়ার পর মাথার মধ্যে সেই তরঙ্গটা কাজ করে ক'সেকেন্ড, একটা কেমন শূন্যতা ঘিরে থাকে, সেই রকম হচ্ছে আমার। যতবার লোকটা দূরে বাঁক নিচ্ছে, মনে হচ্ছে পড়ে যাবে, কিন্তু পড়ছে না। বুকটা ধক করে উঠছে। এমন কেন হচ্ছে কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আমি এত ভয় পাচ্ছি কেন, হঠাৎ-ই আজ এরকম কেন হল, কাউকে ঠিক বলে উঠতেও পারব না।

চিত্রিতা মাসি মাকে সঙ্গে করে পাশের ঘর থেকে বার হয়ে আসেন। তারপর মাসি ভারতীর বরের দিকে চেয়ে বললেন— মধুবাবু ! তোমরা এখন যাও। আমি আধঘণ্টা বাদে রুটিমহলের ওদিকে এক জায়গায় যাব— এই কাজের ব্যাপারেই একজনের সঙ্গে কথা বলব ভাবছি। দরকার মনে করলে ডেকে নেব।

ওরা স্বামী-স্ত্রী ঘাড় নেড়ে উঠে দাঁড়াল। আনুগত্যে, বিশ্বাসে এবং কৃতজ্ঞতায় মধুবাবুর লম্বাঘাড় সব সময় ভেঙে পড়ে রয়েছে এবং ঈষৎ একদিকে কাত। ভারতীর চোখে অসহায় করুণাঘন আকর্ষণ, কিন্তু ভয়টা আমি তাড়াতে পারছি না। কাউকে বলতেও পারছি না আমার কী হয়েছে। হঠাৎ মাসি আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন— তোমার মুখটা এমন শুকিয়ে উঠল কেন, তোমার কি শরীর খারাপ ! জল খাবে ?

— দাও।

মাসি সঙ্গে সঙ্গে ফিলটারের নব ঘুরিয়ে গেলাশ ভরে ঠাণ্ডা জল এনে সামনে ধরলেন। জল খেয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ রেখে হঠাৎ চোখ খুলে উদ্বিগ্ন মাসির মুখে চেয়ে নিঃশব্দে এবং জোরালো দেখায় এমন ভঙ্গিতে হেসে ফেললাম, যেন আমি মাসিকে আশ্বস্ত করতে চাইলাম। মাসিও স্মিত হাসি হেসে স্বামীস্ত্রীকে বললেন— তোমরা যাও তাহলে !

মা হয়তো ভাবছিলেন, আমি ফরহাদের জন্য চিন্তা করছি এবং তারই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।

মধুবাবু ঘাড় একটু তুলে বলল— দিদি ! আপনারই ওপর সব আশা ভরসা আমাদের ! ডি.আই. কে আপনিই একটু বুঝিয়ে বলুন না। মৌখিক কথাটা তুলুন, যদি উনি কনসিডার করেন, তাহলে জয়েন্ট সিগনেচার করে একটা অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করা যায়। করুণাবাবু বলেছেন....

বলে ভয়ে ভয়ে চিত্রিতার চোখে চাইবার চেষ্টা করে মধুবাবু। অতি সঙ্কোচের সঙ্গে বলে ওঠে— গড়িয়াহাটের বণিকবাড়ি ডি.আই. অফিসে কতবার গিয়েছে ভারতী। দেবযানী বণিকের বাড়িটাই তো অফিস এখন।

চিত্রিতা বললেন— জানি। ওখানকার এক এ.আই. করুণাময় মুখার্জি, তা-ও শুনেছি। ঠিক আছে, তোমরা এখন এসো। ভারতী সবই বলেছে আমাকে।

— হ্যাঁ দিদি। যথেষ্ট আশ্বাস পেয়েছি আমরা। করুণাবাবু প্রসিডিওর বলেছেন। সেই মতো ভারতীর স্কুল কমিটি একটা রেজলুসন নিতে চায়, তারা রেডি। তার একটা ট্রু কপি....

— শুধু ভারতীর হলেই তো হবে না মধুবাবু। স্বর্ণদীপা এক পা-ও এগোতে পারেনি। তাছাড়া প্রসিডিওর বলছ। ইন ফ্যাক্ট এর কোনও পার্টিকুলার প্রসিডিওর নেই। কারণ এর কোনও আইন নেই। কোনও প্রবিশনই নেই এ ব্যাপারে। সবই জানে

ভারতী।

— আজ্ঞে! বলে কেমন বোকার মতো অসহায় ভঙ্গি করল মধু আচার্য।

চিত্রিতা বললেন— হিউম্যানিটারিয়ান গ্রাউন্ড থেকে কনসিডার করা যায় কিনা আমারই মতো করুণাবাবুও সেকথা ভেবেছেন— অ্যাজ এ স্পেশাল কেস। দেয়ার ইজ নো প্রসিডিওর, দেয়ার ইজ নো প্রবিশন অ্যাট অল। কিন্তু আমরা কে? কনসিডার করবে স্কুল কমিটি, দুই পক্ষের কমিটি, বাঘাযতীন গার্লস এবং নিমতলা গার্লস অফ কাশিমবাজার। দুই কমিটি। দুই ডি.আই। এবং ডি.এস.ই.। তারও ঊর্ধ্বে টপমোস্ট অথরিটি যারা তাদের কনসিডারেশন লাগবে। কিন্তু তাঁরা কি করবেন? এডুকেশন মিনিস্টার? তাঁর সেক্রেটারি? তোমাদের এই কেস সল্টলেক পর্যন্ত যাবে। কিন্তু আদৌ যাবে কি?

— তাহলে কি আমরা এইভাবেই জীবন কাটাবো বলছেন দিদি! দুইজন এক জায়গায় কখনও হব না? আমাদের ছেলেপুলে হলে.....

মধু একথা বলে ঘাড় আরও নিচু করল। একটা কেমন ধাক্কা খেয়ে চিত্রিতা গোস্বামী নিজেকে সটান করে তুললেন। আমার দিকে চাইলেন। তাঁর চোখেমুখে ক্ষীণ একটা অস্বস্তি এবং কষ্টের রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল এবং কী একটা লজ্জাবোধ দেখা দিয়ে তা-ও অদৃশ্য হল। চোখমুখে একটা আকস্মিক কাঠিন্য এসেও ধুয়ে গেল।

গলার স্বর শক্ত করে চিত্রিতা বললেন— চলো স্বর্ণদীপা। আমরা এখনই বার হব। শোন ভারতী, একটু বাদে তুমি খবর পাবে। বাড়িতেই থেকো।

— আচ্ছা! বলে নরম গলায় ছোট্ট সমর্থন জানিয়ে স্বামীর হাত ধরে টানল ভারতী।

—এসো। দিদি সবই বোঝেন। তুমি আর কথা বোলো না। ভারতী একথা বলে স্বামীকে টেনে নিয়ে বার হয়ে গেল। ওরা যখন চলে যাচ্ছে, মাসির ভুরু জোড়ায় ব্যথা সংকুচিত হয়ে উঠল, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরলেন তিনি।

তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন— এরা ছেলেমানুষ। মধুটা বোকা। কিছুতেই বুঝতে চাইবে না।

পথে নেমে রিকশা ধরলাম আমরা। একটা রিকশায় আমি একা, ওঁরাও কথা বলার জন্য দুজনে অন্য রিকশায় একত্রে বসলেন। যদিও মাসি চাইছিলেন আমি ওঁর সঙ্গে থাকি। আমার মুখ শুকিয়ে উঠেছে, কতটা কী হয়েছে জানি না। একটা তেল চকচকে নেড়া মাথা, খাঁকি প্যান্টপরা লোক, গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, ময়দানে চক্কর দিচ্ছে, তা দেখে হঠাৎ আমার মধ্যে একটা অদ্ভুত ত্রাস সঞ্চারিত হল। জীবনে কখনও কোনও মানুষকে এত ভয় পাইনি।

লোকটা পেয়াদা। এবং ওই ময়দানে প্যারেড হয়। খড়্গ হাতে থাকে, থাকে শিবাজির অসি। সব কেমন ভয়ঙ্কর এবং বিস্ময়কর। এই শহরেই প্রকাশ্য পথের উপর চৌমাথায় মুসলমান-বিদ্বেষের কথা মাইকে বক্তৃতায় বলা হয়। মুসলমানদের জন্য ভারতের সামূহিক অধঃপতন ঘটেছে, সব দুরবস্থা-দুর্গতির জন্য মুসলমান দায়ী। বড় লজ্জা করে আমার, বড়ই অপরাধী মনে হয়। মায়ের আধিপত্যের কারণে নিজেকে পুরোপুরি মুসলমান অথবা পুরোপুরি হিন্দু কখনও ভাবতে পারি না। দাদিমা আমার জাতধর্ম দিতে চেয়েছিলেন, নিইনি। রুদ্রর মুসলমানি খৎনা হয়নি, হয়েছে ফাইমোসিস অপারেশন। সেই ঘটনা তাকে না করেছে মুসলমান, না রেখেছে হিন্দু। ও চাইলেই কি হিন্দু হতে পারে? মা কি তাকে হিন্দু করতে চান? খৎনায় তাঁর এত আপত্তি ছিল কেন? স্বামী ঈদের নামাজ পড়েন না বলে মায়ের কোনও দ্বিরুক্তি নেই, মা মনে করেন বাবার বৈপ্লবিক জীবন ধর্মাচার মানে না, তাই-ই শোভন, কিন্তু ফরহাদের বেলা তিনি ঈদের নামাজ পড়ার নির্দেশ

BanglaBook.org

দেন।

এমনকি ৬ ডিসেম্বর রাতে বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ হওয়ার দূরদার্শনিক সংবাদ শোনার পর, জহির বিশ্বাসের আবির্ভাব এবং আক্রমণ হলে মা বাবাকে মেনে নিতে বলেন। ওঁরা চাইছে যখন, ওরা মনে করে যখন যে, তুমি মুসলমান, তখন সেই সুপ্রস্তাব মেনে নেওয়াই ভাল। তুমি মেনে নাও। একথা এমন প্রগাঢ় পরামর্শ এবং অসহায় ভাগ্যের কথা যে, মা চাপাস্বরে বলে ফেলেন আশ্চর্য উক্তিটি—মেনে নাও।

বাবা কত আঘাত পেয়েছেন, কত অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে শুধু বলেছেন, না স্বর্ণদীপা।

রিকশায় যেতে যেতে বাবার সেই অসহায় মুখটা ভেসে ভেসে ওঠে। এক কবি মানুষকে বর্ণনা করেছেন এক নগ্ন সত্তা হিসেবে। যার কোনও বর্ম নেই। সে কেমন? একটা অসহায় সদ্যোজাত শিশু, মানব-কণিকা। আমি নগ্নসত্তা কথাটির একটি ছবি গড়ে নিয়েছি। নগ্নসত্তা বলতে শিশুর নরম নিরাবৃত দেহ ছাড়া আর কোনও দৃশ্য দেখতে পাই না। এ আমার কল্পনা কবিরই মতন। দাদিমা বলেন, তুমি নাঙা হয়ে এসেছো, তোমার পোশাক-লেবাস কিছুই ছিল না। এই দুনিয়া তোমাকে পোশাক দিয়েছে, যখন যাবে এ দুনিয়া ছেড়ে, এই দুনিয়াই তোমার সাধের লেবাস কেড়ে নেবে। তাই-ই যদি হয় দাদিমা, তাহলে ধর্মও তো পোশাক মাত্র, তোমরা আমাকে জাতধর্ম দিতে চাও, আমি কেন আমার পছন্দমতো ধর্মও নির্বাচন করতে পারি না?

আমি যাব, যেমন এসেছি নগ্ন হয়ে। পৃথিবী সবই কেড়ে নেবে। মানুষ তো চিরশিশু, ও তো নগ্নসত্তা মাত্র, নিরস্ত্র। এই খড়্গ, কৃপাণ, মাস্কেট কারা তুলে দিচ্ছে মানুষের হাতে? মানুষ বারবার প্রমাণ করে তার অসহায় নগ্নতা, নিরাবৃত জীবন; শেখর আনসারি সে কথাই বলেছে তার মৃত্যুতে। বলেছে, মাটিতে রাখো আমাকে। চেষ্টা কোরো না, আমি বাঁচব না। ফল নাই। জীবন তার ফলেফুলে ফুটে উঠেছিল এক নদীতীরে, অথচ সবই সে দেখেছে মৃত্যুর ব্যবহারে, ফলহীন। অর্থহীন। মানে নেই। সে মেনে নিয়েছে মৃত্যু এমনই, এই রকম হানাদার। খড়্গ যদি বলে, কৃপাণ যদি বলে, তুমি হিন্দু। আমি তা-ই-ই হব। মাস্কেট যদি বলে, তুমি মুসলমান, আমি তাই-ই হব। এই দেশের অযুত নিযুত মুখগহ্বর উদ্গাত করছে, তুমি হিন্দু, তুমি খ্রিস্টান, তুমি ব্ল্যাক, তুমি আরজল, আবদাল, তুমি ব্রতহীন, ব্রাত্য, তুমি নিকিরি, তুমি অর্জল, তুমি সৈয়দ। কখনও বলে না, তুমি নগ্নসত্তা, তুমি মানুষ।

কবি বলেন, সবার উপরে মানুষ সত্য। বক্তৃতামঞ্চে শুনতে পাই কবির কথা। কিন্তু সত্য কেউ জানে না। এই মাথা নেড়া পেয়াদা সত্য কী জেনেছে জীবনে? কী তার পরিক্রমা? কেন অমন করে ঘুরছে লোকটা? অমন করছে কেন খাঁকি পোশাকের স্যান্ডোগেঞ্জি? আমার মাথার মধ্যে পাক খাচ্ছে কেন ওভাবে?

আমি কি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছি? আমার কি শরীরে ঘাম দেখা দিয়েছে, কপালে, ঠোঁটের উপরিভাগে, গলায়, সর্বত্র ঘাম! আমার কি চেতনা লুপ্ত হয়ে আসছে? 'আদিগন্ত নগ্নপদধ্বনি' আমারই, একা আমি হেঁটে চলেছি মনে মনে। আকাশের ওপারে আকাশ। তারপর আরও মহাকাশ, আমি আকাশে বিলীন। আমাকে কেউ দেখতে পায় না। আমার কথা কেউ শুনতে পায় না, শুধু আলো আসে। কিন্তু 'আলো ক্রমে আসিতেছে' এই পৃথিবীর দিকে। আলো পড়েছে কৃপাণে, খড়্গে, জ্বলজ্বল করছে হিংসা, সেই আলো লেগেছে ওই পেয়াদার তৈল মসৃণ মস্তিষ্কের টাকের আয়নায়। অথচ ওর পা খালি, মাথা নেড়া, ওর শুধুই পরিক্রমা। ওরও সন্তান আছে ঘরে, বউ আছে সুন্দরী। ও কেন অমন

করছে একা একা ?

বাউল মারলে পুণ্য হয়। সবার উপরে সত্য যে মানুষ, তারই মুখে এই দেশ এমনই প্রস্তাব দিয়েছে। আমার কেন ভয় করবে না, কেন ত্রাস হবে না প্রতি রোমকূপে। এই রিকশা কি ঠিক চলেছে ? মা এবং গোস্বামী মাসি কোথায় টেনে নিয়ে চলেছেন আমাকে ? ফকির-নিধনে পুণ্যবান মাতৃভূমি, খড়্গ উজ্জ্বলতায় হিংসার ধারালো কিরণে আমার মজ্জা পুড়ে যাচ্ছে, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি।

ওঁরা হেসে হেসে কথা বলছেন ! ওঁরা পরস্পর বন্ধুতা জ্ঞাপন করছেন। ওঁরা হৃদ্য-হৃষ্ট ভালবাসার বন্ধনী। ওঁরা দু'জনই হিন্দু। আমি কত খারাপ হয়ে গেলাম মা ! আমি এখন মানুষকে মানুষ দেখব না। হিন্দু দেখব। মুসলমান দেখব। আনসারি আর সৈয়দ দেখব। মানুষেব নিঃশ্বাসে টের পাব এই লোকটা কে ! এই লোকটা ব্রাহ্মণ। এই লোকটা পতিতুন্ড, এই লোকটা ওড়িশার ব্রাহ্মণ। এই লোকটা বরিন্দের কায়স্থ। আমি এইভাবে দেখতে থাকব বিভাজিত, বিভাগিত, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ মানুষ। এইভাবে ভাঙতে ভাঙতে, ক্ষুদ্র করতে করতে, ছোট করতে করতে মানুষকে অবশেষে চিনতে পারব তো ! ফরহাদ, তোমাকে আমি চিনতে পাবর তো ?

আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে অথচ শরীর সেকথা বুঝতে পারছে না। চোখ চেয়ে আছে, অথচ দৃষ্টি নিরর্থক, কিছুই দেখছে না। আমি অশ্রু ঠেলে একটা কিছু চিনতে চাই...ওটা কী ? ওই বাড়িটা ?

আমরা এসে পৌঁছলাম একটি গলির মধ্যে। রিকশা থেকে নেমে গলি ধরে হেঁটে একটি দোতলা বড় দালানের কেয়ারি করা ফুলের বাগানে গ্রিলের গেট ঠেলে ঢুকলাম। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। সিঁড়ির নীচে শেকল বাঁধা বিলিতি কুকুর দেখলাম। দোতলায় সিঁড়ির কাছে পৌঁছতে একটি শান বাঁধানো উঠোনের রোয়াক পার হয়ে এসেছি। দেখিনি কতগুলি ঘর রয়েছে নীচের তলায়। একটি কাজের ছেলে দোর খুলেছিল কলিংবেলের বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে।

বুঝতে পারছিলাম বাড়িতে লোকজন কম। গোস্বামী মাসি কাজের ছেলেটিকে কী যেন শুধালেন। তারপর 'ও আচ্ছা' বলে সিঁড়িতে পা বাড়ালেন। দোতলায় এসে একটি বৃহদাকার ঘরের পর্দা ঠেলে মাসি ভিতরে সামান্য মুখ বাড়িয়ে আস্তে করে শুধালেন—আসব ?

—কে ?

একটি ভারী পুরুষকণ্ঠ ভেসে উঠল ভিতরে। তারপর সেই পুরুষকণ্ঠই ঈষৎ বিস্ময় প্রকাশ করে আমাদের ভিতরে আহ্বান করল। পর্দা ফাঁক করে চিত্রিতা মাসি মাকে এবং আমাকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন।

—সৌম্যব্রত ! দ্যাখো, কাকে নিয়ে এলাম তোমার কাছে ! চিনতে পারছ ? তুমি যে মস্ত এম. পি. এবং সে যে তুমিই তা ও বিশ্বাস করতেই চাইছিল না। বলছিল সৌম্য তো কখনও তেমন পলিটিক্স করত না !

—ও, আচ্ছা ! বলে দীর্ঘদেহী শ্যামবর্ণ স্বাস্থ্যবান সৌম্যব্রত কিঞ্চিৎ সহাস্য লজ্জা প্রকাশ করলেন। তারপর মায়ের চোখে চোখ ফেলে এক মিনিট প্রায় অথবা একটু কম, চেয়ে রইলেন। বললেন—ও বুঝি তোমার মেয়ে ! বোসো বোসো তোমরা। আমিও ঠিক বিশ্বাস করতেই পারছি না। বাড়িতে এখন কেউ নেই, সব গেছে কাশিমবাজার এক আত্মীয় বাড়ি। তারপর একটু থেকে সৌম্যব্রত বললেন—রাতেই সব ফিরে আসবে। বলে এক সেকেন্ড চুপ করে থেকেই কাজের ছেলেটাকে প্রায় সন্তানকে যেভাবে মানুষ

ডাকেন তেমনই সস্নেহে বার কতক ডাকলেন এখানে আসার জন্য। শান্তস্বরে আমাদের জানালেন—শ্যাম আর আমি আছি। ও তোমাদের জন্য কফি করে আনতে পারবে। একাই পারবে ও, ভারী চমৎকার ছেলে, অরফ্যান।

তারপরই সৌম্যব্রত বললেন— যাই হোক। বড়ই দুঃসময়ে এলে তোমরা! মা এ কথায় মাথা নিচু করলেন। ওই ভঙ্গিটি আমার একদম ভাল লাগল না। কিন্তু সৌম্যব্রতর চোখে একটা স্নিগ্ধ প্রসন্নতা খেলে উঠল। বুঝতেই পারছিলাম, স্বর্ণদীপা এবং, সৌম্যব্রত পরস্পরের চেনা। জানি না, সম্পর্ক কী ওঁদের! মায়ের মুখে কখনও সৌম্যব্রত নামটি পর্যন্ত শুনিনি। সৌম্যব্রত অতঃপর দেশকাল এবং দুঃসময় সম্পর্কে রাজনৈতিক পরিভাষা এবং বাম কেতা মেশানো কতক শব্দমুদ্রা সহযোগে বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ হওয়ার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, কেন্দ্রের দ্বিমুখী নীতি, প্রধানমন্ত্রীর অযোগ্যতা, ইংরেজিতে বললেন, ইনঅ্যাডিকোয়েট পার্সন্যালিটি এবং শেষে জানালেন, এ সবই আশ্চর্যের নয়।

সৌম্যব্রত এই শহরের পুরনো ঐতিহ্যমণ্ডিত কো-এডুকেশন কলেজের বাংলা বিভাগীয় অধ্যাপক। কিন্তু আমার অধ্যাপক নন। তাঁকে আমিও চিনি না। আমি পড়েছি গার্লস কলেজে।

ওঁদের আলোচনা চলছিল। আমি শুনছিলাম না। আমার মাথার মধ্যে তখনও সেই সাইকেল আরোহী ঘুরছিল।

—দাদার অসুস্থতার খবর পাই টেলিগ্রামে। চারদিন আগে। না এসে উপায় ছিল না বলেই সত্বর চলে এলাম। ...এখন কিছুটা ভাল। সেন্স আছে। ভাবছি, কলকাতার কোনও নার্সিংহোমে ... অবশ্য কলকাতার সিচুয়েসন অত্যন্ত খারাপ।

টুকরো টুকরোভাবে সৌম্যব্রতর স্বর আমার কানে এসে লাগে।

—আমি চিরকালই স্মিতভাষী মানুষ। স্টুডেন্টস পলিটিক্স করেছি, কিন্তু চেঁচাতে পারতাম না। ... টিমিড ছিলাম তো। পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ বরাবরই ছিল। ইমাম ছিল কমপ্লিটলি ডিরোজিয়ান টাইপ, ওর মুখের কথায় ছিল আগুন। ওকে কখনও সারপাস করতে পারিনি, চেষ্টাও করিনি। কেন করব? ও ছিল ক্রিম অব দি সোসাইটি। সোনার ছেলে। আমি ছিলাম একটেরে দাঁড়িয়ে, তখন সবই ছিল আমার ইনডিস্টিংক্ট। কাজে কাজেই ...

—ইমাম যখন বক্তৃতা করত, মনে হত, হি ক্যান ইন্ট্রোডিউস সামথিং নিউ, সেটা কী? না, একটা কোনও জীবনজয়ী ব্যাপার ছিল ওর মধ্যে, যা সে বলত, না বলা কথা ছিল তার চেয়েও বেশি, ওখানেই ছিল ওর আকর্ষণ। ... নাও কফি খেয়ে নাও।

সৌম্যব্রতর কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ মা বলে উঠলেন—তোমার সব কথাই আমার মনে আছে সৌম্যব্রত।

—হ্যাঁ, আমারও মনে পড়ে যাচ্ছে তোমার মেয়েকে দেখে। কী নাম ওর? ঠিক এরকমই ... একদম এক চেহারা, বয়েস ... হাবভাব ...

—আকাশলীলা। বলে ওঠেন মাসি, আমার নাম।

—খুবই ইমাজিনেটিভ, স্ট্রংলি পোয়েটিক, ভেরি গুড নেম। তারপরই আচমকা বলে উঠলেন অধ্যাপক এম.পি—এত সুন্দর তোমার মেয়ে হয়েছে স্বর্ণদীপা! অনন্ত একবার বলেছিল যে, স্বর্ণদীপার দু'টি ছেলেমেয়ে, ও তাইই বুকে করে পথে পথে ঘুরছে। আমার সাহস হয়নি যে বলি, অনন্ত যেন স্বর্ণদীপাকে আমার কাছে নিয়ে আসে।

—কেউ সেকথা বলত না সৌম্যব্রত, হয়তো তোমারই মতো ভাবত, সাহস হত না।

—খুবই দুঃখিত স্বর্ণদীপা।

BanglaBook.org

—এখনও দুঃসময়, তুমিই বললে। তাহলে সাহায্য কর আমাকে।

—নিশ্চয়ই। বল কী করতে পারি!

—চিত্রিতা বলেছে, তুমিই পার। সাহস নয়, তোমার সদিচ্ছা আর সহানুভূতি চাই আমি।

—বল।

—আমি আর গ্রামে থাকতে চাই না। পারছি না। আমি ফিরে যেতে চাই।

—কোথায়?

—শহরে! কলকাতায়। এই মেয়ে ... তারপর ছেলে রুদ্র, ওদের বাবা ...

—ছেলেমেয়ের জন্য চাকরি চাইছ? কোনও ক্ষমতা নেই আমার। আমি তো এম. পি. স্বর্ণদীপা। দলের কাছে সম্মান আছে। কিন্তু রাজ্যের চাকরি বাকরির ব্যাপারে ...

চিত্রিতা মাসি এবার ভারতীর প্রসঙ্গসহ সবিস্তারে মায়ের মিউচুয়াল সেটল্‌মেন্ট প্রস্তাব তুললেন। এবং বললেন—আমি মনে করি, আইন না থাক, এদের কথা তবু আমাদের ভাবা দরকার।

—হয় কি?

—হয় না সৌম্য। তবে তোমার উদ্যম আর ডি. এস. ই এবং ডি. আই-এর ম্যানেজিং কমিটিকে রাজি করানো, সেসব ...

—কমিটিকে আমি কী করে বলব?

—তুমি নয়। স্বর্ণদীপাই বলবে, তুমি ডি. আইকে বল।

আমি একটি পাথুরে বৌদ্ধমূর্তির দিকে চেয়েছিলাম। কাঁচের আলমারির মধ্যে থ্যাবড়া করে বসানো। নীচের থাকে ওটা আছে। অন্য থাকগুলি বই ভর্তি। মার্কস এঙ্গেলস লেনিনের সেট। নিকোলাই অস্ত্রভস্কির 'হোয়েন দি স্টিল ওয়াজ টেম্পার্ড।' গর্কির 'মাদার।' চিনা বই 'লাল লণ্ঠন।' তারপর জন রিডের 'দুনিয়া কাঁপানো দশদিন।' দেওয়ালে কাকাবাবু মুজফফর আহমেদের ফোটো। লু-সুনের বই। গোল একটা কাঠের টেবিলে আমেরিকার স্প্যান। বিজ্ঞানের বিদেশী ম্যাগাজিন। মধুসূদন রচনাবলী, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, সেক্সপীয়ার, দীনবন্ধু। মীর মোশারফ হোসেন। বঙ্কিমচন্দ্র। টলস্টয়। সবই আছে।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে আলমারির কাছে চলে এসেছি। এম. পি আমাকে মাঝে মাঝে লক্ষ করছিলেন। পাশের ঘর পর্যন্ত চলে আসি আমি। খুব ঠাণ্ডা ঘর। একটি বাইশ-চব্বিশ কি ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়েসের তরুণের ছবি টেবিলে ফ্রেমে বসানো. পিছনে কাঠের ঠেকনোয় স্ট্যান্ড করা। বেশ ঝকঝকে চেহারা। বাপের আদলের ছাপ আছে। টেবিলে বইপত্তর ছড়ানো। একখানা বই তুলে দেখে বুঝলাম, ইঞ্জিনিয়ারিং কেতাব। হয়তো পাশটাশ করে গিয়ে থাকবে অথবা পড়ছে।

তোকে আমি বিশ্বাস করতে পারি! আকাশ?

একথা কোথা থেকে সহসা ভেসে এল। কেমন শিউরে উঠলাম আমি। ফোটোর দিক থেকে চোখ টেনে প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে মায়ের সামনে এসে দাঁড়ালাম। বললাম—আমি এখনই চলে যাব মা! মাসি, আমাকে চলে যেতেই হবে। বলেই ওদের উত্তরের অপেক্ষা না করে সিঁড়িতে পা বাড়িয়ে দিলাম ঘরের পর্দা ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে—যেন লাফ দিয়ে চলে এলাম।

BanglaBook.org

৮. আকাশে আমি লুকিয়ে থাকি, আমি আকাশলীনা

এম. পি-র বাড়ি ছেড়ে নেমে আসি রাস্তায়। এমন আচরণ আমারই কাছে কেমন দুর্বোধ্য ঠেকেছিল। মাসি রাগ করেননি, কিন্তু মা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, এমনকি অপমানে কেঁদে ফেলেছিলেন।

রাস্তায় এসে বেশি দূর চলে যেতে পারিনি। একটি বাড়ির নীচে শানবাঁধা জলকূটের কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম।

—একজন ভদ্রলোককে এইভাবে অপমান করতে পারলে ? চলে এলে এইভাবে ? তুমি কি বুঝতে পারছ না, কেন ওঁর কাছে গিয়ে দরবার করতে হল ? তোমার কি মায়া নেই মানুষের উপর ? ভারতীর কথা ভেবেও ধৈর্য ধরতে পারতে। তুমি আমাকে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছ। দাওনি ? বলতে বলতে মা রেগে উঠে দিশেহারার মতন বললেন—শোন আকাশলীনা ! ওঁর কাছে ক্ষমা চাইবে। নিজে যেমন বার হয়ে এসেছ, নিজেই যাবে। বলবে, তুমি ভুল করেছ। এই কাজটা তোমায় করতেই হবে।

—রাস্তায় এভাবে বোকো না ওকে দীপা। বাসায় চল। বাসায় গিয়ে বলবে। বললেন চিত্রিতা। আমি মায়ের কথার উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলাম। আমার কী হচ্ছিল কেউ তো এঁরা বুঝবেন না। হয়তো এমনও হতে পারে, মাকেও আমি বুঝতে পারছি না।

মাসির বাসায় এসে মায়ের সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ কথা বন্ধ হয়ে রইল। চিত্রিতা গোস্বামী হেসে ফেলে বললেন— খুব জিদ্দি। তোমারই মতন দীপা ! মনে আছে, তোমাকে সৌম্যব্রত বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াতে তুমি কেমন ক্ষেপে গিয়েছিলে ! অবশ্যি, তা-ও সেই প্রোপোজাল ও সরাসরি দেয়নি। প্রপোজার ছিলাম আমিই, ওর হয়ে যাঃ ! সে কী অবস্থা। বলেই চিত্রিতা শব্দ করে হেসে ফেলেন। চশমাপরিহিতা এ. আই-কে হাসলে আরও সুন্দর দেখায়। ওঁর হাসির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে আমি চেয়ে রইলাম ওঁরই দিকে কিছুক্ষণ, তারপর জেদের কথায় লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলাম। মায়ের রাগ কিন্তু পড়ল না, বরং হয়তো বা অতীত প্রসঙ্গ এসে পড়ায় ওঁর ক্রোধ আরও চাগিয়ে উঠল। কী জানি, মাকে তো আমি বুঝতেই পারছি না। ঠিক যে, ওই সৌম্যব্রতকে মা ভালবাসেননি। সৌম্যব্রতর পক্ষের ভালবাসা কী দুর্ভাগ্যজনক।

যাই হোক, মা কিন্তু ভুললেন না যে, আমাকে ক্ষমা চাইতে হবে। শেষ পর্যন্ত গোস্বামী মাসির ওখানেই মন কষাকষির চূড়ান্ত এবং জেদাজেদির চরম হয়ে গেল।

মাসি মাঝে পড়ে বিপন্ন গলায় নরম সুরেই মাকে বললেন—ওকে ওভাবে ইনসিস্ট কোরো না দীপা ! ক্ষমা ও চাইতেই পারে।

—চাইতেই হবে চিত্রিতা। এ অত্যন্ত অভদ্রতা। একটা মানুষের কাছে কাজ আদায় করব, আবার তাকে অপমানও করব ? উনি অত্যন্ত আহত হয়েছেন।

—না। আমার ভাল লাগছিল না বলে চলে এসেছি। এতে অপমানের কী আছে ! বললাম আমি।

—ও ঠিক বুঝতে পারেনি দীপা ! ছেলেমানুষ। ঠিক আছে মাসি বলবার চেষ্টা করেন।

—না। ও সৌম্যব্রতকে নেগেট করতে চেয়েছে, তুমি বুঝতে পারছ না। ও জীবনটাকে কী মনে করে, লেডিজ সাইকেল চড়ে গ্রাম দেখা ! মানুষের কাছে যেতে বলেছেন বাবা ! মানুষ মানে তো ফরহাদ ! আমি বুঝি না ?

আমার মুখে এবার অজান্তেই একটা ছোট করে হাসি ফুটে উঠল। মনে হল, মা-ও তো একদা বাবাকেই মানুষ মনে করেছিলেন, সৌম্যব্রতকে করেননি।

আমার হাসির দিকে চেয়ে মাসি বললেন— ও নেগেইট করেছে বলছ, না না। ও তা করতেই পারে না। খামোকা একটা ব্যাপারকে তুমি জটিল করে তুলছ স্বর্ণদীপা! তুমি আগে মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দ্যাখো, ও হয়তো অন্য কিছু ভাবছিল তখন, ব্যক্তিগত ... মুখ দেখে মনে হয়েছিল খুব ইন্ডিফারেন্ট। ও ঠিক আমাদের কথা শুনছিল না। যাক গে, যেতে দাও। ও ক্ষমা চেয়ে নেবে। আবার তো যেতে হবে আমাদের।

—হ্যাঁ চাইবে। মায়ের চোখে জিদ চলকে ওঠে।

বললাম—না। আমি আর আসব না মাসি। আমি মাকে এভাবে সাহায্য করতে পারব না।

এ কথায় মুহূর্তে মায়ের মুখ কালো হয়ে গেল। হতাশায় ছেয়ে গেল মুখের সমগ্র কাঠামো। চোখের পাতা ব্যথায় ভারী হয়ে উঠল দেখতে দেখতে। আমারই তখন অদ্ভুত কষ্ট হতে লাগল।

চিত্রিতা মাসির ওখান থেকে বিদায় নেওয়ার সময় মাসি বাসা ছেড়ে রাস্তা পর্যন্ত নেমে এসেছিলেন, রিকশায় উঠে সিটে বসেছি মা আর মেয়ে। হঠাৎ মাসি মাকে শুধালেন—ফরহাদ কে স্বর্ণদীপা?

—রুদ্র আর লীনাকে পড়াত। মাস্টার। ক'দিন আগে ওর বাবাকে গুণ্ডারা মাস্কেট চালিয়ে মেরে ফেলেছে। তাই লীনা দেখতে গিয়েছিল। দেখে কী হবে! কেউ বাঁচবে না চিত্রিতা। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মা। তারপর অন্যমনস্ক সুরে গোস্বামী মাসিকে বললেন—তুমি আমার ব্যাপারটা দেখো, আর কী বলব! সৌম্য তোমার কথা শুনবে। মেয়ে আসবে না, আমি আসব। ক্ষমা আমিই চাইব। বলেই মা রিকশাকে নির্দেশ দিলেন—চলো ভাই!

হঠাৎ-ই আমার নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হতে লাগল। মনে হল, সত্যিই আমি অন্যায় করেছি। এত আর্দ্র আর অসহায় গলায় মাকে কথা বলতে খুব কমই শুনেছি, কেমন যেন সহসা মা ভেঙে পড়েছেন বলে মনে হল।

একটু এগিয়েই রিকশার চেন পড়ে গেল। মাসি এগিয়ে এসে মাকে বললেন—সেক্রেটারিকে ধরো স্বর্ণ। হেডমিস্ট্রেসের উপর চাপ দিয়ে রেজল্যুসন করাবে। ভারতীর ম্যানেজিং কমিটির তরফ থেকে কোনও বাধা হবে না। এই সব বোঝাও। ওখানকার সেক্রেটারির যে একখানা হাতচিঠি ও লিখিয়ে এনেছে, তোমাকে দিয়েছি তো?

—হ্যাঁ।

—ওটা কমিটির মিটিঙে সেক্রেটারি শো করবেন। সেক্রেটারি মুসলমান, তাই না?

—হ্যাঁ। কেন?

—না, তাই বলছি। এমনি তোমার যে গ্রামে থাকতে ভাল লাগে না, এসব কথা না বলাই ভাল। সৌম্যব্রত বুঝেছে, সবাই তো বুঝবে না। তাছাড়া তোমার কলিগরা ভাববে, তুমি প্রিভিলেজ চাইছ বা অন্যকিছু। একদিন দরকার হলে, ভারতীকে তোমার স্কুলে নিয়ে যেও, ও ওর কথাটা বলুক।

—তুমিও এইভাবে বলছ চিত্রিতা!

—অবুঝ হচ্ছ কেন! গ্রামের জটিলতা তুমি বোঝো না! তাছাড়া বাবরি মসজিদ অ্যাবলিশ হওয়ার পর এখন অবস্থা যা হল, তাতে করে হঠাৎ হঠাৎ মানুষ বদলে যাবে। তুমি ভেবে পাবে না, কে কিভাবে তোমাকে দেখছে!

BanglaBook.org

মা আর কোনও কথা না বলে চুপ করে গেলেন। রিকশা চলতে শুরু করল। সারা পথ আমাদের আর কোনও কথা হল না। তারপর থেকে শুরু হল মায়ের আশ্চর্য পরিবর্তন। কথা বলা কমে গেল। একা একা ছুটে মরতে থাকলেন তিনি। কাউকে বলেন না তিনি কী করছেন। বাবাও প্রশ্ন করতে পারেন না। ফরহাদ আসে না আমাদের বাড়ি।

দু'এক দিন ভারতী আমাদের বাড়ি এসে নীচের ঘরে বসে রইল। মনে হল তাকে ধরে মা তাঁর ট্রান্সফারের জন্য তদ্বির করছেন হেথা হোথা।

রুদ্র একদিন হঠাৎ শুধাল—তোমার কদ্দুর হল মা ?

মা বললেন—হবে।

একদিন খুব ভোরে মা পাগলের মতন বার হয়ে যাচ্ছেন দেখে আমার বড় মায়া হল। সামনে এগিয়ে এসে সরাসরি মায়ের চোখে চোখ রেখে দাঁড়ালাম।

মা চেয়ে রইলেন আমার চোখে। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন—কী হল ? তুমি কিছু বলবে মনে হচ্ছে। শোন ! তুমি ফরহাদকে দেখে এসো, কোথায় আছে। সঙ্গে করে আনবে।

—আমি তোমার সঙ্গে যাব মা ! যা বলবে করব। আমি ক্ষমা চেয়ে নেব। বলেই আমি কেঁদে ফেললাম। তখনও অন্ধকার ছিল আকাশে জড়ানো। ছিল কুহেলির মতন রহস্যময়ী আঁধার। একটি পুরনো সাদা শিলাখণ্ডের মতন চাঁদ ভাসছিল, জ্যোৎস্না নিবে গিয়েছিল তার শরীর থেকে। বাতাসে ছিল বকুল গন্ধের মতন ঘন রহস্য।

মায়ের চোখে সূক্ষ্ম কী যেন খেলে উঠল। তিনি প্রসন্ন হয়েছেন কিনা বুঝতে পারলাম না। মেঝেয় বসানো হ্যারিকেনের আলো ছুটে এসে লাগছিল কুহেলিঘন মায়ের গভীর চোখে।

হঠাৎ তিনি দৈবধ্বনি করলেন যেন বা। বললেন—তোমাকে কথা দিতে হবে আকাশলীনা।

—বল !

—কথা দাও আগে, আমি যা চাইব, তাই হবে ! আবীরলালের কাছে ক্ষমা চাওনি। কিন্তু...

—চাইব মা !

—কথা দাও। কখনও প্রকাশ করবে না।

—না।

—তুমি আমার দেহ, আমার মন।

—হ্যাঁ মা। আমি তোমারই মেয়ে।

বলতে বলতে কান্না আরও উছল হয়ে ওঠে। এমন কেন হচ্ছিল, আজও জানি না।

মা বললেন—তুমি প্রভাস, নির্মল, অঞ্জন, সত্যব্রত এরকম কাউকে বিয়ে করবে, কথা দাও।

—মা !

—হ্যাঁ, ফরহাদ কেউ নয়। ওকে ডেকে নিয়ে আসবে, কিন্তু কেউ নয় একথা ভুলে যেও না। তোমার বিয়ে আমিই দেব। কখনও তোমার খারাপ হবে না, আমি বলছি। তাছাড়া আমি যদি মুসলমান ফ্যামিলিতে এসে থাকি, তুমি হিন্দু ফ্যামিলিতে যাবে না কেন ? তবু, একথা বাবাকে বলবে না। কথা দাও !

—মা !

BanglaBook.org

—আমার একটি বাসনা আছে বলেছিলাম। সৌম্যব্রত আমার কষ্ট বুঝেছে। একজন মার্কসবাদী এম. পি—প্রফেসর। ভারী বিদ্বান লোক।

—আমি ক্ষমা চাইব মা!

—প্রণাম করবে। শোন! বলে হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের কোণে ঠেলে নিয়ে আসেন মা। বললেন—এই ভোরে তুমি আমাকে কথা দিলে আকাশলীনা! যাও।

—কোথায় যাব? তুমি সঙ্গে নেবে না?

—না। ফরহাদকে ডেকে নিয়ে আসবে। বলবে, বাবা ডেকেছেন। না, দরকার নেই। মুস্তাফা যাবে। তুমি ঘরে থাকো। বলে হাত ছেড়ে দিয়ে মা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।

ঘরের কোণে ধীরে ধীরে বসে পড়লাম আমি। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলাম। পুরো নিজেকেই কেমন অবিশ্বাস্য লাগছিল। মনে হচ্ছিল, মা যা বলে গেলেন, তা যেন ঠিক মায়ের মুখ থেকে শুনিনি, বাতাস থেকে শুনেছি।

অনেকক্ষণ একা একা কাঁদলাম আমি। কাউকে বলতে পারব না, আমার কী হয়ে গেল একটু আগে। সেই স্যান্ডো গেঞ্জি, খাঁকি হাফপ্যান্ট এবং সাইকেল অনবরত মাথার ভিতর ঘুরতে লাগল। ওইভাবে আমি বসে আছি, ঘরের এই কোণটি এক ধরনের আড়াল, একটু অদ্ভুত গোঁজ মতন; ত্রিকোণ-বিশিষ্ট। ঘরে ঢুকে হঠাৎ এখানে চোখ পড়ে না।

শুধু ফোঁপানির শব্দ কানে যাওয়াতে রুদ্র এ-ঘরে এসে সচকিত হয়ে ওঠে। কান পাতে, তারপর আশ্চর্য হয়ে এদিকে চলে আসে। প্রায় কুণ্ডলি পাকানো আমাকে দেখে প্রথমে কী বলবে বুঝে পায় না। গায়ে আলতো করে হাত রেখে ডাকে—অ্যাই! কী হয়েছে? ওঠ্।

হঠাৎই সংবিত আসে, কান্না ঠিক নয়। কখনও প্রকাশ করব না আমি। আমার কী হয়েছে, কেউ জানবে না। কথা বলা বারণ আমার, প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। আমি তাই শুনেছি, যা আমি প্রকাশ করব না!

—তুই এইভাবে বসে বসে কাঁদছিস!

—না।

—মেয়েরা অদ্ভুত হয়, কাঁদছে, অথচ দিব্যি না বলছে। না মানে কী? কাঁদছিস না তুই?

—না।

—বেশ। তাহলে এখানে কী করছিস?

—পাপ।

—কিসের পাপ?

—জন্মের।

—ওহো, ভারী হেঁয়ালি! শোন্ ফরহাদদা স্কুলের চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে, জানিস! ওকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আমি গতকাল বিলাসপুর যাচ্ছিলাম, বাবা যেতে বলেছিলেন—তো পথেই একজন বলল, ওরা আর বিলাসপুরে থাকে না। চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। বাবাকে এসে বললাম সব। বাবা কথা পর্যন্ত বলতে পারলেন না। কী হল, বল তো! তুই কি শুনেছিস কিছু?

আমি মাথা নাড়তে নাড়তে চোখ মুছে ফেলি। রুদ্রকে কোনও উত্তর না দিয়ে সাইকেল নিয়ে বিলাসপুর চলে যাই। ফরহাদদের উঠোনে কতকগুলি শালিক চরে বেড়াচ্ছে, গুয়ে শালিক। ছাতারে পাখি দল বেঁধে এদিক ওদিক চরছে। বাড়ির পায়রার টঙে পায়রা নেই, একটা উদাসীন কাক বসে আছে। তালা বন্ধ।

BanglaBook.org

আমি স্বরূপগঞ্জের হাইস্কুলে এসে জানতে পারি, ফরহাদ ছুটি নিয়েছে, ও অ্যাপ্লায়েড ম্যাথ্‌সে ফার্স্টক্লাশ পেয়েছে আগেই, ও আর এই স্কুলে থাকবে না। ওর রেজাল্টের কথাও ও কখনও বলেনি আমাদের। তবে বাবাকে বলেছে হয়তো।

হেডমাস্টার মশাই বললেন—ফরহাদের মাথার ঠিক নেই, ও স্কুলে আসেই না। ছুটি শেষ হয়ে গেছে পরশু, আসছে না কেন বুঝছি না। ধর, ও আর আসবে না।

বাবা আর রুদ্র কলকাতা রওনা দিল একদিন। বাবা বলে গেলেন—কবে আসব বলতে পারছি না। মাকে বলে গেলাম, তোর মাকে, সাবধানে থাকতে। তুমি মায়ের পাশে থেকো। বাইরে গিয়ে কোথাও তর্ক কোরো না। তোমাকেই মানুষ সবচেয়ে ভুল বুঝবে। আমার অভিজ্ঞতা হল, হিন্দু মুসলমান কারও কাছে আমরা গ্রহণযোগ্য নই আকাশ। পদে পদে আমাদের জন্য অপমান আর দুঃখ অপেক্ষা করছে। ফরহাদের সঙ্গে দেখা যদি হয় বলবে, আমি তার বন্ধু, ও যেন আমাকে বিশ্বাস করে।

'তোকে আমি বিশ্বাস করতে পারি! আকাশ?' বাবার আর কোনও কথা আমি শুনতে পেলাম না। ফরহাদের মুখটা বারংবার চোখের সামনে উঠে আসতে লাগল। ওকে একবার চোখের সামনে দেখার সাধ হল আমার। এই অমৃত বাসনার কষ্ট যেন বিষবৎ মানুষকে জ্বালিয়ে তোলে। আমি আকাশলীনা, আমি আকাশে লুকিয়ে থাকি। আমাকে কেউ দেখতে পায় না। আলো আসে। কিন্তু কার আলো কেউ জানে না। কান্না শোনা যায়, কার কান্না কেউ জানে না।

৯. বি. বি. সি. রেডিও—বোবা কালা পাগল মিনসে এক অপরূপ বেহালা বাজায়

ক্রমশ মা আমার চোখে দুর্বোধ্য হয়ে উঠছিলেন। দিন কে দিন। কথা বলতে আমাদের ভয় করছিল। আমরা বুঝে ফেলেছিলাম, লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই তারা এমন কিছু উক্তি করবে, যা আমরা হজম করতে পারব না।

কিন্তু তারও চেয়ে মারাত্মক হয়েছিল মায়ের সেই প্রস্তাব। প্রভাস, নির্মল, অঞ্জন, সত্যব্রত, এদের মতো কেউ আমায় বিয়ে করবে। ফরহাদকে ভুলে যেতে হবে। বাবরি মসজিদের কাঠামো ভেঙে ফেলেছে শিবসেনা, পাঁচ ঘণ্টা ধরে ঐতিহাসিক পুরা-নিদর্শনটিকে ধূলিসাৎ করা হয়েছে। তারপর প্রোমোটারদের কারসাজিতে শোনা যাচ্ছে কলকাতায় দাঙ্গা হয়েছে। খবরের কাগজে কয়েক কিস্তিতে সাংবাদিক সেই দাঙ্গার বিবরণ লিখেছেন। কৃষ্ণেন্দু চাকী সেই দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বস্তিগুলির স্কেচ এঁকেছেন।

মনে পড়ে ফরহাদ বলেছিল, দুধসর ধানক্ষেত কাব্যগ্রন্থের কবি আনসারুল ওরফে বাবু বদ্যির কথা। কৃষ্ণেন্দুই সেই প্রচ্ছদের শিল্পী। অন্ত্যজ মুসলমানের কবিতাবলীর ছবি তাঁরই আঁকা, তিনিই এঁকেছেন বিধ্বস্ত বস্তির ঝলসানো জীবনের মন কেমন করা উজাড় হওয়া নিঃস্ব গরিবের অবশিষ্ট, মানুষের অবশিষ্ট, মানুষ পালাচ্ছে, মানুষ মরছে, ঊর্ধ্ববাহু মানুষের ছবি, তাঁরই তুলির আঁচড়ে খবরের কাগজে ফুটে উঠেছে। প্রোমোটার দাঙ্গা বাধিয়ে তুলে গরিবের বস্তির দখল নিতে চায়। সেখানে গড়ে উঠবে বহুতল সৌধ, কোনও ব্যবসায়িক মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং অথবা কোনও আবাসন।

খবরের কাগজের দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র একটা মূক ভয়, সীমাহীন ত্রাস ঝাপটায় ঝাপটায় উঠে আসে। কৃষ্ণেন্দুর ছবিতে জীবন মুছে যাওয়া একটা ভাঙা নেতানো কুকুরের প্রতীক, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা পাখি, আর কিছু নেই।

BanglaBook.org

মানুষ যে মানুষের মাংস খায়, যুদ্ধে দাঙ্গায় প্রতীকী প্রমাণ আছে। মানুষকে মারতে মারতে মানুষের সভ্যতার এগোনো। বোমা ফেলতে ফেলতে, অসি চালাতে চালাতে সভ্যতার রথ এগিয়ে যায়। ধর্মের রথও এভাবেই এগিয়েছে। অসি চলেনি অথচ ধর্ম টিকে থেকেছে, এমন ধর্ম কল্পনার বস্তু, কোনও অবতার বা পয়গম্বরের তেমন ধর্ম পৃথিবী দেখেনি, যাতে রক্ত ঝরেনি। অথচ প্রত্যেক ধর্মই শান্তি চেয়েছে, যারা শান্তি কল্যাণ চায়, সেই ধার্মিককে বধ করাও ধর্মেরই ইতিহাস।

বাবা বলেছেন, কোনও বিশেষ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যারা উগ্রভাবে কথা বলে, বাবরি ধ্বংস না করলেও, সোমনাথ মন্দির লুঠ না করলেও তারা অত্যন্ত পাজি লোক। স্বামী বিবেকানন্দই বলেছেন, প্রত্যেক লোক মনে করে তার ধর্মই শ্রেষ্ঠ। তিনি একটি কুঁয়োর ব্যাঙের গল্প বলেছেন। কুয়োর ব্যাঙ ভাবে কুয়োই সবচেয়ে বৃহৎ জলাশয়। তার বাইরে কিছু নেই। সে কখনও সমুদ্র দেখেনি, সমুদ্র তার কাছে মিথ্যা। মানবতাই যদি শ্রেষ্ঠতম ধর্ম, তাহলে ধর্মের এত ভাগ কেন? পৃথিবীর সব ধর্ম এক হয় না, যেমন সব বামপন্থী শত সহস্র ভাগে আলাদা হতে থাকে। একটা কংগ্রেসেই কত রকম নেতা, কত বাহারি ব্যক্তিত্ব।

মানুষ খুন না করলে সভ্যতার উদ্ধার নেই। এ কথাই নানাভাবে প্রমাণ করা হয় এই দেশে। সর্বত্র হয় পৃথিবীর দেশে দেশে। বাবা সহজ করে বলেছেন, সব লোকই যেমন প্রকৃত ধার্মিক নয়, সব লোকই প্রকৃত বামপন্থী নয়। আমার আজ মনে হয়, প্রকৃত ধার্মিক এবং প্রকৃত কমিউনিস্ট খুঁজে ফেরা সমান কষ্টকর। ও কাজ আমার জন্য নয়।

আমি আর খুঁজব না। কখনও ধর্ম খুঁজব না আমি। কখনও খুঁজব না একজন কমিউনিস্ট, কোনও দল খুঁজব না। কখনও ভোট দেব না। প্রমাণ করার চেষ্টা করব না, আমি এই দেশের কত বড় নাগরিক। একজন অত্যন্ত অশিক্ষিত লোকও আমাকে নাগরিকতা বোঝাতে আসে। পঞ্চায়েতি মেম্বার আমাকে ভোটাধিকার এবং নাগরিকতার কো-রিলেশন বোঝায়। আমি অত্যন্ত নিকৃষ্ট, স্বার্থপর, বদ লোকের মুখে নাগরিকতা বুঝব কেন?

ধান্দা করা একটা বাজে লোকের কাছে ধর্মতত্ত্ব শুনব কেন? এমনকি দাদিমায়ের মুখে মারফতি লাইনের 'শৌখে দিদার অগর হ্যায় তো নজর পয়দা কর'—শুনব কেন? তিনি তো নিজেই জানেন না, শরিয়ত আর মারেফত, ঠিক কোনটি তাঁর পথ।

আমি শুনব না। মানব না আমি। দেশের বড় বড় নেতাদের উগ্রপন্থীদের হাতে মৃত্যু হলে আমার আনন্দ হয় কেন? রাষ্ট্র যখন শোক প্রকাশ করে, আমার ভারী আমোদ হয়। আমার কষ্ট হয়, যখন আমারই মতো কোনও মেয়ে ড্রাগ নিতে নিতে শেষ হয়ে যায়। বাংলা পড়েছি, অথচ আমার হিন্দি-সিনেমা দেখে হঠাৎ একদিন খুব ভাল লেগেছিল। নানা পাটেকর যখন কোনও একজন নেমকহারাম, শয়তানকে পেটায়, মুখ দিয়ে রক্ত তুলে দেয়, আমার ভাল লাগে, গুলিতে পুলিশ মরলে অত্যন্ত আনন্দ হয়। ভীরু পুলিশের পালানো দেখে রুপালি পর্দায় আমি খুশি হই। অবশ্য সিনেমা কখনওই বেশি দেখিনি।

আমি ঘুসখোর অফিসার দেখিনি সিনেমা ছাড়া। সমকামী দেখিনি বাস্তবে। সমকামীরা যখন বিদেশে ক্লাব গড়ে, মিছিল করে, দাবি তোলে, কোর্টে মকদ্দমা করে, আশ্চর্য হই! এডস ছড়াচ্ছে শুনে, মানুষ যে গরু ছাগলের মতন মরবে সে কথা শুনে কেমন মায়া হয় জীবনের জন্য। ক্যান্সারে কেউ মারা গেল শুনে একা কেঁদে ফেলেছি, এমন ঘটনাও আছে। ও সব তো কেউই বিশ্বাস করবে না।

আমি ছোট ছোট ঘটনায় কেঁদে ফেলি। আবার ভয়ংকর, সাংঘাতিক ঘটনায় চুপ করে

BanglaBook.org

থাকি, কাঁদতে পারি না। শেখর আনসারির মৃত্যুতে কাঁদিনি। অনেক পরে কেঁদেছি, জোয়াল-কাঁধে করা ছোট বকুল আর ফরহাদের জন্য, কিভাবে গরুর গাড়ি টানছে সেই দৃশ্য কল্পনা করে। আমি এ রকম কেন ?

বাংলাদেশের ঢাকেশ্বরী মন্দির ধ্বংস করেছে ওই দেশের উগ্র ধর্মান্ধ লোকেরা। যেদিন সংবাদপত্রে একথা ছাপা হল, লজ্জায় বাবা মুখ তুলতে পারেননি সারাদিন। যদিও সংবাদটি ভুল ছাপা হয়েছিল, তবু বাবা মনে করেন, মন্দির ধ্বংস হতেই পারত। সে দেশের এক লক্ষ লোক কোমর বেঁধে সীমান্ত পার হয়ে অযোধ্যা অভিযান করছিল, বাংলাদেশ রাইফেলস সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। মন্দিরটি, ঢাকেশ্বরী অক্ষত রয়েছে। তথাপি প্রতি মুহূর্তে আমরা আশঙ্কা করছিলাম, যদি সাংঘাতিক কোনও উগ্র অত্যাচার বাংলাদেশে হয় সেখানকার সংখ্যালঘুর উপর, তাহলে এখানে তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে ! মনে পড়ে, বুশ-সাদ্দাম লড়াই বাধলে, সাদ্দামকে দায়ী করার জন্য কিছু হিন্দু প্রকাশ্য রাস্তাঘাটে তীব্র অভিযোগ শোনাচ্ছিল, ফরহাদকে তথাকথিত অনেক বিদ্বান ব্যক্তি কলহের সুরে বলেছেন, এই যুদ্ধে মুসলিম বিশ্ব এক হয়ে যাবে, কিন্তু শুনে রাখুন হিন্দু কখনও এক হয় না। আপনাদের মধ্যে ভয়ংকর একতা আছে।

বাবার সামনে ফরহাদ এই ঘটনার কথা বলতে বলতে রেগে যেত, আশ্চর্য তপ্ত দেখাত ওকে। সাদ্দামের জন্য কোনও কোনও মসজিদে দোয়া-দরুদ হয়েছে, অত্যন্ত দুঃখের কথা মামা, এই মুসলমানকে কখনও বোঝাতে পারিনি, সাদ্দামের জয় অথবা পরাজয়ে ইসলামের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। পশ্চিমবঙ্গের একজন দরিদ্র মুসলমান ক্ষেত মজুরের পক্ষে খাঁড়িযুদ্ধ কোনও ধর্মযুদ্ধ নয়, তার রুজিরোজগারের সঙ্গেও এর কোনও প্রত্যক্ষ যোগ নেই। তুমি গরিব মানুষ, সাদ্দাম একজন গরিব রাষ্ট্রনায়ক, তাই যদি ওকে সমর্থন করে থাকো, করো—কিন্তু কোনও মৌলানা যদি তোমাকে মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বোঝাতে আসে, তাহলে বোলো , গড়াইবাবুদের জমির ভাগচাষী তুমি, তোমার পক্ষে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোঝা অসম্ভব। তুমি ওই দোয়া-দরুদের মধ্যে নেই। কাউকে সমর্থন করতে হলেই কি খোদার কাছে হাত তুলে তা করতে হবে !

ফরহাদ হেসে উঠে বলেছিল—আমি বিলাসপুরের মসজিদে ওই দোয়া-দরুদের প্রোগ্রাম বানচাল করে দিয়েছিলাম মামা ! কিন্তু টিভিতে রামায়ণ সিরিয়াল দেখার ব্যাপারে খুদি চাচীকে নিরস্ত করতে পারিনি। আমার কি মনে হয় জানেন, এখানকার মুসলমানের মধ্যে এক ধরনের রামভক্তি আছে, সীতার কাহিনী শুনে চোখ ছলছল করে না, এমন মুলসমান মেয়ে আমি কমই দেখেছি।

বাবা বলেছিলেন—এস, ওয়াজেদ আলির ভারতবর্ষ, সেই ট্রাডিশন, মনে আছে তোমার ? বোধহয় 'মাশুকের দরবার' বলে যে একখানা চমৎকার গ্রন্থ লিখেছিলেন ওয়াজেদ আলি, তারই মধ্যে ওই প্রবন্ধটা আছে। আকাশ বলতে পারবে। কিন্তু আডবাণীর রথ সেই ট্রাডিশন থেকে মুসলমানকে বাদ দিয়ে পর করে দিতে চায়, তাঁর ধর্মবুদ্ধি, খুব খারাপ ফরহাদ। লোকস্তরে রামচন্দ্র যা ছিলেন, তাঁর সেই ভাবমূর্তি নষ্ট করা হল। হিন্দুর ধর্মে মুসলমানের অধিকার না থাকতে পারে, কিন্তু ধর্মের কাহিনীতে তার ছিল অবাধ উপভোগ, কথাটি একটু সাজানো হয়ে গেল ভাষার দোষে, কিন্তু রামের পালাগানের উপভোক্তা, নটনটী যে মুসলমান হতে পারে, এ তো সত্য ফরহাদ। এ খুবই সত্য কথা।

ফরহাদ সোৎসাহে বলে উঠেছিল—আমার মা, বুঝলেন মামা ! বিয়ের আসরে ঢোল বাজিয়ে কৃষ্ণগান করতেন। শাদির গান। সেই সব গান মায়েরই রচনা। বোন কমলা, সে-ও জানে। "ঘরে আমি হলুদ লাগাইলাম, হলুদ আমার জলদি হয়—কোন্ শহরে বাঁশি

BanglaBook.org

বাজে হায় রে, সেই শহরে চলে যাই।" এ হল কৃষ্ণের বাঁশি। মুসলমানের শাদি, তাতে কৃষ্ণের বাঁশি নিয়ে গানের ধরতাই। কষ্ট হয় মামা। বিলাসপুরে এসে সেই গান বন্ধ করতে হল।

—কেন ?

—সে বিস্তর কচালি হয়েছে, পরে বলব। আপনি নিশ্চয় জানেন, পাকিস্তানে প্রত্যেক বছর কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের মানুষকে সুন্নীরা হত্যা করে। কেন করে ? বাংলাদেশে আহমদিয়াদের কোরান পুড়িয়ে দেয় ওই শরিয়তীরা। কেন দেয় ? ধর্মের নামে অত্যাচার আমাদের ভাগ্য মামা ! ওয়াজেদ, আলাওল, এঁরা কী করতে পারেন ? নজরুল ইসলাম ছেলের নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণ মহম্মদ, শ্যামাগান বেঁধেছিলেন, নবীগানও করেছিলেন—তাতে কী হল ?

—হ'ল না বলছ ?

—কোথায় আর হল ! সবই মরীচিকা !

বাবা সহসা একটা আশ্চর্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরের কোণে আলনা গোছাতে থাকা আমার দিকে চেয়ে বললেন—তাহলে আমার এই বাংলা অনার্স মেয়েটার কী হবে বল তো ?

—বড় জোর স্কুল মাস্টারি ! তা-ও হয়তো হবে না।

—না। আমি তা বলিনি। আমি অন্য কথা ভাবছি। বলে বাবা আমার দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। আমার হাতের কাজ থেমে গেল।

কৃষ্ণেন্দুর পাখিটা মনে হচ্ছে উপসাগরীয় যুদ্ধের সেই পাখিটা। তেল ভাসছে টিভির স্ক্রিনে, ভূমধ্য-সমুদ্র তৈলাক্ত। কুয়েতের নাভিমূল থেকে উদ্গত হচ্ছে অবিনশ্বর অগ্নি, কেয়ামতের মতো তার দাহিকাশক্তি আকাশে লম্বমান—কোথায় উঠেছে সেই প্রলম্ব অগ্নিশিখা। কোথায়, কোথায়, কতদূর।

সমুদ্র তরঙ্গ-সঙ্কুল, তটভূমে কালো তেলের লীলায়িত দীর্ঘশ্বাস, একটি কৃষ্ণবর্ণ বিহঙ্গ বারবার পাখা ঝাপটে তরঙ্গশীর্ষ থেকে আর এক তরঙ্গে আশ্রয় খুঁজছে, সে চায় সবুজ স্নিগ্ধ মরূদ্যান, সে চায় বৃক্ষপুষ্পশোভিত মধুস্রাবী গন্ধবহের মৌতাত, তার ডানায় যুদ্ধের গন্ধ, তৈলমসীলিপ্ত অন্ধকারে তার এখনও আকাঙ্ক্ষা, শুধু উড়ে চলার স্পন্দন এখনও নিবে যায়নি, কিন্তু কোথায় যাবে সেই পাখিটা ! জানি, ও আর বাঁচবে না।

কৃষ্ণেন্দুর পাখিটার দিকে চেয়ে আছি আমি। কলকাতায় আগুন লেগেছে, মা এই কলকাতায় ফিরে যেতে চান। তাঁর প্রত্যাবর্তনের সেতুটির নাম আকাশলীনা। তা একটি রামধনুর মতন আকাশে টাঙানো, ওই তো ওখানে খাঁড়িযুদ্ধের পাখিটা উড়ছে, ও আর বাঁচবে না।

কবি সমরেন্দ্র আমার নামটি রেখেছিলেন। কিন্তু কবি জীবনানন্দের কাছে থেকে নামটি ধার করা। জীবনানন্দের একটি কবিতার নাম আকাশলীনা। অনার্সের সহপাঠী একজন আমায় দেখেই চোখ উপরে তুলে আকাশলীনার পংক্তি আউড়াত, আমি সেই আবৃত্তির জবাবে নিঃশব্দে শুধু হাসতাম। ও সুরঞ্জনার স্থানে আকাশলীনা বসিয়ে ব'লে উঠত —

আকাশলীনা
তোমার হৃদয় আজ ঘাস
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।

আশ্চর্য এক শূন্যতা জেগে উঠত মনে। তারপরই সেই ছেলেটা, ভাস্কর, বলে উঠত —

BanglaBook.org

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে ;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার।

তখনও হাসতাম আমি। হাসি দিয়েই বালকের মতো দুষ্টু-ভদ্র ভাস্করদের সরিয়ে দেওয়া অনেক মেয়েই করে। তা যেমন লঘু প্রশ্রয়, তা তেমনই সতর্ক উপেক্ষা। কিন্তু ফরহাদ কখনও তোমাকে উপেক্ষা করিনি। তুমি ফরহাদ কাদিয়ানি, তুমি ফরহাদ আহমদিয়া, তুমি ফরহাদ আনসারি, তুমি কি মনে কর আমার হৃদয় আজ ঘাস হয়ে গেছে! আমি কি আকাশের ওপারে আকাশে রয়েছি, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেছি আমি? কখনও কি এই মাটির উপর দাঁড়াতে পারব না, আমার নামটাই কি আমার চরম ব্যর্থতা! আকাশের ওপারে আকাশ রয়েছে, আমি জানি। কিন্তু তারপর সেই আকাশ কোথায় গিয়েছে আমি জানি না— সেই পরপারে, পৃথিবীর ওপারে, আকাশের আড়ালে যে আকাশ, সেখানেও একটি নদীর শিয়রে এপার ওপার জুড়ে রামধনু গোল হয়ে উঠেছে, একটি অতি বৃহৎ 'গেট' সাজানো হলে যেমন হয়, ওটা আসলে ব্রিজ একটা— ওর উপর দিয়ে চিরকালের মানুষ পার হয়ে চলেছে, যাযাবর মানুষ, ছিন্নমূল, যুদ্ধের তাড়া খাওয়া, বিধ্বস্ত, ভীত মানুষ। দাঙ্গা করা, লিঙ্গ দেখে ধর্ম-নির্ণয় এবং নগ্ন করা ধার্মিক, আজান দেওয়া মোয়াজ্জিন, হাতে শাবল-গাঁইতি শিবসেনা, খাঁকি হাফপ্যান্ট পরা, স্যান্ডোগেঞ্জির লোকটিকে রডে বসিয়ে সাইকেল চালিয়ে চলেছে দুবাইয়ের দাউদ ইব্রাহিম, শেকলপরা সঞ্জয় দত্তকে একটা পেয়াদা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, ওকে চোখ মারছে মাধুরী, মাধুরী গান গাইছে ধক্ ধক্, ধকা ধক...

রামধনুর মতন সেতুর গায়ে মোটর বাইকে বোমা রেখে চলে গেছে কে, কেউ জানে না। রাম জেঠমালানি ওই পথে হাত নেড়ে নেড়ে চলেছেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বোঝাচ্ছেন তিনি সন্ন্যাসী, সীতার মতন পবিত্র। সালঙ্কারা সীতা চলেছেন, উপরে জটায়ুর মতন ভূমধ্য সমুদ্রের পাখিটা, সীতা মা বললেন, ধরণী দ্বিধা হও।

আমরা হিন্দু আর মুসলমান দ্বিধা হলাম, মৃত্তিকা তেমনই রইল। পাখিটা তখনও উড়ছে। হর্ষদ বাক্স খুলে দেখালেন, ব্যাঙ্কের কত টাকা শেয়ারের ওই বাক্সে ধরে, বহু বাজারের জনৈক বোমাবিস্ফোরক রশিদ তখন উদাসদৃষ্টিতে রামধনুর সাতটি রঙ দেখে চলেছে, এসবই আকাশের ওপারে ঘটে যেতে লাগল। আমার মা ওই সেতু পার হয়ে প্রত্যাবর্তন করবেন, ওখানে একটি কৃষককে মাস্কেট দিয়ে মেরে নদীর জলে ফেলে দেওয়া হল। 'ফিনা রে জাহান্নামা খলে দিনা ফিহা'। শয়তানকে নরকের আগুনে নিক্ষেপ কর হে পরমেশ্বর।

তখন কমলার মায়ের গলায়, 'ঘরে আমি হলুদ লাগাইলাম' গানটা ঢোলের কাচাইরি করতে করতে থেমে গেল। তিনি আত্রিকে মারা গেলেন। দাদিমা মরুভাস্কর মুহম্মদজী, তার নামের নবীগান করছেন নীচে চাঁদপুরে, দু'দিন আগে ইত্তেকাফ থেকে বার হয়েছেন। উনি গাইছেন, কে. মল্লিকের সুরে—

রোজ হাসরে করতে বিচার
তুমি হবে কাজী
তখন তোমার দিদার কভু
পাব কি আল্লাজী ॥

ঝলমল করছে নদীর আকাশে রামধনু। একটি আশ্চর্য সেতু। মা প্রত্যাবর্তন করবেন ওই পথে।

একা এই বাড়িতে আমি দোতলায়। নীচে দাদিমা। মা নেই। বাবা নেই। রুদ্র

BanglaBook.org

নেই।

হঠাৎ কী মনে হওয়ায় সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে আসি। আমার হাতে সেই গোল আয়নাটা। দাদিমা গাইছেন ঈশ্বর-দর্শনের গান। বলছেন, একবার যদি পবিত্র খোদাকে তিনি দর্শন করতে পারেন, কারণ রোজ হাসরে পুনরুত্থানের দিন খোদা মানুষের বিচার করার ছলে বান্দাকে দেখা দেবেন। পাপপুণ্যের বিচার তাঁর উপলক্ষ, আসল লক্ষ্য মানুষকে দেখা দেওয়া। দাদিমা গাইছেন, তোমাকে দেখে আমার এই দেহ পবিত্র হয়ে উঠবে, সেই পবিত্র দেহকে কি দোজখের আগুন আর ছুঁতে পারবে ?

হই না কেন পাপীতাপী
হই না বে-নামাজি
(খোদা) তোমায় দেখে হাজারো বার
দোজখ যেতে রাজি।
সেদিন তোমার দিদার আমি
পাব কি আল্লাজী ?

সেই দাদিমার সামনে এসে আচমকা ভূতের মতন দাঁড়াল ফরহাদ আনসারি। তাকে দেখেই দাদিমায়ের গলার গান সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল। তিনি গম্ভীর বিস্ময় আর অপ্রসন্নতায় শুধু বলে উঠলেন— ও, তুমি ? কিন্তু কেউ তো নেই !

ঠিক এই সময় আয়না হাতে ফরহাদের সামনে এসে পড়লাম। ফরহাদ সলজ্জভাবে বলল— এক গেলাশ জল দে আকাশ। খেয়েই চলে যাব। এই তো শিরিঁ রয়েছে, তুমিই বলেছিলে নানি !

দাদিমার দেহ হঠাৎ শক্ত সটান হয়ে গেল। মুখে অদ্ভুত ছোট মতন ঝামটা দিয়ে কঠিন সুরে বললেন— না, আমি বলিনি।

মুখের আলো দপ করে নিবে গেল ফরহাদের। অপ্রতিভ দেখাল তাকে। হতাশ এবং বিষণ্ণ গলায় হকচকিয়ে থেমে সামলে নিয়ে বলল— ও, তাহলে বলনি ?

—না।

—তুই পানি দিবি না আকাশ ?

তখন কী যে অভিমান হল আমার বলতে পারব না। হতভাগী আমি, সিঁড়ির তলায় সবশেষ নীচের ধাপে দাঁড়িয়ে রেলিঙ ধরে মাথা নাড়তে নাড়তে কেঁদে ফেললাম। ঠোঁট চেপে থামাতে থাকলাম আমার ভিন্ন হওয়া হৃদয়কে। বললাম মনে মনে, শব্দ কোরো না।

—মরুভূমির কুকুরকেও মানুষ পানি দেয় নানি। তুমি দেবে না ? আমি কী করেছি, বল, আমি কী করেছি ? আমি অনেক বড়লোক হব নানি, আমার অনেক টাকা হবে। আমি ফার্স্টক্লাস পেয়েছি, কলেজ সার্ভিস কমিশনে আমি ইন্টারভিউ দেব। আমি প্রফেসর হব। আমি অ্যাপ্লায়েড ম্যাথমেটিক্সের লোক। আমি তোমার বরের মতন মেধাবী। তুমি ভেবে দ্যাখো, আমি তোমার আমানত, আমি সংখ্যালঘু, আনসারি। কোরানের কথা নানি, আমাকে রক্ষা করা কর্তব্য তোমার।

—না।

— দি ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ সার্ভিস কমিশন, ১৪৭-এ রাসবিহারি অ্যাভেনু, ক্যালকাটা উনত্রিশ। শোন, এখান থেকে চিঠি আসবে আমার নামে। হ্যাঁ গো ! কী লেখা থাকবে জানো, দি কমিশন হ্যাজ বিন প্লিজড্ টু সিলেক্ট অ্যান্ড রেকমেন্ডেড দি নেম অফ ফরহাদ আহমদ আনসারি ফর দি পোস্ট অফ লেকচারার ইন অ্যাপ্লায়েড ম্যাথ ইন... বল্ আকাশ,

BanglaBook.org

আমি কোন্ কলেজে পড়াব ? বল্ না ?

—না। দাদিমা তথাপি বললেন দৃঢ়স্বরে, না।

—তাহলে ? ফরহাদের সমগ্র দেহকাঠামো কুঁকড়ে গেল। ও এমন এক নিঃসহায় ভঙ্গিতে নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল যে, আমি আর সইতে না পেরে নিজের মুখে হাত চেপে ধরে কান্নাকে নিরুদ্ধ করে দ্রুত দোতলায় পালিয়ে আসি। চোখের জল সংবরণ করবার চেষ্টা করি এবং কুঁজো থেকে গেলাশে জল গড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াই। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে দেখি, ফরহাদ চলে গেছে। আমার হাতে ধরা রইল জলভর্তি গেলাশ।

দাদিমা আমাকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক গলায় থমকে দাঁড়িয়ে বললেন— তুমি কিছু মনে কোরো না আসমানতারা। বেচারি একেবারে পাগল হয়ে গেছে।

—পানি খেয়ে গেল না দাদিমা !

—ওকে কী করে রক্ষা করব মা ! আমাদের কে রক্ষা করে ? ও যদি আমার আমানত হয় আসমান। আমি কার আমানত ? তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কী করতে পার ?

—তুমি মিথ্যা বললে দাদিমা !

—না, লীলা ! আমি ইনকার করেছি। মিথ্যা তো বলিনি।

—কেন করলে ? তুমি তোমার খোদার কাছে আমাদের জন্য মোনাজাত করেছিলে !

—তোমার কারণে করেছি লীলাবতী ! খোদা জানে, আমার দোষ নাই। হরসন এই জেলায় বাউলের ওপর অত্যাচার করে লোকে। জীবনভর লুকিয়ে লুকিয়ে থাকবি মা ! ফরহাদের ঘরণী হলে ওই বিন্দু বৈষ্ণবীর ধারা তোর অপমান হবে লক্ষ্মী মা ! মুস্তাফা আমাকে সব বলেছে। বাউলের গান শোনা যায়, জীবন মানা যায় না আসমান।

—ফরহাদ বাউল নয়, দাদিমা !

—আনসারি। কলু, জোলা, সাহাজি— এরা বাউল হতে বাধ্য, জাতের হিন্দু, জাতের মুসলমান, কেউ এদের সতর দেয় না। একবার টানে তো দশবার ফেলে দেয়।

—ভালবাসা ! তুমি ফরহাদকে ভালবাস না ? তুমি কখনও তা হতে পার না দাদিমা ! তুমি আমার সুফি দাদিমা ! তুমি মানুষকে ঘৃণা কোরো না। তোমার আয়নায় আমি মুখ দেখেছি। আমার কি পুণ্য হয়নি ? ওকে জল দিলে না ? ওকে তাড়িয়ে দিলে ?

—হ্যাঁ, আসমানতারা। তাই-ই করলাম। তুমি বুঝবে না।

—আমাকে কখনও তুমি পাবে না দাদিমা। কখনও পাবে না। তোমার সঙ্গে কখনও শোব না আর ! কখনও ডেকো না আমাকে। একদম ডাকবে না। আমার কেউ নেই, আমি জানি। কেউ নেই আমার ! কেউ নেই। বলতে বলতে হাতের জলভর্তি গেলাশ মেঝেয় ফেলে দিতেই কাচফেটে জল ছড়িয়ে যায়। দাদিমা চমকে ওঠেন।

জলের একটি ধারা দাদিমার পায়ের পাতায় গড়িয়ে এসে সুদীর্ঘ জিহ্বার মতন স্পর্শ করে। আমার তৃষ্ণা যেন, ফরহাদের জিহ্বায় দাদিকে ছুঁয়েছে। ওই জলের ছোঁয়ায় দাদিমা চোখ বন্ধ করে একটু কেমন শিউরে উঠলেন। কষ্ট আর অস্বস্তির মিলিত অভিব্যক্তি ফুটে উঠল মুখের রেখায়।

—আমি জানি। আমি হিন্দু। বল ?

—এ সব কী বলছ, তুমি ! অমন বলে না !

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি ! তুমি মাকে বিশ্বাস কর না।

—করি। একশবার করি। দীপাকে অবিশ্বাস করেছিলাম, মতি নষ্ট হয়েছিল আমার।

BanglaBook.org

এসব কথা তুলছ কেন ? রেগে যাচ্ছ কেন ? আহ্ ! বলে দাদিমা ভেজা পায়ের পাতা সরিয়ে নিতেই জলের ধারা আবার গড়িয়ে যায়। তাঁকে আবার স্পর্শ করে। তিনি ফের 'আহ্' বলে পা টেনে নিতে গেলে জল আবার তাঁকে ছোঁয়। তা দেখে আমি সচকিত গলায় উচ্চস্বরে হেসে উঠি। চোখে অশ্রু চিকিয়ে ওঠে।

—তুমি পাপ করেছ দাদিমা।

—কী বললে ? পাপ।

—হ্যাঁ।

রাত্রে দাদিমা আমাকে কঁকিয়ে ডেকে রেডিও বি. বি. সি. কেন্দ্র ট্রানজিস্টারে নব ঘুরিয়ে ধরে দেবার জন্য বললেন।

—বি. বি. সি. কেন দাদিমা ? কলকাতা ধরি।

—না। গাঁয়ের সবাই বি. বি. সি. শুনছে। আসল খবর দেয়। সবকতের দোকানে বি. বি. সি.। কলকাতা, বিশ্বাস করি না। বম্বাই করি না। দিল্লি করি না। বাবরির খবর বি. বি. সি.-ই পয়লা এলান করেছে, সাচ্চা জুবান মা ! ক'টা খুন হল, ওই সেন্টারে জানা যায়। ধরে দে। আচ্ছা, বম্বাইয়ের সিনেমার একটা মেয়ে, মুসলমান— কী নাম ?

—শাবানা আজমি।

—হ্যাঁ, শাবানার বাপের কী হয়েছে ?

—কে বলল ?

—বি. বি. সি.। আচ্ছা, দিলীপকুমার মুসলমান ?

—হ্যাঁ।

—তুমি জানো ঠিক ?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়।

—সায়রা ওর বউ ?

—হ্যাঁ।

—দাও, ঠিক করে ধ'রে দাও। শাবানার বাপকে উচ্ছেদ করা হয়েছে ?

—না।

—তুমি জানো না আসমান। গুজব বেরিয়েছিল এরা নাকি গুপ্তচর।

—কারা ? কৈফি আজমি ?

—তোর বাপ একদিন চীনের চর ছিল, জানিস ? লোকে বলত।

—কৈফি আজমি ফেমাস পোয়েট। শায়ের দাদিমা !

—ওই শায়ের টায়ের কিছু না খুকি।

—একই অবস্থা বাংলাদেশেও হয়। হিন্দু কবিরাও সেখানে ভারতের চর।

—মিছে কথা।

—তুমি জানো না দাদিমা ! ওখানকার মুসলমান কবিরাও ভারতের চর বলে বদনাম কুড়ায় অনেকে। যারা ভারতের এই বাংলার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তারা... তাদেরও...

—আমরা কোথায় যাব দিদি ?

—দিদি কে দিদি ?

—ও, না ! নাহ্ ! কী বলছি মা ! পাপ করেছি আসমানতারা ! ঠিক তখনই রেডিও ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনে নব-ঘোরানো কাঁটা লেগে কথা আসে। তারপরই একটি হৃদয়বিদারক বেহালা বেজে ওঠে। মনে হয়, বোবা কালা পাগল মিনসে এক ছড় টেনে অন্ধকার আকাশকে খুঁড়ছে। একটি বিষাক্ত বিছা যেভাবে মানুষের নরম ত্বক ছড়ে দেয়,

BanglaBook.org

জ্বালিয়ে পচিয়ে দিতে চায়। ওই বেহালা সেইভাবে দীর্ণ করে আমাদের সমস্ত।

গভীর রাতে ঘুমের ভিতর দাদিমাকে বোবায় ধরে, ওঁর মস্তিষ্কে ঝিম ধরে, মিনসের পাগল উড়ুক্কু বেহালা মাথার উপর থেকে ছাদ উড়িয়ে দেয়। দাদিমাকে আত্মাসুদ্ধো উপড়ে নিয়ে এক জ্যোৎস্নাধূসর দিগন্তহারা মরুভূমিতে ফেলে দেয়। মরীচিকা সম্মুখে নদীবৎ জ্বলজ্বল করছে। একটি পাহাড় দেখা যায় সুর্মা রঙের, চাঁদের রঙ বেগুনি ধরনের। এক মরূদ্যানে, হলুদ রঙের ফুল ফুটেছে।

দাদিমাকে একটি উট মুখে করে তুলে নেয়। তারপর দাদিমা দেখতে পান উটের পেটের তলে একটি শিশুমুখ। ওখানে বাঁধা রয়েছে বকুল। উটের দৌড় শুরু হয়। প্রতিযোগিতা। শেখেদের খেলা। উপভোগ। বকুল প্রাণের ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। অজস্র শিশু উটের পায়ে বাঁধা, পেটের তলে সরল নিষ্পাপ শিশুরা কাঁদছে। কুয়েতের ভিমূলে অবিনশ্বর লম্বমান অগ্নি, তার পাশ দিয়ে উটের দৌড় চলেছে খোদার কেয়ামত প্রান্তরের দিকে।

একটি উট, যার গলা ধরে ঝুলছিলেন দাদিমা— সহসা পুঁতে যেতে থাকে। উটের মুখ দিয়ে শীতের বাষ্প বার হয়ে সম্মুখের আকাশকে সমাচ্ছন্ন করে দিচ্ছে, একটি জলের ফোয়ারা পাশ থেকে ঠেলে উঠল। দাদিমা উটের গলা ছেড়ে মরুভূমির রূপালি বালিতে পড়ে গেলেন। তারপর তিনি দৌড়তে থাকলেন।

পিছন থেকে একটি জলস্রোত তাঁকে সতৃষ্ণ ময়াল সাপের মতন অনুসরণ করতে থাকল। একটি নদীর তীরে ঢোল কাঁসি বাজছে, ওখানে একটি কিশোরী বউকে সুসজ্জিত করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শ্মশানের দিকে— প্রচুর খই উড়ছে পথে পথে। শঙ্খধ্বনি শোনা যায়। ওখানে হঠাৎ ফরহাদকে দেখা যায়। ওর সারা দেহ দড়ি দিয়ে বাঁধা, পিছনে হাত বাঁধা, মাথা নিচু করা। সারা মুখে কালি মাখানো।

বোবায় ধরেছে দাদিমাকে। ছাড়তে চাইছে না। অজস্র শিশুর কান্নায় আকাশ মথিত হয়ে উঠছে।

দোতলা থেকে ছুটে এসে ডাকলাম— দাদিমা! ও দাদিমা! অমন কেন করছ দাদিমা! ওঠো।

নাড়া দিয়ে দিয়ে সকাতরে ডেকে উঠি। দাদিমা জেগে উঠে আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন।

১০. পাটকিলে মুসার লাল আংটা

ঈদের দু'দিন আগে বাবা কলকাতা থেকে চাঁদপুরে ফিরলেন। ওই দিনই সৌম্যব্রতর চিঠি এল মায়ের নামে। চিঠিটা পড়ল বাবার হাতে। বাবা খাম খুললেন। দীর্ঘায়িত করেই লিখেছেন সৌম্যব্রত।

প্রিয় স্বর্ণদীপা

তোমার বদলির ব্যাপারে যাবতীয় ব্যবস্থা প্রায় পাকা হয়েছে, ডি. আই. রাজি হয়েছেন। ডি. এস. ই-র সঙ্গে কথা বলে রেখেছি, মন্ত্রীর সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে রেখেছি। তুমি দ্রুত স্কুল ম্যানেজিং কমিটির রেজল্যুসন দাখিল কর এবং ভারতীর সঙ্গে জয়েন্ট সিগনেচার করা দরখাস্ত জমা দাও ডিস্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টার (এস. ই.)-র অফিসে। দেরি ক'রো না।

একই দরখাস্তের নকল ভারতীর মারফত কলকাতার ডি. আই-এর অফিসে পৌঁছনো দরকার। দু'জনের সই করা অ্যাপ্লিকেশন এবং দুই কমিটির রেজল্যুসনের কপি অ্যাটাচ্‌ড্‌ করে দেবে সঙ্গে। ভুল করবে না। যদি এই সব স্টেপিং ঠিক ঠিক নিতে পার, হয়তো ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে। লিখে জানাও, কতদূর কী করতে পেরেছ। আমি সামনের মাসে কলকাতা আসব। তখন সেকেন্ডারি এডুকেশন ডিরেকটার এবং সেক্রেটারির অফিসে খোঁজ নেব। তোমার অবস্থা আমি বুঝি। তুমি সহানুভূতি চেয়েছ। তুমি পাবে আমার আন্তরিক বন্ধুত্ব।

কাজটা বে-আইনি ঠিকই, কিন্তু অমানবিক নয়। আমার উপর আস্থা রেখো, আমি তোমার কাজ কর্তব্য মনে করেই করব। আকাশলীনার আচরণে দুঃখ, ব্যথা কিছুই পাইনি, কেননা ও তোমারই মেয়ে! অমন না হলে চলবে কেন! আমার কাছে কখনও ওকে ক্ষমা চাইতে পাঠাবে না। তাহলে আমি কিন্তু অতীতের কোনও একটা দিনের মতন অপমান বোধ করব। ওকে দেখলেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলি মনে পড়ে, আকাশলীনাকে কখনও বাধ্য ক'রো না। ভালবাসা অথবা সম্মানের জন্য আজ আর আমি কোনও ধরনের মাধুকরীতে বিশ্বাস করি না। চিঠির শেষ বাক্যটি কলেজের বাংলাবিভাগীয় এক অধ্যাপকের মনে ক'রে গুরুত্ব না দিলেও চলবে, তবে ক্ষমা চাইতে এলে মনে হবে, তুমি আমাকে ব্যবহার করতে চাইছ, তাতে আমার মানসিক ক্ষতি হবে স্বর্ণদীপা।

শুভেচ্ছান্তে

সৌম্যব্রত।

চিঠিটা পড়ে শেষ করে আমার দিকে এগিয়ে দেবার সময় বাবা আর একবার তাঁর চশমার তলে টেনে নিয়ে শেষাংশ পড়লেন দ্বিতীয় বার। তারপর বললেন— নাও। পড়ে দ্যাখো, চিঠিতে তোমার কথাও আছে। আমার মনে হচ্ছে, চিঠিটা তুমি হয়তো বুঝতে পারবে না। না পারলেই ভাল।

—কী চিঠি বাবা?

—পড়েই দ্যাখো। আর শোন! সৌম্যের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিও। ওটা ওর প্রাপ্য।

—ও!

—হ্যাঁ, ক্ষমা চাইবে! তোমার মা ফিরতে চাইছেন। তুমি তাঁকে সাহায্য ক'রো। সি ডিজায়ারস্‌ টু কামব্যাক। আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে আকাশলীনা! তোমার বয়েস হয়েছে, শোন! আই অ্যাম ইনকেপ্যাবল ইন এভরি অ্যাসপেক্ট অফ লাইফ। এভরি অ্যাসপেক্ট বলতে, এই ফিজিকটাকেও বোঝায়— এই যে দেহ, নরদেহ, এটাও। এর কোনও কার্যকারিতা নেই, এটা ভুয়া। মিথ্যা।

—বাবা!

—হ্যাঁ, আকাশলীনা! আই অ্যাম কমপ্লিটলি ডিজএবলড্‌। তুমি সৌম্যব্রতর কাছে ক্ষমা চাইলে তার ইগো স্যাটিসফায়েড হবে। এটা দরকার। তুমি যে তোমার মায়ের মতন, কতটা মায়ের মতন, তুমি জানো না! চিঠিটা একবার পড়, বুঝতে পারবে। বলতে বলতে বাবা তাঁর আরামকেদারায় ধীরে ধীরে বসে পড়লেন।

বাবার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে চিঠিটা দ্রুত পড়ে ফেলি আমি। মেয়ে বলেই হয়তো আমার অসুবিধা হয় না সৌম্যব্রতর মনের সূক্ষ্ম তরঙ্গগুলি বুঝে নিতে। আমি যখন তাঁর কাছে ক্ষমা চাইব, তখন এই দেহ হয়ে উঠবে অতীতের স্বর্ণদীপা, তাঁর পায়ের কাছে নত হওয়ার মধ্যেই রয়েছে প্রত্যাখ্যাত সৌম্যব্রতর ক্ষুধার্ত হৃদয়ের তৃপ্তি। আবার ক্ষমা চাইতে গেলেও অনর্থ হয়। কেননা সৌম্যব্রত মনে করবেন, মায়ের নির্দেশে আমি গেছি, বাধ্য

BanglaBook.org

হয়ে। ফলে, সেক্ষেত্রেও তিনি অপমান বোধ করবেন। ভাববেন আমাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে মা সৌম্যব্রতকে দিয়ে বে-আইনি কাজ করাতে চাইছেন। মায়ের হিউম্যানিট্যারিয়ান গ্রাউন্ডে আশ্চর্য জটিল ভালবাসা প্রবেশ করল আজ। বাবা আমার মুখের প্রতিটি তরঙ্গ লক্ষ করছিলেন।

সহসা ইমাম বলে উঠলেন— সৌম্যব্রত যে জিতেছে, একথা তার প্রকাশ করার দরকার হয়ে পড়েছে আকাশ। খুব দরকার হয়েছে। সে দেখাতে চাইছে, সে সব পারে, আইন না থাকলেও পারে। যেহেতু সে কর্তব্য বোধ করেছে। একজন এম. পি.-র কর্তব্যবোধ সাংঘাতিক হতে পারে আকাশলীনা। 'তুমি পাবে আমার আন্তরিক বন্ধুত্ব'। এখানেই কি চিঠিটা শেষ হতে পারত না?

—না।

—কেন?

—আমি ওঁকে উপেক্ষা করে চলে এসেছি সেদিন।

—কেন এসেছ?

—জানি না। মনে হয়েছিল, মা সত্যিই লোকটাকে ব্যবহার করতে চাইছে। এবং ওঁকে আমার ভাল লাগেনি। আচ্ছা, সত্যব্রত কে বাবা?

—সত্যব্রত?

—প্রভাস, নির্মল, অঞ্জন, সত্যব্রত।

হঠাৎ-ই আমার সত্যব্রত নামটা মনে পড়ে। আমি আর দেরি না করে দিল্লি থেকে আসা চিঠিখানা ছেঁড়া খামের মধ্যে পুরে দোতলায় চলে আসি। খাটের বিছানায় মায়ের বালিশের তলে গুঁজড়ে দিই সেটাকে। এখানে বাবা মা শুয়ে থাকেন। অথচ ওঁদের মধ্যে শরীরের কোনও সম্বন্ধ নেই। বাবা কী কথা শোনালেন আমাকে! ভালবাসায় শেষ হওয়া মায়ের চোখে চাইতে পারছিলাম না আমি।

ছাদের রেলিঙে কাপড় মেলে দিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন মা। হাত ভেজা।

বললাম— চিঠি মা!

—কার চিঠি?

—দিল্লি থেকে এসেছে। এম. পি-র চিঠি।

—ও, রেখে দাও।

—বালিশের তলে রইল।

—তুমি পড়লে?

—হ্যাঁ।

—কেন পড়লে?

—ওতে আমার কথাও আছে।

—কী আছে? তোমার কথা? কেন?

—পড়লেই বুঝবে। বলে আমি ছাদের উপর চলে যাই। দেখি, রেলিঙের ঝুলন্ত ভেজা শাড়ি বাতাসে তরঙ্গের মতন কাঁপছে, ক্রমাগত। তার রোদলাগা আলো চোখে লাগলে চোখ বুজে আসে।

আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে আকাশলীনা। বাবার এই উক্তি রোদলাগা রঙিন গভীর কাপড় পিছলানো আলোর মতন দুঃসহ। বাবা কি মনে করছেন তিনি হেরে গেছেন?

নীচে নেমে আসি তাড়াতাড়ি, মায়ের দিকে চাই না আর। এসে সিধে বাবার কাঁধে

BanglaBook.org

হাত রেখে বলি—তোমার কি কাউকে ঈর্ষা হয় বাবা ?

—ঈর্ষা ? একজন শেষ হওয়া মানুষের ঈর্ষা শোভা পায় না আকাশ। শেষ মানে কিন্তু ব্যর্থতা নয়। অবাক লাগছে ভাবতে, সৌম্যব্রত সম্মান ভালবাসার মাধুকরী করে না। সংসদীয় লেফট পলিটিক্স আজ মানুষকে এতটাই অহঙ্কারী করেছে ! ওকে কে চিনত, যদি লেফটফ্রন্ট না থাকত।

মা নীচে নেমে এসেছিলেন। হঠাৎ মাকে দেখেই প্রশ্ন করলাম—সত্যব্রত কে মা ?

—তুমি বুঝতে পারনি ?

—না।

—সৌম্যব্রতর বাড়ি থেকে ওভাবে চলে এসেছিলে কেন, বুঝতে পারনি তো !

—মা !

—শোন ! উপরে এসো।

উপরে আসি মায়ের পিছুপিছু। মা ঘরের মধ্যে টেনে এনে বললেন—তুমি আমাকে কথা দিয়েছ। মনে আছে ? মনে রাখবে, আমি তোমাকে কোনও কথা বলিনি। আমি মানুষকে ব্যবহার করি। ব্যাস ! নইলে কে তোমাদের বাঁচিয়ে রাখত ! আমি সব রকম কম্প্রোমাইজ করব। আমার জীবনটা কী ? দয়া, স্রেফ অন্যের দয়া। যাও। কথা বোলো না অবিবেচকের মতো।

তখনই নীচে ফরহাদের গলা শোনা যায়। আমার মা আমারই একটি হাত শক্ত করে মুঠোয় চেপে ধরেছিলেন, ফরহাদের গলা শুনে মায়ের মুঠি শিথিল হয়ে গেল। আমি পাগলের মতো একতলায় ছুটে আসি। সমস্ত বুকভরা অভিমান আমার। ফরহাদ কি জানে না, আমি ছাড়া ওকে স্পর্শ করার কেউ নেই, জল দেবার কেউ নেই। ও কেমন সকাতরে বলছিল, প্রার্থনার সুরে, প্রায় পাগলপারা হয়ে উঠেছিল ওর নিবেদন, দি ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ সার্ভিস কমিশন হ্যাজ বিন প্লিজড টু সিলেক্ট অ্যান্ড রেকমেন্ডেড দি নেম অফ ফরহাদ আহমদ আনসারি ফর দি পোস্ট অফ্ লেকচারার ইন অ্যাপ্লায়েড ম্যাথ ইন ... বল আকাশ, আমি কোন কলেজে পড়াব ! বল না ?

ফরহাদ বাবার সামনে মোড়ার উপর জুত করে বসতে না বসতে বাবা কোনও প্রসঙ্গ ছাড়াই প্রশ্ন করলেন আচমকা—বাঁচতে হলে অহঙ্কার চাই। অহংকার ছাড়া বাঁচা যায় না। তোমার আছে ?

—জি !

—কনসাসনেস বিকজ অফ ইত্তর সাকসেস, এটা চাই। তুমি পেরেছ, প্রত্যেক মিনিটে মিনিটে যদি একথা তুমি নিজেকে বলতে পার, তবেই বুঝবে তুমি সত্যিই পেরেছ। তোমার কথায়, আচরণে, চিঠি লেখায়, লবজে লবজে এটা যদি নেশার মতন তোমাকে আচ্ছন্ন করে না রাখে, তা হলে তুমি বেঁচে থাকবে কিসের জোরে ! তুমি তোমার সাকসেসকে মিন করো কিনা, দেখতে হবে। নইলে সুখ পাবে কোথায় !

—আজ্ঞে মামা ! আমি কমলার বিয়ের ব্যবস্থা করেছি। আপনাকে বলতে এলাম। কোরবানির খাসিটা আপনার এখানে রাখব বলে নিয়ে এলাম। আয় বকুল, এদিকে।

চেয়ে দেখি, ফরহাদের মুখে দাড়িগোঁফ গজিয়ে আচ্ছন্ন করতে চাইছে তাকে, পরনে সাদা ধুতি লুঙ্গির মতন করে ভাঁজ ফেলে পা অবধি ঝুলছে, গায়ে গাঢ় গেরুয়া পাঞ্জাবি—এমন পোশাকে কখনও তাকে দেখিনি। মনে হল, ও তার কোনও ব্যর্থতার কথাই বলতে এসেছে। আমার মুখের দিকে একবার চেয়েও দেখছে না।

বকুল গলায় লাল আংটা বাঁধা মজাদার মেহেদি ছোপ দেওয়া একটি স্বাস্থ্যবান খাসি

দড়ি টেনে সামনে এনে দাঁড় করাল। তারপর হাফ প্যান্ট পরা, গায়ে হাওয়াই শার্ট পরা কিশোর লাজুকমুখে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—কোথায় কখন থাকি ঠিক নেই মামা! নানি গো, তুমি খাসিটা মাস দুই আড়াই তোমার কাছে রাখো, তুই একটু দেখিস লীনা! একটু আধটু ভাতফ্যান, দু'চারটি দানা মনে পড়লে দিও, ও আর কিছু খায় না। বাবার শেষ চিহ্ন, ওটাকে বেচে দিতেও বিবেকে বাধল।

—তুমি কমলার কথা কী বললে? বাবা শুধালেন।

—ওর আবার বিয়ে দিচ্ছি, ব্যবস্থা যা হোক হয়ে গেল।

—কোথায়?

—তরতিপুর। বিন্দু বৈষ্ণবী ছেলেটাকে জোগাড় করে দিলে। কাজির ছেলের সঙ্গে প্রথমে বিয়ে দিয়েছিল বাবা। ঘরামির কাজ করত, একদিন মাটির দেওয়াল পড়ে চেপে দিলে ছেলেটাকে। জোয়ান ছেলে, জিভ বার হয়ে গেল। একেবারে পশুর মতন মরে গেল বেচারি। এখনও দেখি, ও জিভ বার করে চেয়ে আছে। চোখ দাঁড়িয়ে গেছে, পলক নাই।

—আর বোলো না। আর বোলো না। অত কেন বলছ ফরহাদ! হঠাৎ উপর থেকে নেমে আসা মা বলে উঠলেন। মা কখন নেমে এসেছেন, আমি টের পাইনি।

ফরহাদ মাথা একটু নিচু করে অপরাধীর গলায় বলল—মিনিটে মিনিটে নিজেকে বলি মামা, কী আমার সার্থকতা? কলেজ সার্ভিস কমিশনের ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম। কমিশনের সেক্রেটারির ইনিসিয়াল করা চিঠি পকেটে করে ঘুরছি। চাকরির অফার তো এল। কিন্তু সেক্রেটারির একটা কথা প্রায় মুখস্থই হয়ে গেল ক'দিনে। উনি লিখেছেন, ইন দিস কানেকশন আই অ্যাম ডাইরেকটেড টু সে দ্যাট ইন দি ইভেন্ট অফ ইওর ফেলিং টু অ্যাকসেস্ট দি অফার অফ দি পোস্ট অফ লেকচারার ইন গরিয়া কলেজ অফ ক্যালকাটা, ইট উইল নট বি পসিবল ফর দি কমিশন টু অফার ইউ এ সেকেন্ড চান্স ইন দি নিয়ার ফিউচার।

—যাও! বাবা বললেন সঙ্গে সঙ্গে।

—না, মামা! আমার নিয়ার ফিউচার গেল। দূর ভবিষ্যতেও চান্স আসবে কিনা জানি না। কিন্তু কমলার বিয়ে, তা ছাড়া ওদের ফেলে কোথায় যাব! দেখুন, কমলার নিকে কিনা, মুখপোড়া মেয়ে, ওর কপালে আর সুন্নিঘর হল না। কণ্ঠি বদল করেনি। তবে ফকিরের ঘরেই দিলাম, গৃহী বাউল, জমি জিরেত আছে। সম্পন্ন।

—ও।

—আপনিও কি ঘৃণা করেন নাকি!

—ঘৃণা! কী বলছ তুমি?

—আমি তো বিশ্বাস করি না। সুন্নি শরিয়তীদের ঘর দোজখ মামা। কোনও সিকিউরিটি নেই। কথায় কথায় তালাক দিয়ে বসে। মোল্লা মৌলানার উপদ্রব আছে। বিন্দু বৈষ্ণবীর উপর আমার রাগ ছিল, এখন সে সব পড়ে গেছে।

—এই গেরুয়া ... দাড়ি কামাওনি। বাবা কী সব ভেবে হঠাৎ বললেন।

—কিছু না। এমনি।

—তুমি বদলে গেছ ফরহাদ!

—জি?

—তোমার কাঁধটা কি আর ছুঁতে পারব?

BanglaBook.org

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কেন নয়। আমি তো আছি। এই কাঁধ, এ তো আপনারই হাত রাখবার জায়গা মামা! আমি আপনার গুণমুগ্ধ। গঞ্জের এক চায়ের দোকানে বসেছিলাম। শুনলাম আপনি এসেছেন। বকুলকে সঙ্গে করে এই খাসিটা নিয়ে বার হয়েছিলাম। নদী পার হয়ে সরসাবাদ যাব, এক খালার ওখানে বাবার কোরবানি, এই পাটকিলেটাকে রেখে আসব ভেবেছিলাম। তো ... যাক গে।

—তুমি চাকরিটা নেবে না কেন?

—ও ঠিক আপনাকে বোঝাতে পারব না। অত দূর কলকাতা ... তা ছাড়া কমলা, মৌলি, এই খাসিটা ... এ সব আছে তো। আপনারা আছেন। নানি, মামিমা, আকাশ!

বাবা হেসে ফেলে আমার চোখে চাইলেন। বললেন—খাসিটা রেখে দে। ওটাকে দানা দিবি। তোর দায়িত্ব। দাও, বকুল, আকাশকে দাও, ও বেঁধে রাখবে।

—না না মামা! ও মানুষের মতো। বুদ্ধি আছে। ওকে বাঁধতে হয় না। মানুষের গা-লাগা। মেয়েদের বেশি পছন্দ করে। রঙ। ঝলমলে রঙ দেখলে শিশুর মতন ছুটে যাবে। ও মৌলির নোলা নিয়ে খেলে। ওই গলার লাল ডোর বাবার দেওয়া। বাবা ওকে গোসল করাত। একটা মানুষ, সতর পাবে বলে কী না করেছে! সতর, মজহব, কৌমিয়াত।

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ মামা। বাবার আগের জীবনে কুরবানি তো ছিল না। বিলাসপুরে এসে রোখ হল। বিন্দু বৈষ্ণবী বললে, একে তুমি জবাই কোরো না বাবা ফরহাদ। তা কী বলব বলুন! কুরবানির খাসি পুষে আনসারি হতে চায় সুন্নিমোড়ল, এই পাটকিলে জানেও না ওর সার্থকতা কিসে, কেন ওকে আমি এভাবে টেনে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গেল ফরহাদ। অসম্ভব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আমি পাটকিলেকে স্পর্শ করেছি, পাটকিলে নাম, কিন্তু খাসিটা বিচিত্র রঙের, একটু পাথুরে রঙও যে না আছে তা নয়। নয়নতারা ফুলের রঙও বুঝি আছে। সব আছে। মেহেদি, সাদা, পাথুরে খয়েরি, কালো; খুব নরম। হতে পারে এই সব রঙ আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি না।

আচমকা ফের কথা বলে উঠল ফরহাদ আনসারি—বাবা ওকে সঙ্গে করে পাড়া বেড়াতে বার হত। লোককে দেখিয়ে বেড়াত। যাক গে, যাক গে। ও সব আমি আর ভাবব না। নানি, তুমি খাসিটার একটা বিহিত করে দিও। মাংসটাংস যা হবে বিলি করে দিও।

—না বাবা ফরহাদ। তোমার বাপের কুরবানি আমি দিতে পারব না। ওই জীবটাকে তুমি নিয়ে যাও। তুমি নিজে পার না? আমি কি তোমার আত্মীয়? তোমার বাপের রুহ, তার দেল আমি কী করে বুঝব! আমাকে মাফ করতে হবে।

—ও। বলেই ফরহাদ মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর খাদের গলায় বলল—ঠিক আছে। তা হলে চ বকুল, অন্য কোথাও দেখি। আয়। ওকে ছেড়ে দে আকাশলীনা, আংটা ছেড়ে দে।

—না। আমি একে রাখব। কী হয় রাখলে! ফরহাদদা রাখবে কোথায়, ওর তো বলে উঠি আমি।

খাসিটাকে সঙ্গে করে বাইরে বারান্দায় চলে গিয়েছিল ফরহাদ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাবা বলে উঠলেন—ওহে ফরহাদ! শোন শোন। যেও না।

ফরহাদ সরল হাসি হেসে ঘরের ভিতর এসে দাঁড়াল। দাদিমা ঘরের দোর ছেড়ে

BanglaBook.org

ভিতরে চলে গেলেন। ফরহাদ সবই উপেক্ষা করে বলল—আমার বাপের রুহু কেমন ছিল, দিল্-ই বা কেমন ছিল, সে ভারী রহস্য মামা! সে মানুষ কুরবানির মাংস নিজে কখনও খেত না মামিমা। সন্তানস্নেহে এই খাসিটা, এর নাম মুসা, একে মানুষ করছিল বাপু। সন্তানের মাংস মানুষ খেতে পারে!

দাদিমা সহসা কোথা থেকে ছুটে এসে দোরের পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। রাগের গলায় বললেন—ওই গোস্ত কি তা হলে আমরা খাব বলছ? বাউলের মাংস আমরা খাব? তোমার কি কখনও হুঁশ হবে না ফরহাদ! এই ধারা মানুষ তো দেখিনি, কুরবানি পালে, লোক দেখানি ঢঙ করে, ঘেন্নাও করে। কেমন লোক তোমরা?

—ঘৃণা করি না নানি। এ খুব কষ্টের কথা, আমার তো বুদ্ধি নেই। কিন্তু মুসার বুদ্ধি তুমি দ্যাখনি। বাপের হাতের দানাপানি খেয়ে মানুষ তো! ওকে বাপু দেহতত্ত্বের গান শোনাত। ডুগডুগি, দোতারা ... মানুষের জন্ম বিরল জন্ম মামিমা! কত পশু হয়ে, পাখি হয়ে আগে আমরা জন্মেছি। শেষজন্মে আমরা মানুষ। লালনের কথা গো! এই মুসাও হয়তো কুরবানি হলে পর একদিন মানুষের রূপ ধরে দুনিয়ায় আসবে। ওর বুদ্ধি দেখলেই বুঝতে পারবে, ওর মানুষ-জন্ম আসন্ন। পশু হয়ে জন্মানো কষ্ট মা গো! বলতে বলতে ফরহাদের গলা ধরে এল।

ধরা গলাতেই ফরহাদ বলল—আমি বিশ্বাস না করলে কী হবে, বাপ তো করত। আমার বাপের 'দেল্', 'রুহ্' এই রকম ছিল নানি। মানুষের রূপ ধরে এসেছিল এই বাংলাদেশে। পঞ্চায়েতে, এই জোতে, তরতিপুরে, বিলাসপুরে, এই সোনার বাংলায় এসেছিল বাপু, রূপ ধরেছিল। তবে পুরোটা মানুষ হতে পারেনি। তাই তো মাস্কেট দিয়ে মারা হল নানিমা! ৬ ডিসেম্বর রাতে আমার বাপের নিধন। আচ্ছা, এই হল কথা! বলে ফরহাদ একটা লম্বা শ্বাস বুকের মধ্যে টেনে নেয়। মুসাকে ছেড়ে দেয় ঘরে। তারপর দ্রুত বার হয়ে চলে যায় পথে।

আমার কাছে রইল মুসা। আমার মনে হত লাগল, এই পাটকিলেটা সত্যিই জবাই হবে তা বুঝতে পারছে, মানুষের মতো বুদ্ধি। আমার মুখের কাছে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে কথা বলতে চায়, কানের কাছে জিভ বার করে কথা বলার ছল করে। আমাকে চুমু খেতে চায়। আমাকে কি না করে। লেহন করে। বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দেয়। বুকের একটা বোতাম দাঁতে টেনে ছিঁড়ে দিয়েছে। আমার সেই জামাটা, পিছনে যার বোতাম, পিঠের বাঁ পাশে, সেই বোতামও ছিঁড়েছে। আমার হাওয়াই শার্টের চারটা পাঁচটা বোতামেরও একটা নেই। ও জামার কলার খেয়েছে। ওকে নিয়ে কী করব আমি?

ও তো পাটকিলে মুসা। পয়গম্বর মুসাজী নয়। ওর মানুষ-জন্ম আসন্ন। ওর গলায় লাল আংটা, কুরবানির চিহ্ন, ও দুই আড়াই মাস পর উৎসর্গ হবে, তারপর মানুষের রূপ ধরে আসবে এই ধরিত্রীর কোলে। যত কুরবানির সময় হয়ে আসে, ততই সে কেমন শান্ত হয়ে যেতে থাকে। আচ্ছা, প্রত্যেকটি প্রাণের জবাহ কি একই রকম কষ্টের? না, বোধহয়। একজন চাষী আর একটি খাসি কি সমান কষ্টে মরে?

ও যদি অতই নির্বোধ হবে তাহলে মানুষ হবে কী করে? এতই যদি বোকা হবে তা হলে আমায় এত সোহাগ করে কেন? ওর পরনে দিয়েছি একটা শার্ট চাপিয়ে, তাই নিয়ে ও এমন লাটসাহেব হয়েছে যে কী বলব! ও একটা দুষ্টু ছেলের মতন নীচে গিয়ে দাদিমাকে বিরক্ত করে এল। মায়ের শাড়ির ঝুলন্ত আঁচল ধরে টেনে দিল। বাবার আমারকেদারায় পা তুলে বলল—জি হাঁ, আমি পাটকিলে মুসা! আত্মত্যাগ আমারও ধর্ম বাবা। আমাকে ছোরা দিয়ে কাটো ইমাম, আমি মানুষ হয়ে একবার আসি, কত সুখ, কত

BanglaBook.org

পবিত্রতা এই জীবনে ! কত আনন্দ ! কত কষ্ট কমরেড ! তবু একবার মানুষ হতে দাও। আমার নাম ইসমাইল, নবী ইব্রাহিমের ছেলে গো ! আমি পাটকিলে কেন হব !

বাবাও ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দেন। ফরহাদের কথা সেদিন ওঁকে বিমূঢ় করে দিয়েছিল। বাবা কোনও কথা বলতেই পারেননি। আমি ভেবে পাইনি ফরহাদের 'দেল', তার 'রুহ্' কেমন ! কেমন তার হৃদয়খানি, তার আত্মার ছবি সত্যিই কী ধরনের ! ও পরের দিনই মুসাকে দেখতে এসে নেপাল হয়ে আসা ফরাসি সেন্ট উপহার দিয়ে বলল—ভাল না লাগলে ফেলে দিস ! বলে মুসার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল।

বাড়িতে কেউ তখন ছিল না। বাবাও লাঠি ধরে পাড়ায় বেরিয়ে গেছেন। মা ভারতী আচায্যিকে সঙ্গে করে তাঁর স্কুলের সেক্রেটারির কাছে চলে গেছেন সকালে। দাদিমা মুস্তাফাকে সঙ্গে করে ক্ষেত দেখতে গেছেন। কেউ ছিল না। মুসা আর আমি ছিলাম।

ফরহাদ বলল—কেউ নেই কেন ? বলে এমন লোভীর মতন আমার মুখের দিকে চাইল যে আমার ভয় করল। ওকে দেখেই মনে হল ওর মাথার ঠিক নেই। একটু আগে স্নান করেছি, পরনে সুতির কাপড়। জামা নেই গায়ে। কাপড় রঙিন, কিন্তু এতই ফাইন যে ওর আড়ালে সারা দেহের সব খাঁজ, রেখা, প্রতিটি তরঙ্গ ফুটে বার হয়।

—তুই আমার প্রকৃতি আকাশলীনা ! আমি তোর পুরুষ। দ্যাখ, ওই পাটকিলেটা সব বুঝতে পারছে। ওকে কি পাউডার মাখিয়েছিস, মেহেদি দিয়েছিস ! গায়ে একটু সেন্ট দে ব্যাটার।

—না।

—শোন !

—আমাকে ছোঁবে না।

তার আগেই ও আমার একটা হাত চেপে ধরল মুঠোয়। এক ঝটকায় গায়ের শাড়ি ফেলে দিল, নির্লজ্জের মতন চাইল আমার বুকের দিকে। আমি কী আশ্চর্য, কেমন অবশ হয়ে গেলাম। ওর ছোঁয়ামাত্র অসম্ভব তীব্র বিদ্যুৎ শিউরে তুলল আমাকে। একবার হাত ছাড়ানোর জন্য মৃদু চেষ্টা করলাম, কাত হয়ে টানলাম নিজেকে, ঘাড় কাত করে এবং দৃষ্টি সামান্য বাঁকা করে ওর চোখে আরক্ত আমি চাইলাম, কী ভঙ্গি ফুটে উঠল হে শান্ত মুকুর ! কী হল আমার !

—তৃষ্ণার জল দিসনি আকাশ। আমি তোকেই পান করব দুষ্টু মেয়ে। আয় ! বলেই ও ওর দিকে হেঁচকা টেনে বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ করে পেতে চাইল এবং আমার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল। এক মিনিটও হল না, ছেড়ে দিয়ে আমায় চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকল। অসম্ভব লজ্জায়, ভয়ে এবং কী একটা সূক্ষ্ম আনন্দে সারা দেহে শক্তি ছিল না আমার, আমি কেমন কাঁপছিলাম। শ্বাস প্রগাঢ় হয়ে এসেছিল। ভয় হচ্ছিল, কিন্তু কোনও পাপবোধ ছিল না মনে। মনে হচ্ছিল, ফরহাদ ঠিক করছে, ও আমাকে পান করে শেষ করে দিক। তবু আমি ওর চোখের দিকে চেয়ে খানিকটা শব্দ করেই কেঁদে ফেললাম। ও কেমন ঘাবড়ে গেল।

বলল—তুই সৈয়দা, আধেক হিন্দু, আধেক মুসলমান। আমি ছোটজাত। আমি কি অন্যায় করলাম ? অ্যাই, বল না !

কান্না আমার আরও চকিত হয়ে উঠল শব্দে। ও কেমন অসহায়ভাবে আমার হাত ছেড়ে দিল। আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে মেঝেয় উবু হয়ে বসে পড়লাম।

মৃদু ফোঁপানি হচ্ছিল। স্বর ভিজে গেছে আমার। বললাম—তুমি যে এমন, কখনও ভাবিনি ফরহাদদা ! তুমি আমাকে উত্তম সুচিত্রার সিনেমা দেখাতে চেয়েছিলে। তুমি

BanglaBook.org

চলে যাও।

—আমি যাব না।

—তুমি চলে যাও। আমি কথা দিয়েছি মাকে ফরহাদদা। তুমি কলকাতা যাবে, কলেজে পড়াতে ? না। আমরা যাব। তুমি যাবে কেন ? আমি যাব। মা যাবে। আমার পায়ের তলায় থাকবে চওড়া রাজপথ আমরা যাব। তুমি চলে যাও। কে তোমার প্রকৃতি ? কিসের প্রকৃতি আমি ? না। নই। আমি কেউ নই তোমার ! একটু ফুঁসে উঠে আবার আমি কেঁদে ফেললাম ডুকরে। ওর চোখে সকাতরে চাইলাম, প্রার্থনা এবং ক্রোধে চাইলাম—নদী শিয়রে এপার ওপার রামধনু উঠল।

ফরহাদ ঝুঁকে নামল আমার মুখের কাছে। দুটি বাহুর গোড়া দু'হাতে ধরল চেপে, তারপর টেনে খাড়া করল মেঝেয়। আমি এবার প্রতিরোধ করবার জন্য কঠিন গলায় বললাম—ছাড়ো ! বলছি, ছাড়ো আমাকে। তুমি ছোটলোক।

ফরহাদ কাহিল করে হেসে বলল—হ্যাঁ, ছোটজাত। কিন্তু সুযোগ তো এসেছে এখন। আকাশ-প্রতিমা, তোকেও ছোঁয়া যায়। এই তো ! যায় না ? আয় !

১১. আমার আমি না জানি সন্ধান—নৌকাবিহার

আমি বসে রয়েছি একটি লম্বা টুলের উপর। সামনে মাথায় গোল সাদা টুপি পরা, সাদা দাড়ি, গোঁফ কামানো, দামি লুঙ্গি এবং সাদা পাঞ্জাবি পরা প্রসন্নচিত্ত সুখী চেহারার হাজি সাহেব। উনিই মায়ের সেক্রেটারি। হেড-মিসট্রেস গীতা বসুচৌধুরী। এক কোণে ভারতী আচার্য্যি।

হেড-মিসট্রেসের চোখে পুরু কাঁচের পাওয়ারের চশমা। মুখের ছাঁদ পানপাতা আকৃতির, চোখ দু'টি বড় বড়, ডিম একটু চোখের পাতা ঠেলে বাইরে ছড়াতে চায়, ফলে দৃষ্টি প্রখর দেখায় কাঁচের আড়ালে। থুতনিতে একটা তিলও রয়েছে। সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও পদের গাম্ভীর্য কেটে বসেছে চোখেমুখে, ওটা আর যেন আলগা একটা ভাব নয়, ত্বকের ভিতরে চলে গেছে। গলার মাংসল ভাঁজে অবধি একটা কাঠিন্য নেমেছে।

দাড়িতে হাত বুলিয়ে হাজি সাহেব তাহের মীর বললেন— কোনও চুরির হিস্সা নিতে হচ্ছে না গীতা। কোরামে যখন পাশ হয়েছে, ব্যাস। আমরা নিশ্চিন্ত। ট্রু কপিতে ভুল রেখো না সেতাবুদ্দি, নজর পেতে লিখো।

কেরানি সেতাবুদ্দি চৌকির এক কোণে বসেছে রেজল্যুসন খাতা খুলে। কপি করছে। মধ্যবয়স্ক, গোঁফ আছে চওড়া এবং ভারী, দাড়ি কামানো। কপালে ভাঁজ পড়েছে। পাজামা, বাংলা ফুলশার্ট, কব্জিতে পুরনো ডায়ালের পীতবর্ণ ঘড়ি, হাত রোমশ। মুখ তুলে বলল—জি, না। ভুল হবে না।

—উপস্থিত মেম্বারদের সর্বসম্মতিক্রমে হল, তুমি আবার ডবল ব লাগাও, আধুনিক বানান দিও। একটা ব, মাথায় রেফ। শোন গীতা, দীপা যেদিন চলে যাবে ফেয়ারওয়েল দিও। বললেন তাহের মীর। লম্বা মানুষ, মোটামুটি ফর্সা, ঈষৎ লম্বাটে আদল, কানে লোম, চোখ ঝকঝকে, পুরনো ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, কিছুকাল ট্রেজারি অফিসে কেরানির কাজ করেছেন। শেষে বাপের আদি ব্যবসা ঠিকেদারি করেছেন, সম্পত্তিমান। বর্তমানে বামরাজনীতির দৌলতে এলাকার প্রধান। আগে, ইন্দিরার আমলে কংগ্রেস করতেন।

এক একটা এমন মানুষ এখনও দেখা যায়, দল বদল করলেও মানুষ যাঁদের উপর ভয়ানক চটে যায় না। তাঁদের চারিত্রিক সততার জোর এতটাই থাকে যে, দলত্যাগ সেই

সততাকে ম্লান করতে পারে না। তাহের মীর সেই ধরনের লোক।

হেডমিসট্রেস হঠাৎ বললেন—বানান ভুল থাকলেও চলে যায়, দল চাইলে আটকাবে কে? আপনার তদ্বির যখন, ও ভুল বানানেও ডি.আই. অ্যাকসেপ্ট করে নেবে। তা ছাড়া এম.পি-র ক্যান্ডিডেট। দীপার স্বামী তো ফেমাস লোক। জ্যোতিবাবু, বুদ্ধদেব, এঁরা সমস্ত ওঁকে ফ্রি করেছেন। আমাদের মতন তো আর....

—ওকে ছাড়তে হচ্ছে বলে তোমার কি দুঃখ হচ্ছে গীতা? ও আসলে এই গ্রামের সঙ্গে কোনও দিনই অ্যাডজাস্ট করতে পারেনি। আমাকে এম.পি যা বলেছে, তাতে করে একজন কমিউনিস্ট... বুঝলে না! একটা চিঠিতে, অত ভদ্র চিঠি, অত বড় মানুষ, সব কথার মধ্যে একটা নম্র ভাব, লিখেছে কী জানো, আপনারা দীপাকে অনুগ্রহ করুন।

—আজ যা গ্রামের সিচুয়েশন, সব টিচারই আপনার কাছে অনুগ্রহ চাইতে পারে। এই নরকে কে থাকতে চায়? কই, গোকর্ণের লিপিকে আপনি অনুগ্রহ করছেন না তো! অত দূর থেকে এসে কী করে পারে একটা মেয়ে? পারে না। ওর খুব কষ্ট হয়। ওর জন্য পারেন তো কাশেশ্বরীতে ব্যবস্থা করে দিন।

—ওর জন্য কী করব? ওর সঙ্গে কার মিউচুয়াল হবে?

—হিউম্যানিট্যারিয়ান গ্রাউন্ড কথাটা খুব শুনছি কিনা, তাই বলছি। লিগ্যালি তো কিছুই হচ্ছে না, সবই গ্রাউন্ড ধরে হচ্ছে। কিছু মনে কোরো না ভারতী, তোমারও যেমন গ্রাউন্ড আছে, লিপিরও আছে। আজ গ্রামে এই মাস্কেটিয়ারসদের অত্যাচারে কী না হচ্ছে বল! কমিউনিস্টরা কী করতে পারছে! ক্লাশ টেনের একটা মেয়ে... কী নাম? বলে গীতা সেতাবুদ্দির দিকে চাইলেন।

—মধুমন্তী বর্মণ।

—এই ব্লকের ডেভেলাপমেন্ট অফিসারের ভাগ্নী। ওর মা হাসপাতালের নার্স। শুনুন, অমন একটা মেয়ের তো সর্বনাশ হয়ে গেল চোখের উপর দিয়ে? ঘটনার একটা কমিউনাল কালার দেওয়া যেত, বি.ডি.ও সুমন্ত্রবাবুই তা হতে দিলেন না। মানুষটা কমিউনিস্ট নয় কিন্তু; স্রেফ ভদ্রলোক। তা, এই ভদ্রতার কী দাম? বলি কি, হিউম্যানিট্যারিয়ান গ্রাউন্ড কথাটা ছুতো, ও দিয়ে আমাকে ভোলানো যাবে না।

সেতাবুদ্দিন আবার কলম থামিয়ে চোখ তুলে বলল—গ্যাং রেপড় হয়েছে মেয়েটা। ওই দলেরই দু'জন বিলাসপুরে একজন মুসলমান জোলাকে খুন করেছে। ওই দলে দু'জন বিহারি আছে। এখন শুনছি নাকি রেপ টেপ কিছু না। শুধু টিজ করেছে, ছোঁড়াগুলোর একজন শরিকি পার্টির মেম্বার, এল.সি-র সদস্য। পঞ্চায়েতেরও মেম্বার। এরাই আবার মিছিল করে স্লোগান দিচ্ছে, শেখর আনসারির হত্যার জবাব চাই। লোকাল এম.এল.এ ব্যাক করছে। এই শেখরের ছেলে ফরহাদ একজন মাস্টার।

—এই যে ফরহাদ, ইয়েস এর কী গ্রাউন্ড বলুন? মুর্শিদাবাদ দর্শনে পড়েছি। ইয়েস। ঠিকই বলেছ সেতাব। টো টো রিপোর্ট হয়েছে। একজন মুসলমান সাংবাদিক লিখেছে সব। কী সাম আবেদীন। মরব আমরা। কোথায় যাব? স্কুল ছেড়ে পালাব কী করে?

—আমি যাব মা! বলে টুল ছেড়ে একটু ঝাঁপ দিয়েই মেঝেয় নেমে পড়লাম।

সেতাবুদ্দিন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—এই হয়েছে। এক মিনিট। বলে একটু দ্রুত কলম চালাতে লাগল।

—প্রিভিলেজড় ক্লাশের মেয়ে তো নয় লিপি। গরিব। ওর স্বামী কখনও বিপ্লব করেনি। ...সেতাব! কই হল তোমার? সিল প্যাড সব ঠিক আছে তো? কালি শুকিয়ে গেছে, একটু জল দিয়ে ঠিক কর। এই নাও! বলে ছুঁড়ে দিলেন কালির প্যাড আর স্কুলের

সেক্রেটারি/ হেডমিসট্রেস সিল। তাঁর কাঁধের চামড়ার বটুয়া আকৃতির বড় ব্যাগ থেকে বার করে দিলেন গীতা বসুচৌধুরী।

আমি ঘর ছেড়ে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

—ভারতী কেমন পড়ায় তা-ও আমরা দেখলাম না।

—তুমি তাহলে ধরেই নিচ্ছ, মিসেস আচায্যি আসছে নিমতলায়? বললেন মীর সাহেব।

—হ্যাঁ। আপনারা চাইলে আসবে না? ওই যে বললেন গ্রাউন্ড, তা ও কেঁদে কেটে তৈরিই করে ফেলেছে। কিন্তু এই কান্না দিয়ে তো স্কুল চলবে না। হেড মিসট্রেস একথা বলে আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন। চোখেমুখে অপ্রসন্নতা জমাট বেঁধে উঠল। বারান্দা থেকে জানলা দিয়ে ওঁকে দেখে আমার আর এখানে এক সেকেন্ড থাকতে ইচ্ছে করছিল না।

মা আর ভারতী মুখ বুজে কতই না সহ্য করলেন! সেতাবুদ্দিনের করা ট্রু কপি হাতে করে তাঁরা আমাকে সঙ্গে বেঁধে ডি.আই অফিস দৌড়লেন। চুপচাপ অপমান হজম করতে গিয়ে তাঁদের মুখে কথা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাসে করে যেতে যেতে ভারতী হঠাৎ বলল—আমার কপাল দিদি! পাগলের মতো করছি! যতই হোক এম.পি. না করলে রেজল্যুসন কিছুতেই হত না। সবার গ্রাউন্ড আর আমার গ্রাউন্ড এক হল দিদি! লিপির কথা বলছেন হেড, ওকে কি স্বামী-সংসার ছেড়ে একা থাকতে হয়! বলুন? একটা মেয়ের একা থাকা উনি বুঝবেন!

মা বললেন—একা আমার বিশ বছর কেটেছে ভারতী। তুমি এত উতলা না হলে আমি এই হীন অনুগ্রহ নিতাম না হয়তো। খুবই লাগছে আমার। সেক্রেটারিকে এম.পি. চিঠি লিখে আমার হয়ে অনুগ্রহ চাইবেন কেন? আমার স্বামী বিপ্লবী একথাও শুনতে হল! এমন করে খোঁটা দিলে কী যাতনা হয় কেউ বুঝবে না ভাই!

—আমার জন্যই হল দীপা দিদি!

—না। আমি কারও জন্য কিছু করছি না। তুমি ও কথা বোলো না। আজও আমি একাই রয়েছি। বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মা। তারপর বললেন—সবাই জানল, এম.পির ক্যান্ডিডেট আমি। আমি সুবিধাবাদী, খুব চালাক। আমার কোথাও অ্যাডজাস্টমেন্ট হয়নি, আমি যে কত মানুষের কতভাবে মানসিক ক্ষতি করলাম।

—কার মানসিক ক্ষতি? ওই হেডের, ওঁর কি সত্যিই মন আছে?

—তাঁর কাছেই তো আসতে হচ্ছে তোমাকে! তবু ভাল, যদি শেষ পর্যন্ত ট্রান্সফার পাই। মাধুকরী মানে জানো ভারতী? সম্মান আর ভালবাসার মাধুকরী?

—খুব শক্ত কথা বলছেন আপনি।

—হ্যাঁ। এই মেয়েকে দ্যাখো, আমাকে আজ সহ্য করতে পারছে না। বলে মা আমার দিকে স্থির আর সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। বুঝতে পারছিলাম, মায়ের মনে কী অদ্ভুত কষ্ট! সৌমব্রতর লেখা সেই চিঠিটা তিনি ভুলতে পারছেন না।

তবু মা ডি.আই. অফিসেও অনুগৃহীত হতে চেয়ে অপমানিত হলেন। খুব আশ্চর্য লাগল ডি.আই (এস.ই)-র আচরণ দেখে। ভদ্রলোকের চোখ দু'টি টকটকে লাল। মনে হয় নেশা করে রয়েছেন। প্রথমে কাগজপত্রগুলো খতিয়ে দেখলেন। তারপর আমার করুণাপ্রার্থী মা ও অনুগৃহীতা ভারতীকে চেয়ে চেয়ে দেখলেন। বাঁকা হাসি ফুটে উঠল মুখে।

বললেন—উইথ স্পেশাল নোট, আমি এই অ্যাপ্লিকেশন ডি.এস.ইর অফিসে ফরোয়ার্ড

করে দিচ্ছি। আপনাদের দেওয়া পার্টিকুলারস পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেন ইউ হ্যাভ টু গো দেয়ার।

—আজ্ঞে, যাব। গিয়েছি। বলে উঠল ভারতী আচার্য সরল চিত্তে।

ডি.আই বললেন— সে তো দেখেই বুঝতে পারছি। কোথাও যেতে আপনাদের আর বাকি নেই। এম.পি. আমাকে হুকুম করে কথা বলে, যেন আমি ওর বাপের চাকর। লোকটাকে আমি ভদ্রলোক বলেই জানতাম। ওটা কে?

—মেয়ে।

—অ। মেয়েকেও সঙ্গে করে ঘুরছেন। বাঃ!

—কেন?

—কেন মানে! আমার অফিসে ওর কী দরকার! ওকে কেন এনেছেন?

মা সলজ্জ ভঙ্গিতে ইতস্তত করে কথা না পেয়ে বললেন—ও আপনাকে দেখবে বলে এসেছে।

একথা শোনামাত্র ডি.আই. এমনই এক চড়া হাসি হেসে উঠলেন যে, ওঁর মুখ পর্যন্ত বিকৃত হয়ে গেল। বারবার বলতে লাগলেন—আমাকে? আমাকে দেখতে এসেছে? ঘুস। ঘুস এনেছেন? আমাকে এক্সপ্লয়েট করতে এসেছেন? গো। আই সে গো আউট।

আজও বুঝতে পারি না ডি.আই. কি পাগল ছিলেন? মায়ের শরীরের উপর একটা অদৃশ্য চাবুক আছড়ে পড়ে চলে গেল। গোস্বামী মাসির বাসায় এসে ওঁর বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে বালিশে মুখ ঘষড়ে কান্না রোধ করি আমি। অসহায় মা আমার পিঠে হাত রেখে কিশোরীর মতন বললেন— আমায় মাফ করে দে মা!

চিত্রিতা মাসি বললেন—সৌম্যব্রতর সঙ্গে ফোনে ওই ডি.আই.-এর হট টক হয়েছে। আজ আমি অফিস যাইনি। সামনে থাকলে হয়তো এইসব বাজে কথা বলতে পারত না।

আমি কাঁদতে কাঁদতে চিন্তার চাপে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। ক্লান্তিতে ঘুম এসে পড়ে। এবং চটেও যায় সেই ঘুম। বাইরে অপরাহ্নের আলো। ঈদের দিন বাবাকে আমি কষ্ট দিয়েছি, তাঁর লেখার আমি নিন্দা করেছি, এই সব মনে পড়ল। মনে পড়ল ঈদগাহ থেকে এম. এল. এ.-র জিপ চলে যাচ্ছে গ্রামের রাস্তায়, পিছনে ধুলো উড়ছে। মক্তবের দরিদ্র ছেলেমেয়েরা ছুটে চলেছে সেই জিপের পিছু পিছু।

বাবার জীবনে আমি কোথাও নেই, সে কথাও বাবাকে বলেছি, আমি সব জেনেও বাবাকে আঘাত করেছি। এই সব কেন মনে পড়ছিল জানি না। ডি. আই.-র হাসি ভেসে উঠছিল। ঘুস। ঘুস এনেছেন? আমাকে এক্সপ্লয়েট করতে এসেছেন?

—জেলে যেভাবে ডিপ্রাইভড্ হয়েছে ইমাম। ও তো আনসেক্সড্ দীপা? হঠাৎ কানে এল পাশের ঘরের কথা। মাসির গলা। খুব চাপা, গোপন কণ্ঠস্বর।

—হ্যাঁ। উদাসীন গলায় মা জবাব দিচ্ছেন।

—তাহলে কী করিস? বিছানা কি আলাদা তোদের?

—ও তো হঠাৎ করে আসে। থাকেই বা কোথায়। চলে যায়। যতটুকু পাই, শুধু ওকে বুকের কাছে পেয়েই আমার সব হয় চিত্রিতা। ভাল তো বাসনি, পুরুষ কী জানো না, তুমি বুঝবে না।

—কী বলছ? মাসির বিস্ময় মাখানো গলা ভেসে ওঠে। খানিক নীরবতার পর মাসিই বললেন—সৌম্যব্রত এই চিঠি লিখে মোটেও ঠিক করেনি। ও তোকে ভুলতে পারেনি দীপা।

—আমি তার কী করব !

—আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, ও তোর জন্য সব করতে পারে। আজও।

—আমি ওকে ব্যবহার করছি। এ খুব গ্লানির কথা চিত্রিতা ! কারও মানসিক ক্ষতি আমি চাই না।

—ও ঠিক তা বলেনি।

—ওর ৎ তীতের অপমান তো আমার মনে নেই।

—সৌম্যের আছে। তোর কেন মনে থাকবে !

—এই চিঠি মেয়ে পড়েছে। কী ভাবছে আমাকে ? আমি কেন ফিরতে চাইছি, কোথায় ফিরতে চাইছি ! কার কাছে ? আমার কি হবে, চিত্রিতা ?

—নিশ্চয় হবে। শহরে গিয়ে থাকবি।

—অযোধ্যার ঘটনা না হলে আমি হয়তো চাইতাম না। রুদ্র কিছুতেই গ্রামে থাকতে চায় না। ওর ফাইমোসিস হয়েছিল, ওকে চাঁদপুরের লোক মুসলমান বলে মানতে চায় না।

—কেন ? অপারেশন তো হয়েছে।

—হাজামত তো হয়নি। চোঁচ দিয়ে কাটা হয়নি। সুন্নৎ হয়নি। ভাবো ! সংস্কার কী জিনিস ! হিন্দু ডাক্তারে করেছে। মুসলমান ডাক্তার দিয়ে করালেও কি হত ! হত না। রুদ্রর মনের ঘৃণা কখনও আমি দূর করতে পারব না চিত্রিতা। ওর জন্যই আমাকে কলকাতা যেতে হবে।

আবার ওঁরা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। জানলার ওপারে খড়্গ, অসি এবং যুদ্ধের বাজনা। ওই বিস্তৃত মাঠে। আমি ভয়ে উঠে বসলাম বিছানায়। ওরই মধ্যে রাস্তায় মাইকে সম্প্রীতির মিটিং হবে কোথায় তার পূর্ব-ঘোষণা চলেছে। জানলাটা বন্ধ করে দিলাম।

—মেয়েটার কী হবে, তাই ভাবি !

—কেন ?

—ফরহাদ ওর দিকে হাত বাড়িয়েছে। বাপে ওর কাঁধ ধরেছিল, ও এখন মেয়ের হাত ধরতে চায়। অবুঝের মতো করছে। কুরবানির খাসি এনে মেয়েকে রাখতে দিয়ে গেছে। এ সংসারে কে চালাকি করে না বলতে পার ?

—আমি বুঝলাম না স্বর্ণদীপা !

—ও তুমি বুঝবে না। কমিউনিস্ট ফরহাদ। বাপের মৃত্যুর পর এখন পুনর্জন্মের কথা বলছে। ঈদের দিন নামাজ পড়তে বলাতে আমার ওপর রেগে গেল। দাদি কুরবানির খাসির পুনর্জন্মে মানুষ হওয়ার গল্প বিশ্বাস করবে ? এই সব হচ্ছে এখন।

—আমি একেবারেই বুঝলাম না স্বর্ণদীপা ইমাম। বলে উঠলেন গোস্বামী মাসি।

মা বললেন—আমি একদিন সমাজ-কৌলীন্য ছেড়ে এসেছি।

—হ্যাঁ, এসেছ।

—তারপর ? বাউলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব ব'লে ! মানুষকে ঘৃণা করি না। কিন্তু মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভাবব না ? দাদিমা-ই যদি আজ নিরাপত্তার অভাবে ভয় পান, ফরহাদের সমাজে তাহলে কিসের গ্যারান্টি চিত্রিতা ? ভাবছ, খুব কমিউনাল কথাবার্তা, তাই না ? না। আমি তা মনে করি না। আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, জীবনের কৌলীন্য দরকার। ফরহাদের সমাজের কোনও স্ট্যাবিলিটি নেই। আমার মেয়ে ভেসে বেড়াবে ?

BanglaBook.org

—ওকে বোঝাও স্বর্ণদীপা।

—একটা একতারা, ব্যাস! জীবনে আর কিছুই দরকার নেই? অতই যদি হত, খাসিকে দোতারা শুনিয়ে তাহলে বেঁচে থাকতে পারত শেখর আনসারি। পারল না।

—চুপ কর। মেয়ের ঘুম ভেঙে যাবে।

—লীনাকে নিয়ে আমাকে পালাতে হবে চিত্রিতা।

কিসের একটা ধাক্কায় আমি বিছানা ছেড়ে নেমে মায়েদের সামনে এসে কঠিন মুখে বললাম—আমি চলে যাচ্ছি মা।

—চলে যাচ্ছ মানে? আজ আমরা এখানে থাকব। তোমাকে সত্যব্রতর মা দেখতে চান। তোমার চিত্রিতা মাসি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। তুমি যাবে।

—না।

—না? কিসের না?

—আমি যাব না। ক্ষমা চাইতেও পারব না।

—ক্ষমা তোমাকে চাইতে হবে না। সত্যব্রতর সঙ্গে তোমার দেখা হবে। কী হ্যান্ডসাম আর কী নরম! ইঞ্জিনিয়ার। লম্বা-চওড়া, সুপুরুষ। বাপের মতো নয়। সিনেমার নায়কের মতন। ওর মধ্যে একফোঁটা ভালগারিটি পাবে না। কী ভদ্র!

—আমি যাচ্ছি! বলেই আমি অত্যন্ত দ্রুত চিত্রিতা গোস্বামীর বাসা ছেড়ে পথে নেমে পড়ি। ধীরে গড়িয়ে চলা ফাঁকা রিকশায় লাফিয়ে উঠে পড়ি। অপরাহ্ন রৌদ্ররক্তে পরিপুষ্ট এখন। পড়ন্ত ছায়ায় অবিশ্বাস। বিস্তীর্ণ মাঠে ধর্মশক্তির উন্মাদ তূর্য। কোন পৃথিবীতে আমি আছি? আমি মানুষ নই। ঘুস।

একা আমি বাসে করে স্বরূপগঞ্জে চলে এলাম। বাস থেকে নেমেই দেখতে পাই চায়ের দোকানের ওখানে জটলা। চারদিক থেকে কাকে যেন ঘিরে ধরেছে লোকে। ছুটে যাই সেখানে। ভিড়ের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাই একটি বেঞ্চে ফরহাদ। ওর দু'টি হাত দু'দিক থেকে দু'জন সমর্থ গুণ্ডা ধরনের লোক টেনে ধরে মুচড়ে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করছে। জোর করে বেঞ্চির কানায় নামিয়ে হাতের আঙুল ঘষটাচ্ছে, ব্যাপারির লাঠি দিয়ে পায়ের গাঁটে, হাটুর মালাই চাকিতে মারছে। উঃ আঃ করে কাতরাচ্ছে ফরহাদ।

আমি প্রাণপণে ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে চিৎকার করে উঠি—ওকে ছেড়ে দিন। কী করেছে ফরহাদ! কেন? অমন কেন করছেন আপনারা? ওগো, কী করেছ তুমি?

—শালা এল. সি.-র সাথে লাগতে এসেছে। শালা বাউলে বাচ্চা! জোলার পুত! আমরা নাকি খুন করেছি ওর বাপকে। ভেক ধরেছে, উ নাকি স্কুলের মাস্টার! মুখ্খু। বতার বুদ্ধি। যা যা! বিন্দু বোষ্টুমির আখড়ায় যা। বহিনডাকে কুন ফেরে ফেলে দিলি! চোপা সামলে থাক।

—ছেড়ে দিন ওকে। ও আর মানুষ নেই, ওকে কেন মারছেন!

—ইমামের মেয়েডা না এলে আজই তোকে তোর বাপের মুতন পুঁতে দিতুক!

—আমার বাপের নামে স্লোগান কেন দিচ্ছ পাতুখাঁ! আমি তো ভাল করেই বলেছি তোমাদের! আমি তো বাপের হত্যার প্রতিকার চাইনি। প্রতিবাদ করিনি কোনও। শুধু বলেছি, বাপ মরেছে আর রাজনীতি কোরো না শেখর জোলার নামে। যা কিছু কর, বাবার নামে স্লোগান দিও না। ও আমি সহ্য করতে পারি না। আমি দেখেছি, অন্ধকারে মাস্কেট দেখেছি, হ্যাঁ চিনি। নাম বলব না, বলছি তো নাম বলব না। আমি তো নাম করিনি কারও। সে আমি করব না।

বলতে বলতে অসহায় ঘর্মাক্ত অপমানিত ফরহাদ করুণভাবে ঢোক গেলে। বাইরে

টেনে আনি আমি। ওকে সঙ্গে করে বিলাসপুরের দিকে হাঁটতে থাকি। ওর ঠোঁট ফুলেছে, কপালে ফুলে ওঠা মাংসের ছোট পিণ্ড। নাক দিয়ে রক্ত পড়েছে। ও এখন সরাসরি আমার চোখে চাইতেও পারছে না। যারা ওর বাপকে মেরেছে, তারাই হত্যার প্রতিবাদে স্লোগান তুলেছে। ফরহাদ যাতে নাম না বলে ফেলে তাই ওকে মারল ওরা। ফরহাদ স্লোগানে বাপের নাম শুনতে শুনতে আর পারেনি, উত্তেজিত হয়ে একা তেড়ে গিয়েছিল ওদের দিকে।

—এইভাবে পারবে তুমি ?

ফরহাদ জবাব দিল না। একটা বাগানের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, একটি লোককে দড়ি দিয়ে ডালের সঙ্গে বেঁধে উঁচু থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওর ঝুলন্ত দেহের তলে মুখের কাছে একটি হ্যাজাক জ্বলছে। সন্ধ্যা হয়েছে একটু আগে। যৎসামান্য দূরে একটি পুলিশ জিপ দাঁড়িয়ে। জিপের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি খাঁকি পোশাক পরা পেয়াদা। পাহারা দিচ্ছে। আর কোনও পুলিশের লোক দেখা যাচ্ছে না।

—কথা আদায় করছে এইভাবে। ঝুলন্ত লোকটা মাস্কেটিয়ার। খুব মেরেছে, পায়খানা পেচ্ছাপ করে ফেলেছে, দেখছিস লীনা ! এই সব হচ্ছে। ভয়ে ওরা আমাকে মারল রে !

—চলো এখন। কথা বোলো না।

বাড়িতে এসে ডেটল লাগিয়ে দিই ক্ষতস্থানে। বাড়ি সুনসান। টঙে একটা লক্ষ্মীপেঁচা বসেছে বলে মনে হল। মাটির বাইরের দাওয়ায় ফরহাদকে মাদুর পেতে শুইয়ে দিয়েছি। মাথার বালিশের কাছে স্বচ্ছ লণ্ঠন। আকাশে গোল প্রকাণ্ড চাঁদ।

—কোথা থেকে এসে পড়লে তুমি ! নইলে বাঁচতাম না আকাশ !

—বাতাস করব একটু ?

—হ্যাঁ। দাও। মনে হচ্ছে, ওরা আমাকে মেরেই ফেলবে। গেরুয়া পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে দিয়েছে, ওটা আর পরা যাবে না।

—তুমি বাউলতত্ত্ব বিশ্বাস কর ফরহাদদা ?

—না। তবে আর তো কোনও উপায়ও নেই।

—কেন ?

—তুই আমাকে জল দিসনি আকাশ ! মনে আছে ? সেই একটা ঘটনা সব কেমন করে দিল আমার। দু'দুটো মাস আমি পাগলের মতন ঘুরে বেড়িয়েছি।

—আমি তোমার জন্য জল এনেছিলাম গেলাস ভরে। বিশ্বাস কর ! এসে দেখি ...

ফারহাদ আমার মুখের উপর একটি হাত বাড়িয়ে কথা বন্ধ করে দিল। বলল—ওখানে একটা ডায়েরি আছে। ওতে সব লিখেছি। বলেই সে চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে চোখের কোণে অশ্রু এসে নেমে বিন্দু হয়ে থেমে রইল।

ফরহাদ ডায়েরিতে লিখেছে।

জল দিল না আকাশ। আমি অর্জল, সে কথা আর অবিশ্বাস করব কিসের জোরে ! মিষ্টি মেয়েটা কখনও সাহস করবে না ওই সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসতে। দাদিমার চোখে যে-ভয় দেখেছি, তারপর আর আকাশলীনার কথা এ অন্তরে ঠাঁই না দেওয়াই উচিত। ওর মা আমাকে কখনও অন্তর দিয়ে স্নেহ করতে পারেননি।

তবু এই ঘটনার এমন প্রতিক্রিয়া হল কেন ? এত নিঃস্ব মনে হল নিজেকে ! মনে হল, জাতিচ্যুত নই, আবার জাতির লোকও নই। বাবা আমাকে মেধার সামান্য আশীর্বাদ ছাড়া কিছুই তো দিয়ে যাননি। আমার অপমানের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। সেদিন মনে হয়েছিল ফকির লালন আর আমাতে কোনও পার্থক্য নেই। গুরু সিরাজ সাঁইয়ের গৃহে

BanglaBook.org

অন্নজল গ্রহণের অপরাধে লালন জাতিচ্যুত হন। তারপর তিনি আর জাত ফিরে চাননি। বাধ্য হয়ে লালন 'খেল্‌কা' বা ভেক ধরেছিলেন। আমি কী করব ?

বাপের মৃত্যুর অপমান সহ্য করেছি। কিন্তু ভালবাসার অপমান সইতে পারিনি, আকাশ আমাকে ভয়ানক তৃষ্ণার্ত করে তুলেছিল। একবার মনে হল শিক্ষার অহঙ্কার আছে আমার। কিন্তু তার জোরেও ভালবাসার জল মেলে না। সোনামুখির এক ফকিরকে দেখা করে বলি, আমি কি সত্যই আবদাল, অর্জল ; এত ছোট জন্ম আমার ! উনি আমাকে বললেন, ওই মেয়েই তোমার প্রকৃতি। এই নাও, এই যে গেরুয়া কাপড়, এ তোমাকে দিলাম আমি। মনে করবে এক খেলকাধারী ফকির তোমাকে দিয়েছে। মানো না মানো, আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার মৃত্যু হয়েছে। তুমি তোমার ডিগ্রি-সম্মান ভুলে যাও। মৃতের বেশ ধারণ কর। সাদা কাপড় নয়। গেরুয়াই দিলাম। তোমার সন্ন্যাস। শূদ্রের সন্ন্যাস। তুমি মৃত। মানুষের কৌলীন্য এবং পবিত্র কৌমিয়াতের প্রতি তীব্র ঘৃণা তোমাকে পুনর্জীবিত করুক।

সুশিক্ষিত, নির্বিকার, অর্ধ-উন্মাদ সেই ফকিরের কথা শুনে আমি শিউরে উঠলাম। আমি মৃতের বেশ পরিধান করব ? না, আমি তা পারব না। মৃতদেহকেই বলে জানাজা। বললেন উনি। তিন খণ্ড বস্ত্র তোমার জানাজার জন্য প্রয়োজন ছিল। লেফাফা, মাথা থেকে পা পর্যন্ত। এজার—মাথা থেকে পা। পিরহান—ঘাড় থেকে গোড়ালি।

তুমি নারী হলে তোমার জন্য আরও দু'খণ্ড বস্ত্র লাগত। সিনাবন্দ—বগল থেকে জানু তক। দামনি—মাথার চুল বাঁধার জন্য। ...কল্পনা কর তুমি মৃত। নাওয়ায়তো আন্ উ-ওয়াদ্দিয়া আর্‌বায়া তাকবীরা-তে সালাতেল জানাজাতে ফারজোল কেফায়াতে...বলে তিনি মন্দ্র গলায় জানাজার নামাজের নিয়েত আউড়ে গেলেন। তারপর মিষ্ট করে হেসে বললেন, মহাত্মা লালনের জীবনে এই জানাজা হয়েছিল ফরহাদ—এ ইতিহাস। এই সন্ন্যাস ছাড়া তোমার শান্তি নেই। তুমি স্নান করেছ। মনে কর, এই মন্ত্রই সন্ন্যাস।

দৃশ্যটি আমি কল্পনা করেছিলাম। খেল্‌কাধারী ফকিররা জানাজা পড়ছেন, লালন গ্রহণ করছেন জীবিতের জন্য মৃতের পোশাক। সমস্ত ঘটনার যেন এক আশ্চর্য তাৎপর্য খুঁজে পেলাম আমি। তোমার কাছে নবী আর কৃষ্ণ এক সত্তা। মহম্মদ, যিশু আর বুদ্ধ এক ব্যক্তি। তোমার কল্‌ব-এর উপরে নুরের বাতি জ্বেলে বিরাজ করছেন যে দয়াময়, তাঁরই সুরাতে তোমার গড়ন গড়া হয়েছে, না হলে আদমকে সেজদা দিতে ফেরেস্তার উপর হুকুম ফরমান কেন করেন খোদা। আদম আর খোদা এক। আমার কাছে মানুষের সারাংশ পাবে তুমি। আনাল হক। আয়নাল-হক। আমিই ঈশ্বর। শুধু মানুষ। খোদা নিজেই মানুষময়।. যেভাবে বৈদিক মানুষ দেবীপূজা করে, আমরা ধূপগন্ধ দিয়ে মানুষ পুজি বাবা। শোন। নারীর কোনও জাত নেই। 'থাকবে যদি পুরুষ হয়ে চল ভেদ বিচারে'—কথাটা এই। নারীই পরিপূর্ণ মানুষ, আমরা পুরুষরা অসম্পূর্ণ। মানুষের পূর্ণ বৈশিষ্ট্য যার মধ্যে পাবে, সে হল প্রকৃতি। জাত পুরুষের গড়া, নারীর নয়। প্রকৃতি-প্রাপ্তি তোমার ধর্ম। তুমি ফিরে যাও, জল চাও প্রকৃতির কাছে।

ফরহাদের ডায়েরি পড়তে পড়তে থেমে গেলাম। মনে পড়ল, ও কেন সেদিন আমার কাছে অমন করে ছুটে গিয়েছিল। 'তুই আমার প্রকৃতি' বলে আমাকে স্পর্শ করেছিল। ওর ওই গেরুয়া পাঞ্জাবিই বা কেন। কত কষ্ট দিয়েছি ওকে আমি। ওর বুকের তৃষ্ণা আমি কি বুঝি না ! ও আমার কাছে তার সর্বস্ব সমর্পণ করেছে। মৃতের বেশ ও পরেনি, কিন্তু নিজেকে সেই নিষ্ঠুর নিঃসহায় দৃশ্যে কল্পনা করেছিল। ওর খেল্‌কা হয়েছে যেন।

চারিদিকে কারা নেমে এল এই জ্যোৎস্নারাতে ! ফকিররা নেমে এল পারস্য-সমুদ্রের

BanglaBook.org

মরুপথ ধরে, সুফি দরবেশ এসে দাঁড়াল আমাদের উঠোনে। চৈতন্যের মায়াপুর থেকে জ্যোৎস্নার হাওয়া এসে আমার চুলে স্পর্শ দিয়ে চলে গেল। মৃতের মতন শুয়ে রয়েছে ফরহাদ। বাতাসে গুঞ্জন শুনি, 'তোমার পথ ঢ্যাকাছে মন্দিরে মস্‌জেদে/ ও তোর ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই/ আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুর্শেদে।'

ফারহাদকে ঘুম থেকে তুলে বলতে ইচ্ছে করল, চল, পালাই। আর এখানে থেকো না। কিন্তু ডাকতে সাহস হল না। হঠাৎ একসময় আপনা থেকেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। খুব শশব্যস্ত গলায় ও বলল—চল্। তোকে রেখে আসি।

—রাত হয়েছে। যদি পথে কোনও বিপদ হয়? তাছাড়া তুমি একা ফিরবে কী করে?

—ফিরব না।

—তাহলে?

—চল্ আগে। তারপর বুঝবি।

সেই দড়িচলা নৌকায় উঠলাম আমরা। ফরহাদ দড়ি ছিঁড়ে নৌকা ভাসিয়ে দিল জলে। জ্যোৎস্নার কুলধ্বনি করা মৃদুমন্দ স্রোতে কিনারাহারা দু'টি নরনারী আমরা কোথায় ভেসে চললাম। প্রকৃতি আর পুরুষ—আর তো কোনওই সম্বন্ধ ছিল না আমাদের। আমি তার সোহাগে যেন মরে গিয়েছিলাম।

ভোরে বাড়ি ফিরলে মা কটমট করে বিস্রস্ত আমাকে দেখে গালে একটা চড় মেরে বললেন—কী হয়েছে তোমার? কী করেছ তুমি, বল?

১২. স্বর্ণদীপার প্রত্যাবর্তন

গুড নিউজ, কাম অন মনডে নেক্স্ট্ অ্যাট বারহামপুর। দিল্লি থেকে সৌম্যব্রতর টেলিগ্রাম এল এক মাস পর। বাবারই হাতে ডাকপিয়ন সেই টেলিগ্রাম পৌঁছে দিয়ে গেছে। ইদানীং বাবা নীচের ঘরে আরামকেদারায় কেমন নির্জীবের মতন পড়ে থাকেন। ফরহাদ আসে হঠাৎ কোনও একদিন। বাবা ওকে সঙ্গে করে কোথাও মিটিংঙে যাচ্ছেন দেখতে পাই।

দৈনিক খবরের কাগজে অযোধ্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে বাবার লেখা ছাপা হয়েছে ক'দফায়। কলকাতার বিভিন্ন স্থানে সম্প্রীতির পক্ষে বাবা বক্তৃতা করেছেন। গ্রামে এসেও করেছেন। মফস্বল শহরে ছুটে ছুটে গেছেন বাবা। এত সত্ত্বেও বাবার চোখেমুখে প্রত্যাশার আলো দেখিনি। সব সময় এক গাঢ় বিষণ্ণতা তাঁকে ঘিরে থাকে।

টেলিগ্রাম হাতে করে আমার নাম ধরে ডাকলেন বাবা। আমি নীচে এসে দেখি ফরহাদকে উনি বলছেন—যুক্তি জিনিসটা দুষ্প্রবেশ্য ফরহাদ। আমি প্রবন্ধ লিখি, বক্তৃতা করি, যুক্তিই আমার অস্ত্র। অযোধ্যাকাণ্ডের পর মানুষের মধ্যে যুক্তির প্রতি অসহিষ্ণুতা দেখেছি। ধর, আমি যে একটা কথা লিখছি বা বলছি, মানুষ তা কী ভাবে গ্রহণ করবে? কে বলছে, লোকটা কে, এটা বিচার্য হতে পারে না। বিচার করতে হবে, কী বলা হল, যা বলা হল যুক্তিযুক্ত কিনা, সত্য কিনা!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু মানুষের কাছে বিচার্য, কথা বা বক্তব্য নয় মামা। মানুষটা বড় কথা। মানুষটা কে? ধর্মবেত্তা মহাপুরুষ, মোহান্ত? দলের নেতা? কে তুমি? লালন না রবীন্দ্রনাথ। আজ মানুষের কাছে মোহান্ত বড়, ঐতিহাসিক মিথ্যা। বিজ্ঞানী ভুল। ওঝা সত্য। আপনি সত্য বললেও আপনি তো মুসলমান। আগে আপনি, তারপর আপনার

BanglaBook.org

সত্য। যেমন আমি। আমি তো বাউল মামা। মুখে যাই-ই বলি, নিজেকে মানুষ প্রমাণ করা মুশকিল। অযোধ্যার ঘটনার পর এ আর সম্ভব হবে না। বলি কি জানেন ?

—বলো।

—'ফকিরি করবি ক্ষ্যাপা কোন রাগে। হিন্দু মুসলমান দুইজন, দুইভাগে।' ব্যাস! আমার খেল্‌কা হয়েছে মামা! আমার মৃত্যু হয়েছে। শুধু বলি, আমার আমি না জানি সন্ধান। যুক্তি দিয়ে সম্প্রীতি হবে না মামা। প্রবন্ধ দিয়ে হবে না। মানুষ আদিম। হিংসাকে মানুষ ত্যাগ করবে না।

—কী বলছ ফরহাদ ? তোমার মুখে এই হতাশা ?

—না মামা। হতাশা নয়। যুদ্ধ, দাঙ্গা এ সবই অনিবার্য নিয়তি। মানুষ একা। যত সে বাইরে বাইরে সমাজবদ্ধ হয়েছে, ততই ব্যক্তি-মানুষ নিঃসঙ্গ হয়েছে। প্রেমের জন্য মানুষ দল বাঁধে না। স্বার্থে বাঁধে, ধ্বংসের জন্য বাঁধে। হিংসাই তাকে ঐক্যবদ্ধ করে। হিটলার মানুষকে হিংসার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিল। ইরাকের উপসাগরীয় যুদ্ধে সব বড় বড় ক্ষমতাশালী দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। মতবাদের যে কোনও উগ্রতাই হিংস্র মামা। হতে পারে নাম তার স্টালিন বা হিটলার। চীনের ইয়েমেন স্কোয়ারে সত্তর হাজার ছাত্রছাত্রীর ওপর যে নৃশংস গুলি চলল, সব মৃত্যু হল। আমার প্রশ্ন হিংসাকে।

—তাহলে তুমি মতবাদকেই চ্যালেঞ্জ করছ ? তাই-ই করছ তুমি ফরহাদ।

—হ্যাঁ করছি। আপনি প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের, যুদ্ধের, দাঙ্গার কারণ বলতে পারেন। ব্যাখ্যা তো করা যাই-ই মামা। তাতে কিন্তু লক্ষ নিরীহ প্রাণের যে বিনাশ হয়ে গেল, তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া গেল না। এ শতাব্দী যুদ্ধের শতাব্দী। আড়াইখানা বিশ্বযুদ্ধ অলরেডি হয়ে গেছে। দাঙ্গা ? সে সবই খণ্ডযুদ্ধ মামা। অগুনতি হয়েছে। আপনি হাসছেন ?

—না। হাসছি না। একটা কথাই খালি ভাবছি।

—বলুন।

—প্রেমের জন্যও তো আমরা দল বাঁধতে পারতাম। এত সত্ত্বেও আমি মনে করি না, পৃথিবী শুধু হিংসার ইতিহাস, প্রেমও আছে ফরহাদ। একটা ছোট্ট উদাহরণ দেব তোমাকে।

সেই উদাহরণ আর শোনা হল না। ডেকে উঠলাম বাবাকে।

—বাবা! আমার ডাকে ঘাড় ফেরালেন।

—ও। তোমাদের গুড নিউজ আছে। শোন ফরহাদ। এই দুঃসময়েও সুসংবাদ আসে। দীপার ট্রান্সফার বোধহয় হয়ে গেল। তুমি গড়িয়ার কলেজের চাকরি ছেড়ো না।

—ও আর নেই মামা। তবে বহরমপুরেই সেকেন্ড চান্স হতে পারে।

—আমরা চলে যাব, তুমি থেকে যাবে ?

—আগেই বলেছি, আমি একা মানুষ। কমলার বিয়ে দিলাম। ব্যাস।

—তোমার নিজের ?

—নিজের কী ?

—নিজে বিয়ে করবে না তুমি ?

—না।

আমি সামান্য অভিমানে ফরহাদের চোখের দিকে চকিত দৃষ্টি ফেলে দ্রুত উপরে উঠে চলে আসি। তারপর মাকে সঙ্গে করে নামি। মা দ্রুত আমাকে সাজিয়ে, নিজে সেজে

BanglaBook.org

বহরমপুর যাওয়ার জন্য তৈরি হলেন। এতই আনন্দ তাঁর চোখেমুখে উছল হয়ে উঠেছিল যেন মনে হচ্ছিল তাঁর শরীরে কিশোরীর চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে।

মা নীচে নেমে অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন ফরহাদকে—তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো ফরহাদ।

আমি প্রতিবাদ করে বললাম—না। ও যাবে না।

ফরহাদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বলল—আমাকে কেন মামি! আপনারাই তো বেশ যাচ্ছেন। আমি ফকির মানুষ। সর্বত্র আমাকে শোভা পায় না।

—সে তুমি ভাল করেই জানো, কোথায় তোমায় শোভা পায়! তুমি যাবে কিনা বল! মা বাঁকা করে বললেন।

—হ্যাঁ যাব। বাসে চড়ে যাব তো?

—তবে কি ঘোড়ায় চড়ে যাবে? মায়ের স্বরে আরও বক্রতা।

—আর বলবেন না মামি! ঘোড়া বললেই এলিজাবেথ ব্যারেটের স্বামী, কবি লর্ড ব্রাউনিং-এর লাস্ট রাইড টুগেদার-এর কথা মনে পড়ে। অতএব ভাগ্যে যখন এই রকমই ছিল, এসো তবে একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ি, আমার শেষ প্রার্থনা। কিছু না, এসবই কবিতা। মিনিটে মিনিটে এখন শুধু বলতে পারি যেন, এই শেষ, এ যেন না ফুরায়। অ্যাই লীনা! তোর মনে আছে কবিতাটা?

বাবার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, ওঁর মুখ কেমন রক্তশূন্য হয়ে গেছে। ফরহাদের কথায় আজ কোনও আড়াল ছিল না। লাস্ট রাইড টুগেদার তাকে নির্লজ্জ করে তুলেছিল।

—জীবনটা কাব্য নয়, তা তুমি বোঝো! মা বলে উঠেছিলেন।

—তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না ফরহাদ? আর্ত শুনিয়েছিল বাবার গলা।

—কলকাতা অনেক দূর মামা! আর কী করে হবে!

—আমি যাব না মা। তোমার পায়ে পড়ি। বলে আমি চেয়ারে বসে পড়ি। ফরহাদই আমার হাত ধরে চেয়ার থেকে খাড়া করে তুলে বলেছিল—তোমার কী হয়েছে! তুমি কি ছেলেমানুষ! খালি চোখে, বিনে কাজলে, বিনে সুর্মায় তোমাকে মানায় ভাল। তোর ফরমুলা হচ্ছে এইচ টু ও। একভাগ অক্সিজেন, দুই ভাগ হাইড্রোজেন। কেমন? ইটস এ কমপ্লিটলি রিলিজিয়াস প্রবলেম। তোর সেই হেড চুলের কয়েনটা আছে? দিদা না দাদি, নে আমি তোকে দিচ্ছি, টস করে দ্যাখ।

কী আশ্চর্য! ও আমাকে বাধ্য করল। আমি চোখের জল ফেলতে ফেলতে টস করে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। কাণ্ড দেখে বাবা অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। কী অসম্ভব ছেলেমানুষি ফরহাদের; কী মধুর পাগলামি! বারবার আমার হাতে গুঁজে গুঁজে দিল ওর পকেটের কয়েনটা। বাবার চোখে ব্যথা, বিস্ময় এবং অসহায়তা ক্রমশ ঘনীভূত হয়েছিল।

—আমায় কোথায় শোভা পায় মামা! আপনি একবার বলবেন? এই যে নানি! বন্যেরা বনে সুন্দর জানো তো! বাউল পথে সুন্দর জানো না! আমার আর ঘর বাঁধা হল না নানিমা!.....চল্ চল্ লীনা। টসের মুদ্রা বলছে, তোকে যেতে হবে। তুমি হেরে গেছ আকাশ। টাকার হিসেব, উপায় নেই। মামি তুমি আজ আর রেগে যেও না।

সন্ধ্যার মুখে আমরা এম পি-র বাড়ি পৌঁছালাম। দোতলার সেই আগের ঘরে পর্দা ঠেলে চিত্রিতা মাসি আমাদের নিয়ে ঢুকলেন। একটু বাদে ওই ঘরে সৌম্যব্রত নীচে থেকে এসে সম্মুখের চেয়ারে বসলেন। পাশের ঘরে আলো জ্বলছিল, মনে হল কেউ ও ঘরে

BanglaBook.org

আছে।

মা অধীর আগ্রহে আর কৃতজ্ঞতায়, মুগ্ধচোখে এম পি-কে দেখছিলেন। চিত্রিতা গোস্বামী বললেন—তুমি অশেষ উপকার করলে সৌম্যব্রত।

সেই কথায় কান না দিয়ে এম পি বললেন—তোমরা বুঝি অনেকক্ষণ বসে আছো? সন্ধ্যায় আমি একটুখানি পুজো করি আবার। কিছু না। শ্যামা মায়ের ফটোয় একটা জবা গুঁজে দিই, একটা ধূপবাতি জ্বেলে দিই। ব্যাস! সারাদিন এতেই আমার চলে যায়। মনের মধ্যে জোর পাই। ভগবান টগবান বুঝি না, তবে এটুকু করি। দিনমান হাজার একটা কাজের ধকল, সন্ধ্যায় সুযোগ পেলেই চান করি, না হলে রাতে যখন ফ্রি হতে পারি, চান করে ফেলি। তারপর মাকে ফুল দিই। না হলে কেমন একটা গ্লানি থেকে যায় মনের মধ্যে। কিছুই নয় ভাই চিত্রিতা, স্রেফ পিউরিফিকেশন।

কী হল, আমার মুখ দিয়ে ফস্ করে প্রশ্ন বার হয়ে এল—আপনার অসুবিধা হয় না?

—কিসের?

—রাজনীতি করেন।

—ওহো! না, না। এ তো কোনও প্রেজুডিস নয়। কাজের চাপে সময় না পেলে করি না, করতেই হবে তার কোনও মানে নেই। আচ্ছা শোন দীপা, টেলিগ্রাম তো পেয়েছ!

—হ্যাঁ। তর্ক না করে লীনা তুমি ওঁকে প্রণাম কর। যাও, ওঠো। বলে উঠলেন মা। আমি উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সৌম্যব্রত বললেন—না না। আগে দাঁড়াও, এগোবে না। বলে তটস্থ ভঙ্গিতে সামনে দু'হাত প্রসারিত করলেন। আমি হকচকিয়ে থেমে গেলাম।

—প্রণাম করব না? বাবা আপনাকে প্রণাম করতে বলেছেন! এটা আপনার প্রাপ্য। বলে জোর করে ওঁর দিকে এক পা এগিয়ে যাই।

—শোন মা! এই বাড়ি তোমার। প্রণাম একদিন করবে তুমি। তার আগে সত্যর সঙ্গে তোমার পরিচয় হোক। আচ্ছা, ওই ছেলেটা কে? বলে এম পি ফরহাদের দিকে দৃষ্টি ফেলে ইঙ্গিত করলেন।

—উনি আমার মাস্টার মশাই। বললাম আমি। তারপর বললাম—মা ওঁকে সঙ্গে এনেছেন।

—ও আচ্ছা! দেহতত্ত্বের লোক?

—না। অ্যাপ্লায়েড ম্যাথস-এর লোক। আমার প্রাইভেট টিউটর ছিলেন। বাবার বন্ধু। আমি জানালাম।

—ভালই হল তাহলে! টেলিগ্রাম করার পর ভাবলাম...ওরে সত্য, এদিকে আয় তো বাবা! ভাবলাম তোমার ট্রান্সফার অর্ডার হাতে হাতেই পৌঁছে দেব তোমাকে। বিমানে করে কলকাতায় নেমে সিধে ডি এস ই-র সঙ্গে দেখা করলাম। তারপর....ওই যে সত্য এসেছে। সত্য, আকাশলীনাকে তোর ঘরে নিয়ে যা। অথবা তুইও একটু বস এখানে। তা, কথা হল, এডুকেশন মিনিস্টারের সেক্রেটারির সঙ্গেও দেখা করতে হল চিত্রিতা। আমি তাগাদা দেওয়ার জন্য একজনকে ফিট করেছিলাম কলকাতায়। সেই ছেলেটা খুব করিৎকর্মা ছেলে, আমাকে ট্রাঙ্কলে জানাল কেস হয়ে গেছে। কিন্তু.....

চিত্রিতা গোস্বামী হঠাৎ বলে উঠলেন—বুঝতে পারছি। তুমি পারনি সৌম্য। হয়নি।

ঠিক এই সময় পর্দা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে দাঁড়াল ভারতী আচার্য এবং মধুবাবু। তাদের পিছনে সত্যব্রতর অত্যন্ত মোটাসোটা মা এবং বৃদ্ধা ঠাকুমা।

BanglaBook.org

মধু আচার্য ঘরে ঢুকেই হাহাকার ছড়িয়ে বলে উঠল—অভাবিত। অভাবিত ঘটনা স্যর। তীরে এসে তরী ডুবল। হিংসা স্যর, স্রেফ হিংসা। কিছু মনে করবেন না দীপা দিদি, আপনার হেড মোটেও মানুষ ভাল না। শেষ মুহূর্তে কমপ্লেন করল, রিটিন কমপ্লেন! মিনিস্টারের কাছে! মন্ত্রীর সেক্রেটারি সেই কমপ্লেন স্যরকে দেখিয়ে বলেছে, হেডমিসট্রেস না চাইলে আমরা কী করতে পারি। দীপা দিদি! আপনিই শেষ পর্যন্ত ভারতীর বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। অন্য যে কোন একজন হলে এই মিউচুয়াল হতই। আপনার ওপর এত রাগ কেন ওই হেডমিসট্রেসের! বলুন স্যরকে। বলে যান। আমরা শুনি।

—মধু! তুমি একটু শান্ত হও! বলে উঠলেন সৌম্যব্রত। তারপর বললেন—ও আমার ছাত্র, তুমি কিছু মনে কোরো না স্বর্ণদীপা।

—না। ও ঠিকই বলেছে। দোষ তো আমারই। হেডমিসট্রেস যেদিন আমার সিঁথিতে জোর করে লিপস্টিক রগড়ে সিঁদুর দিয়েছিল সেদিনই জানতাম সে আমায় ঘৃণা করে। চলো চিত্রিতা আমরা যাই। বলেই মা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে কেমন অসহায়ভাবে আবার বসে পড়লেন। বৃদ্ধা এবং অনামিকার সাহায্যে নিজের কপালের দু'পাশ টিপে ধরে চোখ বন্ধ করে এক মিনিট দম নিলেন। ওঁর হয়তো মাথাটা সামান্য ঘুরে উঠেছিল।

মা মেঝেয় হতচকিত দাঁড়িয়ে থাকা আমার দিকে চেয়ে বললেন—প্রণাম উনি চান না আকাশলীনা। তুমি ওঁর মানসিক ক্ষতি কোরো না।

—গ্লানি হচ্ছে আমার! বল, আমি কী করতে পারি! এই কথাটার কোনও গুরুত্ব দিতে আমি বলিনি স্বর্ণদীপা! আমি তোমার মেয়েকে আশীর্বাদ করতে চাই। সত্যর মা-ও করবেন। সত্য, তুমি ওঁকে প্রণাম কর! বলে মাকে দেখালেন এম পি।

—না। আমি কি আর কোথাও ফিরতে পারি সৌম্য? বলে সত্যব্রতর প্রণত ভঙ্গির সামনে নিজের পা গুটিয়ে নিলেন মা। সসংকোচে।

—তুমি নিশ্চয় পার দীপা। আমি বরাবর বামপন্থী রাজনীতি করে আসছি, আমি মুক্তবুদ্ধির মানুষ। আজকে যা দেশের পরিস্থিতি, অযোধ্যাকাণ্ডের পর....আমরা পলিটিক্যালি সমস্ত কমিউনাল ফোর্সকে চিহ্নিত করতে চাই এবং একটা অসাম্প্রদায়িক সেকুলার পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। আমরা মাইনোরিটি কমিউনিটির পিপ্‌ল্‌কে আশ্বাস দিয়ে বলতে চাই, সকল ধর্মের সমান অধিকার। এবং তুমি ফিরতে চেয়েছিলে, তোমাকে ফেরাবোই। চিরকাল আমি কমিউনিজমকে উচ্চ আদর্শ ভেবেছি, একজন কমিউনিস্ট....

—তুমি ব্রাহ্মণ সৌম্যব্রত! আমি চলি। বলেই মা উঠে দাঁড়ালেন। চারিদিকে চেয়ে দেখে বললেন—ফরহাদ কোথায়? ও, কই?

ফরহাদ কখন সবার অজান্তে চলে গেছে। সবার আগে নেমে চলে আসি আমি। দৌড়তে শুরু করি। কখন আকাশ ঘোর হয়ে উঠেছিল। কেমন মেঘলা হয়েছিল আকাশ। সম্মুখে দৌড়ে ছুটে যাচ্ছে ফরহাদ। প্রাণপণে ছুটে এসে ওকে পিছন থেকে ধরি। বলি—যেও না প্লিজ! আমাকে নিয়ে চলো।

—না। তোদের আমি আর বিশ্বাস করি না আকাশ। আজ গোকর্ণের ওদিকে টর্নেডো হয়েছে। প্রচুর লাশ আসছে লরি করে হাসপাতালে। আমাকে ছেড়ে দে। আমাকে ভুলে যা। তোদের সবার পিউরিফিকেশন আছে, আমার তো নেই রে!

—না। শোনো! মা আর ফিরতে চান না ফরহাদদা। মাকে তুমি ভুল বুঝো না!

—টর্নেডো হয়েছে আকাশ। তুই ফিরে যা তোর মাসির ওখানে। একটা টর্নেডো

BanglaBook.org

কেমন জানিস ?

—আমার কী দোষ বল !

ফরহাদ শুনল না। আমাকে আলো অন্ধকারে মেশা পথের উপর একটি ঝাঁকড়া গাছের তলে একলা রেখে চলে গেল। ফিরে এলাম চিত্রিতা মাসির বাসায়। ঘন্টা-দেড়ঘন্টার পর এম পি এসে উপস্থিত সেখানে।

—আমি সামাজিকভাবে সত্যর সঙ্গে লীনার বিয়ে দিতে চাই। তোমার প্রত্যাবর্তন সম্ভব স্বর্ণদীপা !

—না। আমার মেয়ে কখনও কোনও ধর্মাচার করেনি সৌম্যব্রত। নামাজ, রোজা কিছুই জানে না। লোভ হয়েছিল বড়। স্বপ্ন দেখেছিলাম। কিন্তু এখন আমার ভয় করছে। আমার শাশুড়িকে একলা ফেলে রেখে কোথায় যাব ? ওঁর কাছে সবাই এসে কৈফিয়ত চাইবে। তুমি লীনাকে কোনও না কোনও ভাবে ধর্মেই আটকে ফেলবে। তোমার ইনস্টিংক্ট বলছে, তুমি পারবে না।

—তুমি আবার আমাকে প্রত্যাখান করলে দীপা ! তাহলে শোন ! সত্যর ঠাকুমা বলেছেন, আমি যদি বিয়ে দিই দিতে পারি, গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন মা, লীনাকে উনি হেঁসেলে ঢুকতে দেবেন না। তবু আমি এসেছিলাম। আমি রাজনীতির লোক। দৃষ্টান্ত চাই। সেই দৃষ্টান্ত আমি চাই, যাতে করে দেখিয়ে বলতে পারি মুসলমান ঘরের মেয়েকে ঘরে এনে তুলেছি, এই দ্যাখো !

—তাতে তোমার পলিটিক্সের সুবিধা হয়।

—তোমার হয় না ?

—না। বলে উঠলেন মা।

এম পি বিরস মুখে ফিরে চলে গেলেন। হতমান আর নিঃস্ব দেখাল তাঁকে। খাওয়া দাওয়া করে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগে শ্লথস্বরে আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নেবার চেষ্টা করে চিত্রিতা গোস্বামী বললেন—সব কেমন গোলমাল লাগছে। সৌম্যকে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

ভোরে বাড়ি ফিরলাম আমরা। রোদ চড়েছে সামান্য। বেলা আটটা নাগাদ গীতা বসুচৌধুরী এসে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। সঙ্গে ওঁর বছর বারোচৌদ্দর ছোট ছেলে।

বললেন—সেক্রেটারির তাগাদায় এসে পড়তে হল স্বর্ণ। বলি কি, সবই তোমার ও কে নিশ্চয়। অর্ডার পেয়েছ ?

—আপনি আমার সঙ্গে আর কত দূর চালিয়াতি করতে চান দিদি ! ভেবেছেন ডালে বসে রয়েছেন, কেউ আপনাকে দেখতে পাচ্ছে না, তাই না ? কমপ্লেন করেও নিশ্চিন্ত হতে পারেননি, এখন জানতে এসেছেন কেস কাঁচিয়েছে কিনা। এম পি-র ক্যান্ডিডেট, বলা তো যায় না ! বলুন ?

—তোমার কথা আমি বুঝলাম না স্বর্ণদীপা। কমপ্লেন কিসের ?

—এডুকেশন মিনিস্টারের কাছে আপনি কমপ্লেন করেননি বলছেন ! একথা আপনি আপনার সন্তানের মাথায় হাত রেখে কবুল করতে পারবেন ? মায়ের রাতজাগা চোখে ধকধক করে আগুন জ্বলে উঠছিল। বাবা বিমূঢ় হয়ে গেছেন, দাদিমা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রয়েছেন এদিকে। দেখা গেল, গীতা বসুচৌধুরী এবার শান্তভাবে বাবার সামনের চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর গম্ভীর এবং অত্যন্ত সুস্থস্বরে নিজের ছেলেকে ডাকলেন—এসো তো বাবা রাজীব, কাছে এসো আমার।

BanglaBook.org

রাজীব তার মায়ের কাছে ইতস্তত করেও ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। তখন গীতা বাবাকে বললেন—আপনি কমিউনিস্ট। আপনিও দেখুন, এই আমি আমার সন্তানের মাথায় হাত দিচ্ছি। কমপ্লেন কেন করতে যাব আমি? ভগবান বিশ্বাস করি, যদি কমপ্লেনই করে থাকি, এই সন্তান যেন কালই অপঘাতে মরে। আই অ্যাম নট ইওর এনিমি স্বর্ণদীপা, নট অ্যাট অল। তুমি লীনা, আমাকে এক গেলাস জল দাও, আমি এবার উঠব।

জল খেয়ে উঠে চলে যাওয়ার আগে গীতা বললেন—একটা কথা বলে যাই শেষবারে। খোঁজ নিয়ে দ্যাখো, ওই এম পি-ই হয়তো কেসটাকে ইলেভেন্থ আওয়ারে চেপে দিলেন!

১৩. আর হবে না মোর সাধের জনম

ফরহাদ সেই যে টর্নেডোর রাতে পথের উপর থেকে হারিয়ে গেল, আর ওকে পাওয়া গেল না। কোথায় চলে গেল কেউ বলতে পারল না। আমার কাছে রয়ে গেল তার পাটকিলে মুসা। আমার এ বৃত্তান্তে সময়ক্রম মানা হয়নি, আয়নায় যেভাবে ছবি আসে আমি সেইভাবে লিখি।

নদীর শিয়রে এপার ওপার বিস্তৃত রামধনু ক্রমশ মুছে যেতে লাগল। মায়ের সেতুটা কোথাও মাকে পৌঁছে দিল না। রামধনুর একটা অংশ মাঝ বরাবর মুছে গেছে, পাটকিলে মুসা রামধনুর ব্রিজে উঠেছে। ওকে ধরতে গিয়ে আমি আছাড় খেলাম। কোমরে সাংঘাতিক মোচড় লাগল, সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে ছড়ে গেল গা, কনুই। আমি উঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না। ফিক্ ব্যথাই শুধু না, হাড়ও বুঝি ভেঙে গেছে। সিঁড়ির নীচে পালাল দুষ্টুটা।

আমার জন্যই বাবাও নীচের ঘরে শুয়েছিলেন। হঠাৎ রাতে, রাত তখন গভীর, হারিকেনের মৃদু শিখার সবুজ আলোয় ছমছমে ঘর, আমার ঘুম চটে গেছে আর ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে। ওদিকের খাটে শুয়েছেন বাবা। মা কখন নীচে এসে বাবার মাথার কাছে বসে আছেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। কথা বলছেন না।

—জল! জল খাব মা!

—ও, তুই জেগে আছিস! আচ্ছা, দাঁড়া। দিচ্ছি।

জল খেয়ে বললাম—আমার কাছে থাকো মা। আমার বোধহয় জ্বর আসছে।

মা আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলেন। ওই রাতে উঠোনে এসে দাঁড়াল দু'টি ক্ষ্যাপা ক্ষুধার্ত শৃগাল। আগেই শুনেছিলাম, রব উঠেছিল, গাঁয়ে অনেক দিন পর শেয়াল ঢুকেছে। ওরাই এল। আজ সদর দোরের পাল্লা বন্ধ করতে ভুলে গেছে সবাই। আমি শুয়ে আছি। দাদিমা এৎকাফে। বাবা ইদানীং আরও কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। উঠে দাঁড়াতে গেলে হাতপা আরও কাঁপে। মা উপরে উঠে গেছেন। আমার চোখ আবার জুড়ে এসেছিল। তখন ওরা হানা দিল। ঝাপসা জ্যোৎস্নায় উঠোনে দু'দিক থেকে আক্রমণ করল ওরা। মুসা হিন্‌হিন্ করে শব্দ করল গলায়। তিনটি ছায়াপশু উঠোনে দাপাতে থাকল। একা পাটকিলে লড়ে যেতে লাগল।

হঠাৎ একটা চেরা শব্দ, কেমন বিদ্ধ বোবা চিৎকার। মানুষের মতো পশুরাও যুদ্ধ করে। তারা দাঁত বসায়। মানুষেরই মতন তাদের ধারালো দাঁত আছে। তাদেরও আছে আমাদেরই মতো নরম মাংস। সেই চেরা আচম্বিত চিৎকার শুনে মনে হল মুসা সাংঘাতিক জখম হয়ে গেল। কুরবানির খাসি সাধারণত এভাবে মরে না। মানুষের কাছে

BanglaBook.org

থাকে বলে পশুরা নাগাল পায় না। একটু আগে এ ঘরে এসে মুসা আমাদের তিনজনকে শুঁকে শুঁকে গেছে। ওকে আমরা প্রশ্রয় দিইনি, আমি ওকে কাছে ডাকিনি।

ওর জন্য আমার কোমর ভেঙেছে বলে ওকে কেউ আজ রাতে আদর দিল না। ও শুঁকে শুঁকে আপনা থেকে এক সময় চলে গেল বাইরে। মুসা একা হয়ে গেল। খোলা চাঁদের আলোর দিকে চাইল। পেঁপে গাছের পাতার কাঁপুনি দেখল চেয়ে চেয়ে। কেন সে চেয়ে দেখল প্রাচীরের কোল ঘেঁষে চিকচিক করে চলে যাচ্ছে শস্য গন্ধমাখা ইঁদুরেরা! বাতাসে ঝাপটা দিয়ে গেল একটা কালো বাদুড়, তা-ও দেখল পাটকিলে। পেঁচার কুৎসিত ডাক শুনল কান পেতে।

রেডিওটা কেউ বন্ধ করেনি। কড় কড় করে শব্দ হচ্ছে, একটা আরবি গান বেজে উঠল। তারপর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ওই গানটা আবার একটু বেজে আবার থামল। ব্যাটারি পুড়ে যাচ্ছে, কড় কড় শব্দ হচ্ছে। সহসাই ওই স্টেশনে হিন্দি গান বেজে উঠল।

মা চিৎকার শুনতে পেয়েছিলেন। গানের শব্দে শেয়াল দু'টো ভয় পেল বোধহয়। নীচে নেমেই মা ভয়ার্ত গলায় ডেকে ওঠেন—ওরে লীনা, তোর মুসা শেষ হয়ে গেল রে! যাঃ! যাঃ! বলে শেয়াল দুটোকে তাড়াবার চেষ্টা করেন মা। হাতের কাছে কিছুই পান না। কী দিয়ে তাড়াবেন।

বাবা উঠে পড়েছিলেন। লাঠি ধরে বাইরের বারান্দায় চলে যান। আমি দেওয়াল ধরে ধরে বারান্দায় আসি। এবার মুসাকে ছেড়ে পশু দু'টো পালায় এবং পালাবার আগে বারবার চেয়ে চেয়ে দেখে এদিকে। দাদিমা এৎকাফ ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এ রাতে। বারান্দার নীচের অনুচ্চ সিঁড়ির ধাপে এসে দাঁড়ালেন। দাদিমার পায়ের কাছে এসে মুসা পড়ে গেল। সটান শুয়ে গেল। মা মা করে দু'বার তিনবার ডাকল।

—ওরে ওকে পানি দে মা! পানি দে! দাদিমা ডুকরে উঠলেন। এভাবে চলে গেল আমাদের পাটকিলে মুসা। আমার হাতের জল খেল না। এরপর দাদিমা কেমন থম্ মেরে বারান্দার থামে পিঠ লাগিয়ে বসলেন। ওইভাবেই বসে রইলেন ক'দিন।

এক রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম। নদীর জলে ঝাঁকবাঁধা মৌরালার দিকে তেড়ে যাচ্ছে একটি সুদীর্ঘ সাপ। পাড় থেকে নেমে এল জলে। অনেক দূর থেকে এল। তারপর এই দাঁড়াশের সঙ্গে খরিসের শঙ্খলাগা দেখলাম আমি। স্বপ্নে নয়। বাস্তবে। ওইদিকের বাগানে, বাঁশবনের মধ্যে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠল ওরা। দেহের সাপটায় যেন আগুন জ্বলে যাচ্ছিল, কাম আর বিষ একই সঙ্গে যেন পৃথিবীর অন্তরকে দাহ করে যাচ্ছে।

বাবা বললেন—সাপও দেখতে খুব সুন্দর আকাশ। ভয় পেও না। বাপের কথায় আমার আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হল। সেই দিনই দুপুরে পাটকিলে মুসার জন্য অসম্ভব কষ্ট হল, মনে হল, ও আমার কাছে এসে খেতে চাইছে। ছায়ার মতন এসে আবার চলে গেল। ওই তো, সিঁড়ির ওখানে দাঁড়িয়ে আছে।

দাদিমা থামে পিঠ লাগিয়ে বসে থাকতে থাকতে এক সময় ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বললেন—আল্লার কাছে কী জবাব দিব মা! ফরহাদ শুধালে কী বলব আসমান।

—কেউ জবাব চাইবে না দাদিমা! কেউ চাইবে না! ও কি আর সত্যিই মানুষ হত! যে যা সে তাই। বাউল যে সে বাউল। চাষী যে সে চাষী। বামুন যে সে বামুন। আর যে এম.পি. সে এম.পি.। তুমি দাদিমা তুমিই। মানুষ বদলায় না।

—তুমি বলছ?

—হ্যাঁ দাদিমা। জীবচক্রের ইতিহাস খারাপ। আমাকে ফরহাদ বলেছে। সাপ কি দেখতে সুন্দর দাদিমা?

—তুমি যেমন দেখবে। শিবের গলায় সাপ দ্যাখনি।

—শিব তো নীলকণ্ঠ। সাপ তো ওই জন্যে।

—কিন্তু আমার যে গুনাহ্ হল জননী।...ওইই দ্যাখো পিয়ন এসেছে। যাও চিঠি এসেছে বোধহয়।

বাবা বললেন—আমাকে দাও। আমি দেখি। চিঠি চেয়ে নিলেন বাবা। ধীরে ধীরে চিঠি পড়তে পড়তে বাবার মুখের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। এক দুর্বোধ্য কষ্টে বাবা আর্তনাদ করলেন—রুদ্র নেই। ওকে পাওয়া যাচ্ছে না মা!

মা বলতে আমি। মা বলতে দাদিমা। দাদিমা চমকে উঠে বাবার কাছে ছুটে এলেন।

—কী বলছ ইমাম!

—হ্যাঁ মা। ওর ক্লাসের বন্ধু হস্টেল থেকে লিখেছে। এক মাস হয়ে গেল, রুদ্র বাড়ি যাবে বলে বেরিয়ে এসেছে সুপারকে বলে। ওরা কী করে খবর পেয়েছে রুদ্র চাঁদপুর আসেনি। সত্যিই এসেছে কিনা জানতে চেয়েছে। কোথায় গেল! ছেলে আমার কোথায় গেল! এল না কেন?

ওই উত্তর কলকাতা দেয় না। কলকাতা মানুষকে কোথায় হারিয়ে দেয় জবাব করে না। রোজই আমাদের মনে হতে লাগল, রুদ্র ফিরে আসবে। ও হারিয়ে যাবে কেন? বাবা মা ছুটে গেলেন কলকাতায়। আমি দাদিকে নিয়ে চাঁদপুরে পড়ে থাকলাম।

স্বর্ণনগরী কলকাতা। রুপালি শহর কলকাতা। উচ্চ সংস্কৃতির তীর্থভূমি কলকাতা। শত সহস্র কৃষ্টির মিলনক্ষেত্র কলকাতা। শত ধর্মের পীঠ। লক্ষ সৌধ, অযুত রাস্তা, নিযুত গলি। বাণিজ্যের রোশনিমোড়া বিস্ময়-নগরী সে। কত গাড়িঘোড়া, নিয়ত গর্জনে সফেন ঘর্ষণে লীলাময় জনসমুদ্র। মদের দোকান, বেশ্যার বাড়ি। শহিদ মিনার। ব্রিগেড, গড়ের মাঠ। রাজভবন, রাইটার্স। অফিসপাড়া। কত ব্রিজ, কত সোঁতা। কত গ্রন্থি। কত গানের আসর। কত কবিতা পড়া। কত সিনেমা। কত ভাষা। কত ফুটপাথ। ট্রামের পাত। রেলের লাইন। কত টাওয়ার। কত মিছিল। বক্তৃতায় গলা ফোলানো নেতা। কত জয়ঢাক। ছট পূজো। কত ব্যান্ডপার্টি। কত জৌলুস। কত নিয়নবাতি। কত কুষ্ঠ। শত শত ডাক্তার। শত সহস্র উকিল। আয়কর। ব্যয়কর। মৃত্যুকর। জীবনকর। পথকর। ট্যাক্স এবং ট্যাক্সি। হলুদ আলো। সবুজ আলো। নীল আলোয় সেমিনার হয়। আলকাতরার মতন চুইয়ে পড়া অন্ধকারে বস্তির কোলাহল। বিড়লা তারামণ্ডলে ব্রহ্মাণ্ডের উদয় অস্ত। জাদুঘরে পৃথিবী এসে শুয়ে আছে। চিড়িয়াখানায় একটি জিরাফ গলা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। বিজ্ঞাপনে ছেয়ে আছে কলকাতার চোয়াল। কলকাতার দাঁতের ফাঁকে কত বিরিয়ানি, জিহ্বায় আর্সেনিক। কত শিক্ষায়তন, সঙ্গীতায়তন। কোটি কোটি টাকার শিল্প বিক্রি হচ্ছে। বাজারে ঝিঙে বিক্রি হচ্ছে। শিশু বিক্রি হচ্ছে। রমণী বিক্রি হচ্ছে। বিমা বিক্রি হচ্ছে। দালাল লেগেছে। পুলিশের দালাল। থানার দালাল। মন্ত্রীর দালাল। বিদ্যার দালাল। গানের দালাল। বেশ্যার দালাল। তারই মধ্যে সর্ববৃহৎ সেতু, সর্ববৃহৎ পাঠাগার। সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র। সর্বনিকৃষ্ট নীল সিনেমা। জলে সাঁতার দিচ্ছে মেয়েরা। শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট হয়ে গেল। সব চেয়ে খারাপ খেলে চলে গেল ইংল্যান্ড। চপার মেরে ভোট গেল। পৌর নির্বাচন হল উপ উপ। বাবা সায়গল ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পানি। শুধু কোল্ড ড্রিঙ্কসেই কলকাতার দুপুর ভিজে ন্যাতা। লোকটার গায়ে ওল্ড মঙ্কের ঘাম। মেয়েটার গায়ে টেরাকোটা প্রিন্ট। ফুটপাথে ধর্ষণ চলেছে মাঝরাতে। রোদে মেকআপ ধুয়ে যাচ্ছে। পাঁচতারায় উপন্যাসের উদ্বোধন, চিত্রশিল্পের বিকিকিনি। ফুটপাথে ক্লাসিকস পোকায় খেলেও চশমাপরা একজন দর

BanglaBook.org

করেন। লিট্‌ল ম্যাগাজিনে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা ক্রমশ অবসিত। বয়ামে কেঁচো আর কাঁকড়া এবং পাশেই কন্ডোম বিক্রি হয়। ফুচকা খায় গ্রুপ থিয়েটারের একটা মেয়ে। মেট্রোর কাছে বন্দুকের দোকান আর ছাতার দোকান পাশাপাশি। পাশেই পেন বিক্রির স্টল। চোরা বাজারে পাঁচজন ঘুঘনি খাচ্ছে।

পুষ্ট স্তন ঝোলানো নগ্ন মূর্তির মতন সাদা একটা পাগলি সাদা নীল ইউনিফর্ম পরা দু'টি স্কুলের শিশু ছাত্রকে অযথা চড় মেয়ে হি হি করে হাসছে। পিঠে ব্যাগ ঝোলানো পড়ুয়া ছেলে দু'টিও হাসছে। ভিড়ের বাস থেকে চিরে নামতে গিয়ে 'বেঁধে বেঁধে' বলে রাস্তায় পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল মধ্যবয়স্কা স্লিভলেস, ওকে ধরাধরি করে তুলে কিছু মানুষ অফিস না গিয়ে হাসপাতাল চলে গেল। ফাইন আর্টস একাডেমিতে শিল্পী অটোগ্রাফ দিচ্ছেন। বইমেলায় চড়া ধুলোয় জল ছেটানো হচ্ছে। এভাবে একদিন কলকাতা মুখব্যাদান করল উড়াল পুলের ওখানে। থলে হাতে একটা কেরানি লালবাসের তলে টেঁসে গেল। আমার ভাই রুদ্র কি এই পথে গেছে?

সর্বক্ষণ মনে হতে লাগল, ওই বুঝি রুদ্র ফিরে এল। ওই তো দোরের কাছে দাঁড়িয়ে হাসছে। রুদ্র এই গাঁয়ে ফিরতে চাইত না, ফিরলও না সে। কলকাতা তাকে মুছে দিল। মুখগহ্বরে তলিয়ে গেল, কোনও একটা অন্ধগলিতে কি থেমে গেল তার পথ চলা? খবরের কাগজে, তার ফটোসহ বিজ্ঞাপন বার করলেন বাবা হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ কলমে। টেলিভিসনে ওর ছবি দেখিয়ে খোঁজ চাওয়া হল। ওর বর্ণনা দিয়ে রেডিওয় হারিয়ে গেছে বলে বলা হল, কোনও ব্যাক্তি ওর সন্ধান দিল না। দাদিমা রোজা করলেন, নামাজ পড়লেন ওর জন্যে।

বাবা ওর হস্টেল থেকে দু'তিনখানি পাঠ্য বই, পুরানো প্যান্ট শার্ট, লুঙ্গি, দাড়ি কামানো ক্ষুরের বাক্স এবং একখানা ডায়েরি হাতে করে ফিরলেন, এই সবই ছিল রুদ্রর ওখানে ফেলে যাওয়া চিহ্ন। ডায়েরির পাতায় পাতায় কত কথা সে লিখে রেখে গেছে। বাবা সেই ডায়েরিটা অন্যদের সহজে স্পর্শ করতে দিতেন না। আমি চুপি চুপি পড়ে দেখেছি রুদ্রর কথা।

ও এক জায়গায় লিখেছে, মাকে আমি ভীষণ ভালবাসি। বাবাকেও। তবে বাবার স্নেহ তত পাইনি বলেই কি মায়ের তুলনায় টান একটু কম? দাদিমা এত ভালবাসেন, সে প্রায় পাগলের মতো। আমার পাশে এসে শুয়ে পড়েন অনেক দিন। আমার যে বয়েস হয়েছে তা উনি আমল দিতেই চান না। এই দাদিমায়ের সঙ্গে মায়ের বিরোধ যে কিসের বুঝতেই পারি না। চিরকাল তর্ক করলেন ওঁরা। মায়ের যে হিন্দু-সংস্কৃতির উপর একটুখানি টান থেকে গেছে তা বোঝা যায়। অবশ্য হিন্দুকৃষ্টি যে কী, তা-ও মাথায় ঢোকে না। দেবদেবীর পূজা? নানা রকম আচ্চা? আহ্নিক? ব্রত? মা তো সেসবও করেন না কখনও। তাহলে কী? দাদিমার এৎকাফই বা কিসের?

পুরুষের লিঙ্গের অগ্রভাগ ছেদন করা, তার নাম সুন্নত। এ এক মস্ত ধর্ম। তা নিয়ে দাদির সমাজ আমাকে অপমান করেছে। মাথার সিঁদুর তা-ও এক বিরাট ধর্ম। মায়ের মাথায় সেই সিঁদুর পরানো নিয়ে হুজ্জোত করেছেন মায়েরই স্কুলের হেডদিদিমণি। আমি ঘটনাগুলিকে, জলপানির সমস্যাকে উপেক্ষা করতেই পারি। কিন্তু সৈয়দ আর ব্রাহ্মণ—এ তো ঘুচবে না। মানুষকে আমার চেনা হয়ে গেছে। নিম্নবর্ণের মানুষের রোখ, তা-ও কি কম? মণ্ডল কমিশনের সময় বম্বের দিকে ব্রাহ্মণ সন্তান গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করল। সভ্যদেশে সাদা কালোর দ্বন্দ্ব কখনও শেষ হল না। জ্ঞানী মানুষরা বলেছেন, আদি কাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ তার কৌমহিংসা ত্যাগ করেনি। তার মধ্যে রয়েছে

BanglaBook.org

কুলঘৃণা। বিজ্ঞানের উত্তাল অগ্রগতি সত্ত্বেও গোত্রবাদ, বর্ণমহিমা শেষ হল না। ভাবি একজন ধার্মিক বিশাল ঈশ্বরকে কল্পনা করেন কি ভাবে, এত ক্ষুদ্র হৃদয়, ছোট ছোট জাতের মানুষ কি সত্যিই তাঁর পরমেশ্বরকে মনের মধ্যে ধ্যান করতে পারেন! মুসলমানের খোদা তো নিরাকার, বিমূর্ত, শোনা যায় হিন্দুরও চূড়ান্ত ঈশ্বর নিরাকার; নিরাকার-নিরঞ্জন। যে মানুষটা কবিতার বিমূর্ত ভাব বোঝে না, শিল্পের উচ্চ সৌন্দর্য বোঝে না, সঙ্গীতের শ্রুতি-পার্থক্য, অনুভাব বিভাব বোঝে না, সেই একটা শিক্ষিত লোক, বোকা লোক, নিরক্ষর, অর্ধশিক্ষিত লোক কী করে বিমূর্ত ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট উচ্চচিন্তা করবেন? কী সেই রূপ, কেমন হয় মনের মধ্যে! কী দেখা যায় মনের ভিতর?

যে লোকটা ফের গান গায়, ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, বিমূর্ত ভাব নিয়ে কারবার করে, রাগরাগিণী বোঝে, রঙ বোঝে, সূক্ষ্ম ভাবনার তরঙ্গ বোঝে, প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়, তৃণে, পুষ্পে, আকাশে নক্ষত্রে সুর খুঁজে পান, পাহাড়ের সৌন্দর্যে, সমুদ্রের গর্জনে, নদীর কুলুধ্বনিতে যার অন্তরে আশ্চর্য গান জেগে ওঠে, এই মানুষ যদি সবখানে ঈশ্বরকেই দেখে থাকেন তাহলে মানুষে মানুষে তিনি উচ্চনীচ ভেদ কল্পনা করেন কোন্ মন দিয়ে? একজন লেখক, একজন শিল্পী কী করে হিন্দু হন, মুসলমান হন, দলিত হন, অস্পৃশ্য হন? একজন নেতা তো বড়ই উপকারী মানুষ, একজন মন্ত্রী তো ভারত-জাতির অভিভাবক। তাঁরাও কেউ যাদব, কেউ ব্রাহ্মণ! যাঁরা মানুষকে জাতের নামে ভোট চেয়ে বিব্রত করছে, আমি মনে করি এরা মানুষকে ঘৃণা করে। এরা কখনও প্রেমিক নয়। কল্পনা শক্তি ছাড়া প্রেমিক হওয়া যায় না।

এই পৃথিবী ছেড়ে যত দ্রুত পারি চলে যাব। ফরহাদদাকে আমরা সবাই ঘৃণা করেছি। ছোট বলে ঘৃণা করা, নীচ বলে বিদ্বেষ প্রকাশ করা আমাদের এক ভয়ঙ্কর শক্তিধর প্রবৃত্তি। ভালবাসা একটা ক্ষমতা, ঘৃণা করাও ক্ষমতা। এই সব ভাবতে ভাবতে একদিন হঠাৎ আমি শেষ হব। কেউ খুঁজে পাবে না।

অন্যত্র আর এক জায়গায় রুদ্র তার কথার পুনরাবৃত্তি করে লিখেছে। আমি মনের মধ্যে ঈশ্বর দেখতে পাই না। ধ্যান করে দেখেছি। কিছুই আসে না। খানিকটা আগুন দেখি। ঝাপসা। আমাদের হস্টেলে একজন যোগব্যায়ামের মাস্টার এসে আমাদের যোগ শেখাত। দমের কাজ শেখাত। আমাকে চিত করে শুইয়ে দিয়ে বলত, রিল্যাক্স। মনে কর তোমার দেহটা ক্রমশ হালকা হয়ে যাচ্ছে। মনকে দেহের সবখানে নিয়ে চলো। তুমি তোমার পায়ের কাছে বসে আছো, একটু একটু করে উঠে এসো বুকের দিকে। এক সময় মাস্টার বলত, মনে কর, তুমি তোমার দেহ ছেড়ে চলে গেছ। দেহটা তোমার পড়ে রইল। এ দেহ আর তুমি আলাদা।

আমি কে? দেহও যদি আমার না হয়, তাহলে আমি কে? কোথায় যেতে হবে আমাকে? আমি তখন আকাশে আকাশে ঘুরে মরি। কেউ আমাকে ডাকে না। কোথাও আশ্রয় থাকে না। আমি আমার একার সেই অস্তিত্বকে নিয়ে কী করব বুঝতে পারিনি। পরে মনে হল, দেহ ছেড়ে চলে যাওয়া আমিই কি আত্মা? আমি যে আত্মা বিশ্বাস করি না। ধ্যান করলে যে আলো আসে মনে, দেহ ছেড়ে গেলে সেই আলোর মতন আমি, ক্রমশ আকাশে আকাশে চলে যাই। রাতের চাঁদহীন তারাভরা আকাশে জোরালো টর্চ মেরে দেখেছি, আশ্চর্য গম্ভীর নিঃসঙ্গতার মতন আলোটা চলে গেছে উপরে। নক্ষত্রে গিয়ে ধাক্কা দিল। সেই নক্ষত্র ছাড়িয়ে চলে গেল আলোর রেখাটি, কোথায় গেল?

আকাশ আমার বোন। যেমন বাংলাদেশের এক কবির বোন হল নদী। মানুষই একমাত্র বোন বা মা হবে কেন? একটা মানুষের উচিত নদীকে বোন বলে গভীর রাতে

BanglaBook.org

ডেকে উঠে নদীর প্রতিধ্বনি শোনা। আমি হস্টেলের ছাদে উঠে একা আকাশ আকাশ বলে ডেকে দেখেছি, কী যে ভাল লাগে! আমার ধারণা মন্ত্রীরা, ঘুসখোর আমলা, উগ্রধর্মবাদী লোকেরা কখনও রাতের আকাশ দেখে না। আকাশে হাত তুলে দাঁড়ানো নেতা রাতের আকাশ দেখে না। যারা হাত তুলে তুলে স্লোগান দেয় তারা কখনও আকাশ দেখেনি। ধার্মিকের রাতের আকাশ দেখে রোজ বলা উচিত, আমি পাপী। নিজেকে পাপী ঘোষণাই, ওইভাবে, শ্রেষ্ঠ উপাসনা।

জ্যোৎস্নারাতে মরুভূমির আকাশে চেয়ে আছেন মনসুর। সুফি দরবেশ। এত আনন্দ হল তাঁর! এই গল্পটা বলেছেন ফরহাদদা। নগ্ন সেই ফকির, কখনও কাপড় পরতেন না। জ্যোৎস্নার সুতীব্র মরু-আকাশ। ওদিকে চেয়ে তাঁর মনে হয়েছিল, আমিই ঈশ্বর। হয় তুমি নিজেকে পাপী মনে কর, নয় তো ঈশ্বর মনে কর। আকাশ মমতাময়ী বোন। কেউ তোমাকে জায়গা না দিলেও ওই আকাশ দেবে। আকাশলীনাকে বলব, ফরহাদদা মনসুরের কথক। ওই একটা গল্প সঙ্গে করে আমি বার হব পথে। আর ফিরব না। যতদিন হিংসা না শেষ হয়, মানুষ যে মনে করছে, সে মানুষ, এটা তার কল্পনা— মানুষ কখনও মানুষ হয়নি। শুধু কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করেছে তার মনুষ্যত্ব। সবার উপরে মানুষ, সেই মানুষ একদিন পৃথিবীতে জন্ম নেবে। আমি সেদিন আবার আসব।

ফরহাদদা বলেছেন, শেখর আনসারি বলত, 'ইন্না আতায়না কাল্‌কওসর।' মানুষের মধ্যে রয়েছে কওসরের হৌজ। অমৃতের কুণ্ড। কোরানে খোদা মানুষকে বলেছেন, তোমাকে আমি কওসর দান করেছি। এই দেহের ভিতর সেই অমৃত রয়েছে। মনসুর সেই অমৃতের সন্ধান জানতেন। সেই অমৃতে তুমি তোমার সব ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্ত করবে। একদিন ফরহাদদা হঠাৎ রেগে উঠে বলেছিলেন, আচারবাদী ধার্মিক কখনও সেই অমৃতের খোঁজ পায় না। কথাগুলো শুনে অবাক হয়ে ভেবেছি, আমিও তো ওই কওসরের কখনও সন্ধান পাব না। কখনও বলতে পারব না, আমিই ঈশ্বর। মরুভূমির চাঁদের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াতে পারব না। নগ্ন হয়ে একটি সুদীর্ঘ মরুপথ পাড়ি দিতে পারব না। সমুদ্র কিনারা ধরে চলে গেছে আমার পথ। আমি কল্পনা করি শুদ্ধ নগ্ন একটি মানুষ, শিশুর মতন পৃথিবীর পথে ঘাড় গুঁজে এগিয়ে চলেছেন। তার দাড়িতে, শরীরে মরু লু বয়ে এসে আচ্ছন্ন করেছে তাঁকে।

আর একস্থানে রুদ্র লিখেছে, একজন চিত্র-সাংবাদিকের সঙ্গে ভাব করে আমি দাঙ্গাধ্বস্ত কলকাতার ক্ষতচিহ্নগুলি দেখেছি। তিনি আমাকে এমন এক স্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে শুধু পোড়া বাঁশ, দগ্ধ কাঠ, ভাঙা মাটির পাত্র, টালিভাঙা আর ছাই। একটা বস্তির কিছুই আস্ত ছিল না। এখানে যে মানুষ বাস করত ভাবতেই দম বন্ধ হয়ে আসছিল। একটু একটু ঝটকা-হাওয়া এসে ভস্মে লেগে আকাশে উড়ে যেতে চাইছিল কালো পোড়া ছাইগুলি। প্রাণের কোনও অস্তিত্ব ছিল না এখানে। সাংবাদিক বলেছিলেন, প্রমোটাররা এখানে দালান তুলবে। এখানে আলো ঝলমলে বাজার বসবে। কত কি হবে!

প্রশ্ন করেছিলাম— মানুষগুলো, যারা এখানে ছিল?... উনি বলেছিলেন— কারা? জানো ভাই, এই কলকাতা গরিবকে সহ্য করতে পারে না। বস্তি আছে বলে কলকাতার ভারী দুঃখ! এখানে দারিদ্র জিনিসটা ছবিতে আঁকা হয়। সিনেমায় হয়। সেসবও চড়া দামে কেনাবেচা হয়। উপন্যাস লেখা হয়। তা সেসব হয়, শিল্প। এই যে ছবি তুলছি, এটা পয়সা দেয়, নাম হয়। যারা চলে গেছে, তাদের জন্য দুঃখ করে লাভ নেই।

—কেন? দুঃখ হলে কী করবেন?

—ছাই গাদার ছবি তুলে কী হবে? ওই দ্যাখো! এক ঝাঁক সবুজ টিয়া। দাঙ্গা, যুদ্ধ

BanglaBook.org

এসব যখন হয়, কিছু না থাকলেও সেই পোড়া জায়গায় দানা খুঁটে খেতে পাখি আর ইঁদুর আসে। কবিরা এই দৃশ্য দেখে ভাবে, সবুজ পাখি হল জীবনের লক্ষণ। যারা গেছে, মরে কিংবা পালিয়ে, ওরা যদি দেখত ! সব ব্যাপারটা অহেতুক, বুঝলে !

—আজ্ঞে ! আপনার এই ছবিটা অহেতুক বলছেন আপনি ?

—হ্যাঁ। তাছাড়া কী। পাখিগুলো এল কেন বল তো ? কুচকুচে ভারী মিষ্টি পাখি একটা। দাখো, দ্যাখো ! ও শালা চৌকিদার ! ছবি বল, গান বল, কবিতা বা পাখি বল, এসব হল সান্ত্বনা। যাক, এসবও তাহলে আছে, এই আর কী !

—না না। এ আপনি ঠিক বলছেন না। কিছুই হবে না তাহলে ?

এবার চিত্র সাংবাদিক হা হা করে হেসে ফেলে বললেন— তুমি ভাই ছেলেমানুষ। আমার ক্যামেরায় ভবিষ্যতের ছবি ওঠে না রুদ্র। ওই পাখিগুলি যদি ভবিষ্যৎ হত, তা কে বুঝবে ! এখানে বাবুদের বাগান হবে, তখন পাখি আর ইঁদুর আবার আসবে।

বাতাস আছে জমাট স্তব্ধ নিষ্প্রাণ এখানে, তা-ও ছাইয়ের উপর এসে হঠাৎ লেগে সরসর শব্দ করে থেমে যায়। একটি শিশুর পোড়া পিণ্ড মুখে করে কালো রঙের কুকুরটিকে দেখা যায়। সিরসির করে ওঠে বুকের মধ্যে। 'দয়া করে তুলবেন না' বলে চিত্রসাংবাদিকের একখানা হাত চেপে ধরি আমি পেয়ে যাই একটি পুঁতির মালা, চুল বাঁধার শস্তা টায়রা, একটি ভাঙা আয়নার ফ্রেম। এই সবই কুড়িয়ে তুলে নিই।

সাংবাদিক বললেন— দাঙ্গার পর কুকুরও আসে। কেন জানো ? সারমেয় হল স্বয়ং ধর্ম। আহা ! বাচ্চাটা যখন আছে, মা-ও আছে তাহলে ! আমি দেখব একটু ? এই বাঁশ, খানিকটা তুলে দেখলে, দেখা যাবে, মা-ও পুড়ে গেছে রুদ্র ! এরা পালাতে পারেনি। বাচ্চা ফেলে মা পালায় না।

—দেখুন প্রবীরদা ! এই সব ছবি তুলবেন না !

—আরে না না ! ওই দ্যাখো, একটা সোনার মতন পাখি ! কী পাখি বল তো !

—লক্ষীপেঁচা। বোধহয় বাস্তুপাখি। এখানে থাকত !

—হবে ! এত চমৎকার পাখি, নড়ছে না। রোদে কানা হয়ে গেছে।

—আমার মাকে মনে পড়ছে প্রবীরদা !

—বাড়ি যাও।

—না।

—কেন ?

—একখানা ছবি দেবেন আমাকে, মায়ের কাছে পাঠাব।

—ওই দ্যাখো ছাতারে পাখি, ছাই মাখছে। তোমাকে বলছি, এই সব পাখির কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। মনে হচ্ছে, অনেক রকম পাখি আমাদের ঘিরে ধরছে ক্রমশ। চলো চলে যাই।

—পাখি ঘিরে ধরছে ? কেন ?

—জায়গাটা এখন ওদের দখলে। ইঁদুর আছে, গুবরে পোকা আছে, নানা রকম জীবাণু আছে, পতঙ্গ আছে, সাপ থাকতে পারে। এত সুনসান ! আমি আবার বেশিক্ষণ মানুষ না দেখলে থাকতে পারি না। চলো।

চলে এসেছিলাম আমি। প্রবীরদার কথায় আমার মাকে বাবাকে আকাশলীনা আর দাদিমাকে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল। ভাবছি, কালই গাঁয়ে ফিরব।

তারপরই রুদ্র গাঁয়ে ফেরার চেষ্টা করে। হস্টেল সুপারকে বলে বার হয়ে আসে। আর ফেরে না।

BanglaBook.org

রাত্রে ডায়েরিখানা বাবার সিঁখানের কাছে ছিল। গভীর রাতে কেমন এক ঘোরলাগা আচ্ছন্ন অবস্থায় তক্তাপোশ থেকে নামার চেষ্টা করেন। কোনও স্বপ্ন দেখেছিলেন হয়তো। কাঁপতে কাঁপতে লাঠি ধরবার জন্য বিছানা হাতড়াতে থাকেন। ঘরে মৃদু আলো। দেওয়ালে বাবার ছায়া পড়ে। বাবার মুখে কেমন দুর্বোধ্য ভয়ার্ত বোবা শব্দ শুনি। ঘুম ভেঙে দেওয়ালে ছায়া দেখতে পাই।

—তোমার কাঁধটা ধরতে দাও ফরহাদ! বলে চেরা স্বরে বাবা ফরহাদকে ডেকে মেঝেয় উপুড় হয়ে পড়ে যান। আমি বিছানা ছেড়ে নেমে বাবাকে ধরি। মাকে দাদিমাকে ডেকে উঠি। দেওয়ালের ছায়ায় বাবা দু'হাত ঊর্ধ্বে তুলে চাপা আর্তনাদ করে পড়ে গিয়েছিলেন। ওঁকে মেঝে থেকে তুলে ওঁর বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। বাবার চোখের কোণে সামান্য অশ্রু।

পরের দিন সন্ধ্যার কিছু আগে বকুল আনসারি আমার সামনে এসে দাঁড়াল। বলল— আকাশদিদি! মুসা কেমন আছে!

দাদিমা সঙ্গে সঙ্গে বকুলের সামনে ছুটে এসে বললেন— শেখরের নিয়েত ভাল ছিল না বকুল! খাসিকে শেয়ালে খেয়েছে। আমিও পাপী। খুদাও নেয় না যাকে তার আর ঠাঁই কিসের বাবা!

আমি আকুল হয়ে বলে উঠি— আর কত নিষ্ঠুর হবে দাদিমা!.... ফরহাদ কোথায় বকুল! বলো আমাকে।

—এসেছে দিদি! তোমাকে চিঠি দিয়েছে। হাতচিঠি। পড়ে দ্যাখো! বলে একখানা কাগজের ভাঁজকরা টুকরো আমার দিকে এগিয়ে ধরল বকুল। তারপর চলে গেল।

রাত হয়েছিল। বারান্দার থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আমি তারকাখচিত আকাশ দেখছিলাম। বাতাসে ফুলের ধূসর গন্ধ। দাদিমায়ের তসবিহের আরবি গন্ধ। উনি মোমবাতি হাতে করে নামাজ-নিষিক্ত মুখে আমার সামনে দাঁড়ালেন। গভীর দৃষ্টিতে আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন। তারপর বললেন— অজু ওর গাড়ি এনেছে মা! যাও, ওঠো! তোমাকে বিদায় দিচ্ছি। তুমি যাও। ফরহাদ আমারই আমানত। আমি সেই আমানত তোমাকে দিলাম। অজুকে বলে দিয়েছি, যতদূর চাইবে ও নিয়ে যাবে। গাঁয়ে তোমরা থেকো না।

১৪. ফরহাদের শেষদৃশ্য

কলেজের ব্ল্যাকবোর্ডে চকপেন্সিল হাতে ধরে অঙ্ক কষছিল ফরহাদ। ছাত্রদের অঙ্ক শেখাচ্ছিল। গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি, পরনে সাদাধুতি লুঙ্গির ভাঁজে ঝুলন্ত। পায়ে কোলাপুরি চটি। মুখে সুন্দর করে আঁচড়ানো ঈষৎ কোঁকড়ানো কালো দাড়ি। গোঁফ সুন্দর হয়ে মিশেছে দাড়ির সঙ্গে। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন দেখায় ওকে। একটা পবিত্র আলো জেগে ওঠে স্মিতহাসি ফোটানো আদলে। ফুলের যেমন নিজস্ব আলো আছে, ওরও মুখের হাসি সেই রকম। ওর চোখেমুখে কোথাও দুঃখের লেশ নেই।

ও পেয়েছে শরীরের অভ্যন্তরস্থিত অমৃত-উৎসের চেতনা, কওসরের খোঁজ। হৌজ। মরু জমজমার পানির মতন কোনও আনন্দ। ওর অমন সুন্দর চেহারার দিকে চেয়ে থাকতে বেশিক্ষণ পারি না। খুব দুর্বল লাগে নিজেকে।

চকপেন্সিলটা মট করে ভেঙে গেল অঙ্কের মাঝখানে। হঠাৎ তারপর আকাশলীনাকে

মনে পড়ে গেল। পেন্সিল ভেঙে পড়া আর তৎক্ষণাৎ আকাশকে মনে পড়া, ঘটনা এই রকমই ছিল। ফরহাদ অঙ্ক শেষ না করে ক্লাস ছেড়ে চলে আসে। কলেজ করে না। বিলাসপুর রওনা দেয়।

আকাশলীনাকে চিঠিতে বেশ কয়েক ছত্র কথা সে লিখেছে। জিয়াগঞ্জ কলেজে চাকরির সংবাদ জানিয়ে বলেছে, হঠাৎ তোকে একবার দেখতে ইচ্ছে করল। কেন করল বলতে পারব না। গাঁয়ে কতদিন যাই না। বাড়িটা তালাবন্ধ পড়ে আছে। এভাবে পড়ে থাকলে পার্টির ছেলেরা দখল করেও নিতে পারে। আমি ঠিক করেছি কমলা ওর স্বামীর সঙ্গে ওখানে বাস করবে। গাঁয়ের ভিতর ওরা কতদূর টিকতে পারবে বুঝতে পারছি না। কমলার স্বামী দেহতত্ত্বের সাধক এবং সুগায়ক। ওরা বসত করার আগে জায়গাটা একবার আমি দেখতে চাই। গ্রামের সন্ত্রাস দমনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নতুন এস.পি. এবং পুলিশের আরও উচ্চপদস্থ অফিসার তাঁদের টিম নিয়ে কাজে নেমেছেন, হিন্দি সিনেমায় এ রকম দেখা যায়। একদিকে ভারতের অত্যন্ত জটিল সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি, বিভিন্ন রাজ্যে চরম উগ্রপন্থার তাণ্ডব, অন্যদিকে সন্ত্রস্ত গ্রাম এবং তার নোংরা রাজনীতি— আমার মতো ফকিরের পক্ষে এই মাতৃভূমি আর যোগ্যস্থান নয় আকাশলীনা। আমার এই দেহই হচ্ছে আমার ভূমি, এর কাঠামো আমার মাতৃদেশ, আমি শরীরবিরোধী মানুষ— কষ্ট হয়, তোকে আমি প্রকৃতি বলে ডেকেছিলাম। তুই একবার আসবি?

স্বরূপগঞ্জে নেমে ফরহাদের মনে হল, সে হয়তো এভাবে চলে এসে ঠিক করেনি। চায়ের দোকানে যেখানে এর আগে নিগৃহীত হয়েছিল, ওখানে সেই সব এল.সি-র বাচ্চাদের দেখতে পায় সে। ওদের এক হর্তালোক পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে তার দিকে। ওর সঙ্গে থানার এক বাবুও এসে পড়ে।

মেজ অথবা সেজ যে কেউ হবেন বা তিনি। খাকি পোশাকের মোচঅলা নেয়াপাতি ভুঁড়ির লোকটা বলল— থানায় যাবেন?

—কেন? থানায় যাব কেন?

—না, তাই বলছি। আপনার বাপের ব্যাপারে একটা মাসপিটিশন করা যায়।

— না যায় না।

—সামনে পঞ্চায়েত ইলেকশন। ধরপাকড় চলছে। খালি নাম বললেই চলবে।

—কার নাম বলব?

—খুনিদের নাম।

—জানি না।

—আপনি জানেন!

—জানি না। কাউকে দেখিনি আমি।

—এস.পি খুঁজছে আপনাকে। থানায় চলুন।

—থানায় কেন যাব? আমি যাব না।

—আপনাকে যেতে হবে মশাই। না গেলে, ফোর্স করব।

—কী বলছেন আপনি? ফোর্স করবেন মানে?

—আপনি যেতে বাধ্য।

—না, আমি বাধ্য নই। আমি এই সমাজ, এই রাষ্ট্র, এই সব থানাটানা বিশ্বাস করি না।

—লেখাপড়া করেছেন। ভাল ডিগ্রি। এই পথে গেলেন কেন? থানার সঙ্গে কথা বললে আপনারই উপকার হত। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে.....

—আমি সচেতন নই। আউল বাউল লোক। বাউল মানে পাগল।

—সেজেছেন। একটা সঙ্ঘও তো আছে আপনার। আশ্রম খুলেছেন নাকি? আপনি বাবা? শিষ্যশাবক আছে কিছু? শুনুন, সাবধানে যাবেন।

পা বাড়িয়ে থেমে গেল ফরহাদ। ঘুরে দাঁড়াল। হর্তার পিছনে একজন মুঙ্গেরি বেহারি মাস্কেট বানানেওলা পেটানো স্বাস্থ্যের লোক এসে দাঁড়াল। গালে চকচকে কাটা দাগ, একটা চোখের তলা ছিন্ন হওয়া জখমে দৃষ্টিকে বীভৎস করে তুলেছে। হিন্দি সিনেমায় এ রকম লোক দেখা যায়। আর একটা লোক এল, বোমাবাঁধুনি মেয়ে, বুকে স্তন নেই, পুরুষের মতন সমতল বুক, ঘাগরা পরা, শরীরের ঊর্ধ্বভাগে ঢোলা ব্লাউজ, কিন্তু তাতেও বোঝা যায় কঠিন শরীর, চোখেমুখে মায়া নেই। চোয়ালের হাড় ঠেলে উঠেছে, নাকে নথ। লম্বাটে মুখ, অনেকখানি ঘোড়ার মতন, কপাল উঁচা, দাঁত দিঘল এবং মিসিমাখা, ঠোঁটে জনকপুরী খয়েরের গুঁড়ো লেগে রয়েছে। তামাকের বদ গন্ধ নাকে এসে লাগল।

এই মেয়েটার কাছেও পুরুষের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি আছে। বোমা বাঁধলেও একে কেউ চুম্বন করে, গ্রামবাংলার বিনাশ ঘটালেও এই মেয়ে কারিগর, প্রণাম মা। মনে মনে বলল ফরহাদ। মেয়েটার গাল দু'টি কিসের দাগে ভরা। ইনিই ভারতবর্ষ। মনে হল ফরহাদের। ঈষৎ বুকের মধ্যে ভয় হল। ওর তখন মনে হল আকাশলীনার সুন্দর মুখখানি না দেখলে এই রাতে সে আর বাঁচবে না। মিসিখোর, জনকপুরী, অশ্ববদনা, দীর্ঘদন্তিনী, রণরঙ্গিনী রাক্ষুসীর নিঃশ্বাসে আগুন। ঠোঁটদুটি জোড়া জোঁকের মতন আঠায় আঠায় জুড়ে না গিয়ে দাঁতের জন্য তলের অধর একটু উল্টে রয়েছে বাইরে সামান্য ঠেলে এসে। ময়লা ঘাগরা থেকে বাতাসে ভেসে আসছে রক্ত, ঋতু, বীর্য, ঘামের বাসি গন্ধ। একটা দাঁতে রুপোর তার বাঁধা, পায়ের নখে পিতল রঙের আংটি। পায়ে লোম। চোখ দু'টি গর্তে ঢুকেছে, সরু, ক্ষুধার্ত। খুতনির কাছে চুলঅলা জড়ুল। মাথার চুলে পেটানো সরষে তেল। সিঁথিকাটা, দগদগে সিঁদুর, উকুন আছে। ঝিলিক দিচ্ছে সাদা দু'একটি চুল। মা গো, তুমিই ভারতমাতা। এই ছোটলোক পুলিশটার দেশ। এই ঠোঁটে হর্ষদ চুম্বন দিলে তোর সমতল বুক কেঁপে ওঠে। কপালের ভাঁজে স্যাঁতসেঁতে দুঃখে একটা ডুমো মাছি উড়ে উড়ে বসছে।

এই মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ফরহাদের মনে এক আশ্চর্য বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে। আকাশলীনার জন্য তৃষ্ণা তীব্রতর হয়। তার বারবার মনে হচ্ছিল, এভাবে হঠাৎ গাঁয়ে ফিরে ঠিক করেনি। মাস্কেটিয়ারদের ধরপাকড় চলছে ঠিকই, তা-ও পঞ্চায়েত নির্বাচন আসন্ন তাই, ভোট চলে গেলে আবার সন্ত্রাস চলবে। এবারে ঘরে ঘরে মেয়েরা ভোটে দাঁড়াচ্ছে, হেঁশেলে অবধি দুর্নীতি, সন্ত্রাস ঢুকবে। মেয়েরা এমনিতেই অল্পে লোভী, তুচ্ছ কারণে স্বার্থপর, আবার এই মেয়েরাই অসম্ভব করুণাময়ী, মায়ামমতা বেশি, প্রাণত্যাগ পর্যন্ত করে স্বামীসন্তানের জন্য। অনেক বউ আজকাল স্বামীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বোমা বাঁধে। ভাতের হাঁড়ির মধ্যেও বোমা লুকিয়ে রাখে।

অনেক মেয়ের অন্তরে বাস করে মিসিখোর বেহারি মেয়ে, কদর্য তার রূপ। পা ঝামড়ালে গ্রাম কাঁপে। মিসিখোর, বিড়িফোঁকা মেয়েটাই যদি এই বাংলার প্রেরণা হয়, তাহলে এখানে এলাম কেন? ভাবল ফরহাদ। এই মেয়েটাই হয়তো কলকাতায় মেয়ে এবং শিশু পাচার করে। কুয়েতের শেখেরা উটের দৌড় প্রতিযোগিতায় উটের পায়ে যে শিশুদের বেঁধে দেয়, সেই শিশুদের জোগান দেয় এই মেয়েটা। বাংলাদেশ থেকে শিশু আর মেয়েদের চালান আনে। ফরহাদ মনে মনে নিজেকে বলল, এই মেয়েটাই যে ভারতবর্ষ, আমার সন্দেহ নেই। যারা এই মেয়েটাকে দেখতে পায় না, তারা ভারতকে

BanglaBook.org

চিনতে পারে না।

নারীর মধ্যেই রয়েছে মানুষের সম্পূর্ণতা, নারীর কোনও জাত নেই। এসবই কল্পনা করেছেন লালন ফকির। বেদ ও ধর্মাচারে শূদ্র ও নারীর অধিকার নেই। বিয়ে হলে নারীর গোত্র ও ধর্ম বদল হয়। পুরুষের হয় না। নারীর মুসলমানি হয় না, পৈতে হয় না। উচ্চবর্ণে বিয়ে হলে নারী উচ্চবর্ণ লাভ করে। বস্তুত নারীর নিজস্ব কোনও জাত নেই। কারণ নারীর রজঃবীজের, ঋতুচন্দ্রিমার জাত হয় না। লালন নিজেকে নারী হিসেবে কল্পনা করতেন। ফরহাদ ভয় পেল, আমি কি এই মিসিখোর রমণী ? এর নাম নারী ? আমার বাপের হত্যার দায় এই মুঙ্গেরি মেয়েটা বহন করবে না ?

ফরহাদের মুখের দিকে চেয়ে হি হি করে হেসে উঠল মেয়েটা। অকারণ। দ্রুত ফরহাদ পা চালিয়ে দিল অন্ধকারে। ওকে অনুসরণ করতে থাকল পাতু খাঁ, বেহারি স্বামীটা, মুঙ্গেরি বোমাবাঁধুনি মিসিখোর মেয়েটা। ফরহাদ হঠাৎ শুনতে পেল— চলে যাও। এলে কেন ? থানায় গেলে বুঝবা কত ধানে কত চাল !

বারবারই ফরহাদের মনে হচ্ছিল এরা তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করবে না তো ! থানা তাকে ডাকছে কেন ? বাপের মৃত্যুর দিনই থানাকে যা বলার সে বলে দিয়েছে। কতবারই ক্যাডার ওরফে ষণ্ডা মাস্কেটিয়ারদের বলেছে, সে নাম বলবে না। সে বাবার কবর দিয়েছিল, কেননা বাপ বলেছিল, কোনও ফল নাই। থানাপুলিশ না করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল শেখর আনসারি।

ফরহাদ এই সমাজের কাছে নিষ্কৃতি চেয়েছে। মনে মনে সেলাম করেছে, জনপুঞ্জ যেন তাকে রেহাই দেয়। কোনও কথা সে বলবে না, কোনও দাবি সে করবে না। এই গ্রামের জন্য তার কোনও প্রেম নেই। কারণ মৃত মানুষের যেমন প্রেম থাকে না। সমাজের কাছে নিজেকে মৃত ঘোষণা করাই আজ তার দর্শন। তার খেলকা ধরা দেহটা কেবল বহন করছে সে।

অবশ্য সমাজের কাছে মৃত হলেও তার বুকের খাঁচায় নূরের বাতি জ্বলছে। সাধু-সমাজে সে পুনর্জীবিত হয়েছে। এই ধরনের গেরুয়া পাঞ্জাবি না পরলে নিজেকে মৃত বলে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে হতে চায় মানুষ-রতন, হতে চায় সোনার আদম।

প্রেম সে সমাজকে করে না, নারীকে করে। নারী তার আস্তিক্য। পৃথিবীর ক্রমমুক্তির কথা সে ভাবে না। এই পৃথিবীর কোনও সমালোচনায় তার উৎসাহ নেই আর। কে প্রধানমন্ত্রী, কে হর্ষদ, কে মুখ্যমন্ত্রী, কে রশিদ, তার সেই সমাচারে একফোঁটা ঔৎসুক্য নেই। কোনও মন্দির মসজিদে তার প্রবেশ আকাঙ্ক্ষা নেই, সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে সে একটুও বিচলিত হবে না। কোনও কেতাবি ধর্মই সত্য নয়। সব মানুষের লেখা। মানুষের মিথ্যা কল্পনা দিয়ে ধর্মের বয়াত রচিত। সব অনুমান। নারীর উন্মুক্ত দেহই তার সামনে খোলা ধর্মগ্রন্থ। যে দেহে জাতের চিহ্ন আছে যে দেহ অপবিত্র। নারীকে জাত দিলে তাকে অপবিত্র করা হয়।

আকাশলীনাকে সৌম্যব্রত অপবিত্র করতে চেয়েছেন, জানি না কী ঘটেছে ! একথা ভেবেই ফরহাদ কলেজ ছেড়ে রওনা দিয়েছে এই পথে। যেতে যেতে অসহ্য বোধ হচ্ছিল তার অনুসরণকারীদের। নদীর ধারে এক জায়গায় এসে পথ দু'ভাগ হয়েছে। ফরহাদ ভাবল, পাতু খাঁকে পথ ছেড়ে দেওয়া যাক। ওরা যেপথে যাবে, ও সেই পথ ছেড়ে অন্য পথ ধরবে। থেমে পড়ল ফরহাদ।

ফরহাদ থেমে পড়েছে দেখে পাতু খাঁ বলল— চলেন ! থামলেন ক্যানে !

—আগে তোমরা চলো !

—তা হয় না। আপনি চলেন।

—আমার ঠিক নেই। অনেক দিন এ পথে হাঁটিনি, সব ঠিক ঠাহর হয় না। আগে চল, আমি তোমাদের দেখে যাই।

—চলেন চলেন! বলে হঠাৎ পাতু জোরে ফরহাদকে ধাক্কা দিয়ে বলে ওঠে— সন্ধ্যা হলে আর আগাতে পারবেন না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। ঠিক এই সময় সামনে সাইকেল হাঁকিয়ে এদিকে ছুটে আসা বকুলকে দেখে আশ্বস্ত হয় ফরহাদ।

—ফরহাদদা! বলে বিস্ময় প্রকাশ করে বকুল ফরহাদের খুব কাছে এসে নামে।

—হ্যাঁ বকুল। চলে এলাম। তুই কোথায় যাবি?

—সদর মুনশির বিড়ির নেপালি মশলা, উড়িয়া-কাঠি আর পাতা, দাদির ছাঁচি পানপাতা, আরও আছে নানান কিসিম। পায়েস রাঁদবে মা, গরম মশলা, তেজপাতা। গঞ্জে যাব।

—দাঁড়া। ব'লে পিছনে ঘুরে পাতু আর বেহারি স্বামী-স্ত্রীকে দেখল ফরহাদ। বলল— যাও পাতু। বকুলের সাইকেলে আমি যাব। আমার দেরি হবে।

—ক'দিন থাকবেন ইখানে? বিলাসপুর? বলি কি, আপনের থাকাডা উচিত না।

—কেন?

—ছুপার ছাহেব আপনেকে ছাড়বে না। ও.ছি. ছাড়বে না। খুবই জ্বালাবে আপনেকে। গাঁয়ে থাকবেন, সেই জো নাই।

—কেন?

—আমরাই থাকতে দিব না। আপনের কাফ্‌ফারাও লিব না।

—আমি কাফ্‌ফারা দেব? কাকে? কেন?

—আপনি কাফের। বেশ্‌রা ফকির। ধর্ম মানেন না। বাপ আপনের কাফ্‌ফারা, জুরমানা দিয়ে সমাজে থাকত। সমাজ পায় নাই। পাঁচসিকা কাফ্‌ফারা ছিল ছেখর আনছারির। ছিল না? তা দিয়ে বেচারি মসজেদে ধূপ আর মোম কিনে দিয়ে গাঁয়ে নিবাস নিয়েছিল।

—হ্যাঁ। তো?

—আপনের বেলা ওইডে হবে না ফেরাউন আনছারি।

—ফেরাউন?

—হ্যাঁ জি। খুদা মান না আপনি। লোকে আপনেকে ফেরাউন কহে। পাপী। পাঁচসিকায় আজ আর সমাজ পাওয়া যায় না।

মিশরের প্রাচীন সম্রাট ফ্যারাও অথবা ফেরাউন সম্বন্ধে পাতুর সমাজে কঠোর ঘৃণা সঞ্চিত রেখেছে লোককাহিনী। ফরহাদ জানে, ফেরাউন নিজেকে খোদা বলত। সেই রাজারা ছিল খোদার প্রতিদ্বন্দ্বী। এই স্পর্ধার জন্য তাদের স্বর্ণনগরীগুলি ধ্বংস হয়েছিল। মহামারী, বন্যা, দুর্ভিক্ষ—সবই নিশ্চিহ্ন করেছিল অহঙ্কারী রাজাদের। ফরহাদকে ফেরাউন সম্বোধন সেই সুতীব্র ঘৃণার বদ উদগার। ফরহাদ সীমাহীন বিস্ময় আর নিরাশা বোধ করল। ঠাণ্ডা গলায় খাটো সুরে বলল—আমি তোমার সমাজ চাই না পাতু। তোমার খোদাকেও দরকার নেই। হিন্দু তার ঈশ্বরকে নিয়ে থাক, তুমি থাকো তোমার খোদা নিয়ে। চিরকাল আমি পাল্লা দেব পাতু। মানব না। তোমার হাতে মাস্কেট আছে জানি, তবু... যাও, চলে যাও। বলতে বলতে ফরহাদের নাসিকা স্ফীত হয়ে ওঠে।

পাতু তখন ভারতমাকে সঙ্গে করে তৎসহ স্বামীটাকে নিয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়।

BanglaBook.org

ফরহাদ সহসা ডেকে উঠে বলে—শোন পাতু ! তোমার সমাজের জন্য আমি লালায়িত নই, ওই বাসনা আমার ঘুচে গেছে।

—পাল্লা দিবা ? ফেরাউন পাগলা ! পাল্লা দিবি তুই ? কী আছে তোর ?

—গান। আমার গান আছে। তোমার মাস্কেট আছে এল.সি.-র বাচ্চা। আমার গান আছে রে ! বলেই ফরহাদ অসম্ভব বিষণ্ণ হয়ে যায়। সূর্যাস্তের দিকে মুখ তোলে। লজ্জায় চোখ মাটিতে নামে সূর্যাস্ত দেখে। পথের একটি গাছের তলায় বসে পড়ে। পকেট থেকে বকুলকে চিঠিটা বার করে দেয়, যা সে আকাশলীনাকে লিখেছে।

আযোধ্যার রক্তমাখা সূর্যাস্ত দেখে ফরহাদ। এ কি কোনও মহৎ সূর্যাস্ত ফিকিরচাঁদ ? সামনের সুবিস্তৃত বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চেয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে অবিশ্বাসী ফরহাদ। এই সূর্যাস্ত কার ? কার জন্য ? আকাশলীনা ! তোর জন্য কি নয় ? ওই চঞ্চল পাখিটা কে রে আকাশ ? ওটা কি নুরের পাখি ? আলোর পাখি ? সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় বিলীয়মান বিহঙ্গ ; এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা !

একবার কি আসবে না আকাশলীনা ? ওর কি বিয়ে হয়ে গেছে ? ওরা কি কলকাতা চলে গেছে ?

গাছপালার আড়ালে নেমে যাচ্ছে রাঙা সূর্য, প্রকৃতির কপালে রঙিন টিপ। উপমা হয়তো নতুন নয়, কিন্তু এখন সেই উপমাটাই কী বিশ্বাসযোগ্য ! হঠাৎই মনে হল, এ জীবন আকস্মিক। ফিকিরচাঁদকে মনে পড়েছিল ফরহাদের। একজন ফকির মানুষকে দান করেন সেই ধর্মবোধ, যা তাঁর গানে তিনি গেঁথেছেন। এই গানের ভাবের অনেক উপরে নিবাস করেন ফিকিরচাঁদ। মনসুর হেল্লাজ বা মনসুর আল্লাজ যেমন করতেন। পাতু খাঁকে মনে মনে ক্ষমা করে দেয় ফরহাদ। আকাশে একটু একটু ঘন হয়ে উঠতে থাকা পবিত্র অন্ধকার। সূর্যের আলোর তাঁতে বোনা হয়েছে সন্ধ্যা তারার চুমকি। টলটল করছে ফিকির চাঁদের আত্মার তিমির। ফকিরের আত্মা তার দেহ। ওই তারকা মনসুরের চোখের মতন জেগে উঠেছে।

যিনি এই গগন তপন পাতাল ভুবন শূন্য পবন স্থলে জলে
যিনি এই গাছগাছড়ায় দালান কোঠায় পত্র কুটির ঘরের চালে
তিনি তোর দেলের মাঝে বসে আছে ভালমন্দ কথা বলে।

ভালমন্দ কথা কইতে কইতে বাড়িতে পৌঁছেছিল ফরহাদ। আশ্চর্য নির্জন বাড়িতে তালা খুলে ঝাঁট দিয়ে বাইরে মাদুর পেতে নিয়েছিল। বাবার দোতারা ডুগডুগি বার করে ধুলো ময়লা সাফ করছিল কুপির আলোয়। সহসা শুনতে পায় মনের মধ্যে শুয়ে থাকা ঘৃণার কণ্ঠস্বর। 'লোকে আপনেকে ফেরাউন কহে।' চমকে ওঠে ফরহাদ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর দোতারায় টান দিতেই গম্ভীর অন্ত্রনাদ শোনে। বাবার গলা। বাবা ফিকিরচাঁদের সেই গানটা করতেন।

'যিনি সেই চীন তাতারে রুম শহরে বর্মা কাশ্মীর ঝিল নেপালে/ তিনি তোর ভাতের গ্রাসে খাটের পাশে নাচিয়ে বেড়ান লয়ে কোলে।'

এইভাবে রাত্রি বেড়ে গিয়েছিল। বকুল চাঁদপুর থেকে ফিরে এসে ফরহাদের জন্য থালায় করে ভাত এনেছিল। ভাত মুখে দেওয়ার সময় মুঠোভাত কপালে ঠেকিয়ে ফরহাদ উচ্চারণ করেছিল—আলেক।

কোরানের একটি লবজ্। অন্নই আলেক সাঁই। বিসমিল্লা-হির-রহমান-উর রহীম, না বলে ফকিরি ভাষায় বলেছিল—আলেক। সেই অদৃশ্য ঈশ্বর, তার শরীর অন্নবৎ। এই অন্ন, এই সবজি, এসবই দেহের হৌজে কওসর উৎপাদন করে। সেই কওসরই নুরের

পাখি।

'যিনি তোর চাপদাড়িতে উপবীতে বেদপুরাণ কোরান বাইবেলে তিনি তোর খোল খমকে ঢোলে ঢাকে আল্‌খাল্লায় ফুরফুরি ঝোলে।' নিজের বুকে চেয়ে দেখেছিল ফরহাদ। জামার ফুলঝুরির বাহার, এও কি ঈশ্বরের রূপ? দোতারার টানে, ডুগডুগির খমকে ঈশ্বরধ্বনি শোনে সে।

'যিনি সেই গড়ের মাঠে মনুমেন্টে রেলের রোডে ধূম কলে
তিনি যে নেড়া মাথায় জুলফি খোঁপায় টাকপড়া কি আলবর্ট চুলে
যিনি তোর ভাত ব্যঞ্জনে চুনে পানে দধি দুগ্ধ শাক অম্বলে
তিনি তোর ধুতি চাদর জামার ভিতর কোট পেন্টুলন শাল রুমালে?'

পান খেয়েছিল একটা। পানের মুখ রুমালে মুছেছিল ফরহাদ। কষের দাগ লেগেছিল রুমালে, মনে মনে বলেছিল, এও কি ঈশ্বর নয়? বাবা যেন দোতারা হাতে উঠোনে এসে বসেছিল। ওই তো শেখর আনসারি। কাফ্‌ফারা দেওয়া মানুষটা বসে আছে। তান দিচ্ছে সোনার আদম।

'যিনি সেই মসজিদে গির্জায় ব্রহ্মসভায় শ্মশানে কি গাছের তলে
তিনি মোহান্ত আখড়ায় তুলসী তলায় সর্বস্থানে ভূমণ্ডলে।
যিনি সেই ব্রহ্মপুত্রে পেঁড়ক্ষেত্রে ঘোষপাড়া কি বিন্ধ্যাচলে
তিনি শ্রীবৃন্দাবনে কাশীধামে মক্কা মদিনা চিথুলে।'

তারপর বকুলকে ইশারা করে বলেছিল—গাও দেখি। বাবার সেই গানটা। তুমি তো পার!

বকুল কচি গলায় গেয়ে উঠেছিল—'যিনি সেই নাটক যাত্রায় ঢপ অপেরায় কবি কঙ্কণ কবির দলে/তিনি পাঁচালীর ছড়ায় হাফ আখড়ায় ঝুমুর খেমটা বাঈ মহলে।'

বকুলের কচি গলায় রাত্রির আকাশ ভরে উঠেছিল। বকুল গেয়েছিল—'যিনি সেই কথকতায় রসিকতায় বক্তৃতায় কি পাণ্ডিতটোলে/তিনি তোর ছেঁড়া ছালায় কৌপিন ঝোলায় গোধুড়ি কিংবা কম্বলে।'

ফরহাদ বলেছিল—তারপর বল সেই আসল তত্ত্বখানা।

বকুল বলে উঠেছিল—'ফিকিরচাঁদ বলে' বলব আজ্ঞা?

ফরহাদ মাথা নেড়ে বলেছিল—না বকুল।

'যিনি সেই জাতি হিংসায় বিবাদ ঘটায় যুদ্ধ বাধায় সন্ধিস্থলে
তিনি যে অধীনতা স্বাধীনতা যা বল তা সবার মূলে।'

তখনই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল ফরহাদের উপর। পঞ্চপ্রধানেরা এল, ক্ষুর কাঁচি মাস্কেট এল। পাতু খাঁ, ভারত মা এল। বাউলের দাড়িগোঁফে চরম বিদ্বেষ তাদের। ওরা পশুর মতন করল। সিনেমার মতন বলপ্রয়োগ করল। শরীর গুঁড়িয়ে দিল। ফরহাদকে মারল। কোনও মায়া হল না। লজ্জা করল না। মাস্টার বলে একটুও হাত কাঁপল না। ফরহাদের মনে হল, তার এই দেহ যদি বাবরি মসজিদ হত, তাও এরা শুনত না। ওই দিকে একজন নেতাকেও দেখা গেল।

—তুই কেন এসেছিস? পাতু কমরেড তোকে চলে যেতে বলেনি? মানবি না, কী মানবি না তুই? মাথা নামিয়ে দে। দাড়িমোচ ঝুড়ে দে শালার! অ্যাই অজু, যেও না ওদিকে। ভাল চাও তো ইমামের বিটিকে নিয়ে ফিরে যাও। গর্জে উঠল একজন। অজু তার গাড়ির কাছে ফিরে চলে এল।

অজুর ঘোড়াগাড়ি আটক করেছিল ওরা। এক ধরনের মত্ত হিংসায় চকচক করছিল

BanglaBook.org

ওদের তৈলাক্ত মুখ। গাড়িটাকে টেনে এনে একটি বাগানের মধ্যে অজু আর আমাকে পাহারা দিচ্ছিল। যতবার আমি ঘোড়াগাড়ির পাদানিতে পা দিয়ে নামতে গেছি ওরা প্রবল বাধা দিয়েছে। ফরহাদের বাড়ির উঠোনে চিৎকার চেঁচামিচি শোনা যাচ্ছিল। অবশেষে আমি একা পাগলের মতন ওদের বাধা ঠেলে ছুটে আসি। আমার আর্তনাদ শুনে ওরা চুপ করে গেল। মায়ের আর্তচিৎকার শুনে যেমন করে পাটকিলে মুসাকে ছেড়ে দিয়ে শেয়ালদু'টি উঠোনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল এবং ধীরে ধীরে চলে গিয়েছিল, ওরাও তাইই করল। ওদের মধ্যে হাফ-মৌলভি গোছের দু'জন ছিল। এল.সি-র মেম্বার ছিল। উপ-প্রধান ছিল। মাস্কেটঅলারা ছিল।

একটি মানুষের দেহের কাঠামোও মন্দির বা মসজিদের মতন। একই ভাবে মানুষকে ভাঙা যায়, ধূলিসাৎ করা যায়। দাড়িগোঁফ, মাথার চুল ক্ষুর দিয়ে কামিয়ে দিয়েছিল ওরা। ফকির ফরহাদ আহমেদ আনসারিকে নগ্ন করেছিল ওরা। ওর ঘরের বাইরের দাওয়ায় ওকে উপুড় করে ফেলে দিয়ে ওরা চলে গেল। অন্ধকারের তিমির-পরিচ্ছদ ছাড়া ওকে ঢাকবার আর কিছুই ছিল না।

ফরহাদ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। মানুষের কুলহিংসা, কৌম-বিদ্বেষ আমি দেখেছি। আমার এ এক অপরিসীম অভিজ্ঞতা। ফকিরনিধন ফতোয়া আমাদেরই সামাজিক ইতিহাসের সনদ। মনে হল, মানুষের দেহের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মন্দির কাবা নেই বলে যে কবি তাঁর কল্পনা করেছিলেন, লালনের গানেও সেই উক্তি আছে। মানুষ কেন ঘৃণা করে, তার কারণ আমি জানি না। সুন্নির দাড়ি সুন্নত। তা খুবই পবিত্র। কিন্তু বাউল-ফকির যেহেতু দাড়ির সঙ্গে গোঁফও রাখেন, তাই সেই দাড়ি আর পবিত্র থাকে না। দাদিমায়ের মুখে শুনেছি, গোঁফ-ছোঁয়া জল পেটে গেলে সেই পানি হারাম হয়ে যায়। ফলে ফকিরের দাড়ি গোঁফ কেটে দেওয়া পুণ্যের কাজ।

ফরহাদের নগ্ন দেহে ধীরে ধীরে দিগন্তে জেগে ওঠা চাঁদের ফিকে আলো এসে লাগল। শতাব্দী প্রবীণ হয়েছে এই রাতে। চাঁদটাও বুড়া। চাঁদের গায়ে দাসার রক্ত। রথ গেছে ধর্মযজ্ঞে এই পথে ভারততীর্থে, জাতিদাঙ্গায় রাজনীতির সড়ক তৈরি হয়েছে, আমার পুরুষ লজ্জায় শুয়ে আছে মাটির উপর।

অজু সাহস করে এই দাওয়া পর্যন্ত আসেনি। ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়েছে। শিশিরে ঈষৎ ভেজা সেই ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে ঘোড়াটি, দাঁতের চর্বণে অদ্ভুত শব্দ হয়। আমার হৃদয়কে খাচ্ছে যেন সেই চকচকে দাঁতগুলি, বুকের ভিতরটা সিরসির করছে। জীবনের উপরই কেমন ঘৃণা হচ্ছিল আমার। গভীর লজ্জায় কি শরীর সিরসির করে?

চাঁদ আরও ঠেলে উঠল। ফরহাদের দেহ আরও একটু ফর্সা হল। আমার সাদা উড়নিটা ওর গায়ে ফেলে দিই, আমার আর দেওয়ার কিছুই ছিল না। মানুষের দেহও তো নগ্ন সত্তা, অসহায়। কোনও বর্ম নেই তার। নিরস্ত্র মানুষ। সামান্য উড়নি তাকে ঢাকতে পারে না।

অজুর গাড়িতে তুলে নিলাম ফরহাদকে। খুঁজে পেলাম ওই ঘরের মধ্যে ওর ফকিরি খেলকা। ওর বাবার দোতারা-ডুগি সঙ্গে নিলাম। সঙ্গে রইল বকুল। আমাদের গাড়ি ছাড়ল। কোথায় চলেছি জানি না। ভোর হয়ে আসছিল। ফরহাদের চোখে টগর পাপড়িতে যেমন শিশির থাকে, সেই রকম অশ্রু ছিল। ও কথা বলতে পারছিল না। আমি বললাম—রুদ্র আমাদের ছেড়ে গেছে, আর ফিরবে না।

ও তাকাল আমার দিকে।

BanglaBook.org

১৫. পুনশ্চ

গোল আয়নাটা, আকাশলীনা চলে যাওয়ার আগে মায়ের খাটের বিছানায় ফেলে গেছে। অতএব ওর কাহিনী আর আমরা জানি না। আমরা যা জানি তা এ রকম

একদিন চিঠি মারফত চিত্রিতা গোস্বামী স্বর্ণদীপাকে ডেকে পাঠালেন। স্বর্ণদীপা পৌঁছালেন তাঁর বান্ধবীর ওখানে।

চিত্রিতা বললেন—তোমার নামে একখানা চিঠি আমার কাছে ক'দিন ধরে পড়ে রয়েছে। প্রথমে ভেবেছিলাম তোমাকে দেব না। পরে মনে হল, আর একটু সহ্য কর। চিঠিটা তোমারই পাওনা। নাও। মেয়ে তোমার চলে গেছে, তাই না?

—হ্যাঁ। ওর দাদিমা লীনাকে....বলেই স্বর্ণদীপার গলা বুজে এল। একটু সামলে নিয়ে সম্মুখে বাড়ানো চিঠিটা ধরলেন সৈয়দা স্বর্ণদীপা ইমাম।

প্রিয় স্বর্ণদীপা

তোমাকে চিঠিটা লিখতে গিয়ে কিঞ্চিৎ লজ্জাবোধ হচ্ছে। শুনলাম জিয়াগঞ্জ কলেজের এক শিক্ষকের সঙ্গে তোমার মেয়ে চলে গেছে। ছেলেটি তৃতীয় সমাজের মানুষ, বাউল। বাবাটাবা গোছের একজনের সঙ্গে ভেগে যাওয়ার ঘটনা তোমার পক্ষে নিশ্চয়ই অপমানজনক হয়েছে। একটা কথা কিছুতেই মেলাতে পারছি না, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথের লোক এই কাজ করল কিভাবে, শোনা যাচ্ছে, ছেলেটা ইমামের রাজনীতি করত এক কালে। আগুনখোর মানুষ কিভাবে মানুষের মলমূত্রবীর্য ঋতু পান করবে আজ? শুনেছি, পড়েওছি কিছু, বাউলরা যেসব করণক্রিয়া করে তা সভ্য সমাজে চলে না। নাকি, ওই ভেক ধরাটাই সব। অনেক শিক্ষিত লোক ভেক ধরে অন্য কোনও সুবিধার জন্য। আর একবার তোমার পতন হল দেখছি। অবশ্য একথা তুমি মানবে না আশা করি। এক কালে সমাজ-কৌলীন্য ছেড়ে এসেছিলে, তারপর প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করলে, আমি তোমাকে সাহায্য করার আন্তরিক চেষ্টাও করেছি, কিন্তু তুমি যে আবার এমন করে পড়ে যাবে ভাবিনি, তোমার ভাগ্য দেখে একটা উল্টো অঙ্ক মনে পড়ে গেল, একটি তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে তিন ফুট ওঠে বানরটা চার ফুট নেমে যায়। আমাদের জাতধর্মের বংশটি এতই পিচ্ছিল। এখন মনে হচ্ছে, আকাশলীনার প্রণাম না গ্রহণ করে ভালই করেছি। সংসারে অনেক জটিলতা হত, ও বউ হয়ে এলে।

সৌম্যব্রতর চিঠির অক্ষরগুলি আর অতিক্রম করতে পারলেন না স্বর্ণদীপা। ওঁর দম বন্ধ হয়ে এল। ধীরে ধীরে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললেন তিনি। তারপর জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেললেন।

চিত্রিতার মুখের দিকে নিমেষভর চেয়ে থেকে স্বর্ণদীপা বললেন—আমি কি সত্যিই মুসলমান চিত্রিতা? আমার স্বামীও কি তাই? আমি স্বামীকে বলেছিলাম, মেনে নাও ইমাম। আজ কতকাল পর তোমার সামনে নিজেকেই বলছি, মেনে নাও। ভাগ্যকে স্বীকার করে নাও, আর বলছি কি জানো, ভালবেসেই শেষ হয়েছি, আমার মেয়েরও সেই অধিকার আছে।

গাঁয়ে ফেরার পথে একটি পাকা দালানের বৈঠকখানায় প্রায় চমকে উঠে চাইলেন তিনি। ওখানে পাটকিলে মুসা দাঁড়িয়ে আছে। অবিকল সেই জীবটা, গায়ের রঙ, চাউনি, স্বাস্থ্য, কোনও ফারাক করা যায় না। এমন হয়, এই রকম হুবহু চেহারার জীব সংসারে থাকে। শুধু রুদ্রর মতন কেউ চলে গেলে আর আসে না।

স্বামীর বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালেন স্বর্ণদীপা। আকাশে একফালি চাঁদ উঠল

BanglaBook.org

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সন্ধ্যায়। ইমামকে আলিঙ্গন করে তিনি বললেন—আজ বড় কষ্ট তোমার। আমি আছি তোমার কাছে। ভয় পেও না।

চাঁদের গায়ে এক অনির্বচনীয় আলো ফুটে উঠেছে তখন।